গল্পকল্পতরু—(প্রথম কুসুম)

হিরণ্ময়ী

(উপন্যাস)

[প্রথম খণ্ড]

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত।

আশুতোষ ঘোষ এবং কোম্পানি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আল্‌বার্ট প্রেস্‌।

৪৬নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কর্ণবালিস ষ্ট্রীট,
বাহির সিমলা,—কলিকাতা।

কার্ত্তিক,—১২৮৬।

মূল্য এক টাকা চারি আনা।

বিজ্ঞাপন।

নূতন ব্যাপার।

এ দেশে পূর্ব্বে কখন এরূপ ধরণের জিনিষ বাহির হয় নাই।

সাত কোটি লোকের বাসভূমি বঙ্গদেশে

গল্পকল্পতরু

রোপিত হইল।

এই তরুবরের অনেক শাখা, এক এক শাখায় এক এক রকম ফুল। একটি ফুলের সহিত অপরটির সাদৃশ্য নাই—অথচ সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি।—প্রত্যেক ফুলের বর্ণ নূতন—ধর্ম্ম নূতন—গন্ধ নূতন। ইহার মধ্যে যিনি যেটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, তিনি তাহাতেই মোহিত হইবেন। আজ কাল বাঙ্গালির যাহা ভালবাসার জিনিষ, তাহাই এই কল্পতরুতে ফলিবে। বৃদ্ধ বৃদ্ধা, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, যুবক যুবতী, বালক বালিকা প্রভৃতি সকলেরই মনোরঞ্জন-পুষ্পগুচ্ছ ইহার শাখায় শাখায় ফুটিবে। লোক যত, রুচিও তত, এই জন্যই এই গল্পকল্পতরুর সৃষ্টি ; কারণ কল্পতরুর নিকট যে যা' চায়, সে তা'ই পায়, ইহা সকলেই জানে।

সাত আট জন উৎকৃষ্ট গল্পরচনক্ষম ব্যক্তি এই তরুবরের মূলে নানাবিধ পাত্র পূরিয়া বিবিধস্বাদবিশিষ্ট জলসেচন করিবেন। তাঁহারা কখন স্বীয় স্বীয় মানস-সরোবরের জল,

কখন বা স্যর ওয়াণ্টার্‌স্কট্, থ্যাকারে, ডিকেন্স, ডুমাস্, রেণল্ডস্‌ লিটন প্রভৃতির সহায়তা লইয়া এই কল্পতরুর শাখা প্রশাখার বৃদ্ধির সহিত পাঠক পাঠিকাগণের নূতন নূতন আনন্দ ও কৌতূহল বৃদ্ধি করিবেন। যিনি এই গল্পকল্পতরুর ফুল কিনিতে চাহেন, কিনুন—ঠকিবেন না। কেন না ইহাতে বৎসরে অন্যূন পক্ষে আপাততঃ (প্রতি সপ্তাহে এক ফর্ম্মা করিয়া প্রকাশিত হইবে বলিয়া) তিন চারিটি, ক্রমে (প্রতি সপ্তাহে দুই, এমন কি প্রত্যহ এক এক ফর্ম্মা করিয়া প্রকাশিত হইবে বলিয়া) পাঁচ ছয়টি ও এগার বারটি করিয়া ফুল ফুটিবে, সুতরাং আশা পূরণ হইল না বলিয়া কাহাকেও হতাশ হইতে হইবে না। যদিও ইহাতে বরাবর ফুল না ফুটে, তথাপি একটি না একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন পূর্ণবিকসিত ফুল পাঠক পাঠিকার হস্তে সুশোভিত হইবেই হইবে, সুতরাং তাহা হইলেও আর কাহারও ঠকিবার কথা নাই।

প্রতি ফর্ম্মার নগদ মূল্য দুই পয়সা মাত্র। মফঃস্বলে দুই পয়সা মাসুলে ১৬ ফর্ম্মা একত্রে যাইবে।—গল্পকল্পতরুর ফুল ধারে বিক্রীত হয় না। নিম্নলিখিত কোম্পানির নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় গল্পকল্পতরুর ফুল বিক্রীত হয়।

আশুতোষ ঘোষ এবং কোম্পানি,

প্রকাশকগণ।

আল্‌বার্ট প্রেস,

৪৬নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কর্ণবালিস্ ষ্ট্রীট, বাহির সিমলা,—কলিকাতা।

শনিবার ২৮এ বৈশাখ, ১২৮৬ সাল।

গল্পকল্পতরু।

[প্রথম কুসুম]

হিরণ্ময়ী।

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নৌকামগ্ন।

বক্তিয়ার খিলিজি সপ্তদশ জন অশ্বারোহী সৈনিক সমভিব্যাহারে নবদ্বীপের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলে, মহারাজ লাক্ষ্মণেয়ের ব্রাহ্মণ সচিবেরা ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে গোপনে পলায়ন করিতে বলিলেন। বৃদ্ধ রাজা সেই সকল দুর্ব্বুদ্ধি বিপ্রমন্ত্রীর কুপরামর্শে সস্ত্রীক গুপ্তদ্বার দিয়া গঙ্গাতটে প্রস্থান করিলেন। সেখানে একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণ করিয়া সপত্নীক মহাতীর্থ জগন্নাথক্ষেত্রে চলিলেন। বক্তিয়ার বা তাঁহার কোন সমভিব্যাহারী ব্যক্তি তাহা জানিতে পারিলেন না। রাজা পলায়ন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় প্রাণসদৃশী রাজধানী পলায়ন করিতে পারিল না। শক্রকরে নবদ্বীপের একশেষ দুর্দ্দশা ঘটিল। রাজ্য অরাজক হইয়া উঠিল। যবনেরা অল্পদিনের মধ্যেই এতদূর অত্যাচার আরম্ভ করিল যে, হিন্দুপ্রজাগণের মৃত্যুই একমাত্র মানসম্ভ্রম রক্ষার অবলম্বন হইয়া উঠিল। অনেক প্রজা যবনকরে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া দেশত্যাগ পর্য্যন্তও করিতে লাগিল।

সেই উৎসন্নদশাপ্রাপ্ত নবদ্বীপ নগরের এক পল্লীতে একজন ধনবান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পিতা সপ্তগ্রাম হইতে বাসস্থান উঠাইয়া নবদ্বীপে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। রাজসরকারে কোন একটি ভাল কার্য্য পাইবার জন্যই তিনি নবদ্বীপবাসী হইয়াছিলেন। ফলে, সৌভাগ্যক্রমে সেখানে একটি উপযুক্ত পদও প্রাপ্ত হইয়া, আশার চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। আমরা যে ব্রাহ্মণের বিষয় বলিতেছি, তিনিই তাঁহার একমাত্র পুত্র। তাঁহার পিতা রাজকর্ম্মচারী হইয়া অনেক সম্পত্তি রাখিয়া পরলোকগত হইলে, তিনিই সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিয়া আসিতেছিলেন।

কিন্তু মনুষ্যের অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না—থাকিবেও না। কাল যাহাকে হাসিতে দেখিয়াছি, আজ তাহাকে কাঁদিতে দেখিলাম—কাল যাহাকে কাঁদিতে দেখিয়াছি, আজ তাহাকে হাসিতে দেখিলাম—কাল যাহাকে সুখের প্রভু বলিযাছিলাম—আজ তাহাকে দুঃখের কিঙ্কর বলিতে হইল—আবার কাল যাহাকে দুঃখের দাস বলিয়াছিলাম, আজ তাহাকে সুখের অধীশ্বর বলিতে হইল। মনুষ্যের অবস্থা এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল। চক্রের ন্যায় মনুষ্য-ভাগ্যে সুখদুঃখ অবিশ্রান্তভাবে ঘুরিতেছে। নদীর জল ও পঙ্কে যেরূপ সম্বন্ধ, নরভাগ্যের সুখ ও দুঃখেও ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ। এ হেন মহামূর্ত্তি—বিরাটমূর্ত্তি প্রকৃতির ভাগ্যেই যেকালে আলোকপূর্ণ দিবা ও তমসপূর্ণ নিশা সুখদুঃখের অভিনয়পট অবিরত ফেলিতেছে, তুলিতেছে, তখন ক্ষুদ্র মানব-ভাগ্যের কথা ত অতি তুচ্ছ।

বক্তিয়ার খিলিজির সৈন্যগণ উক্ত ব্রাহ্মণের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইল।—ব্রাহ্মণ মহাবিপদে পড়িলেন। তিনি যে আর কোন উপায়ে স্বীয় সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিবেন, তাহার কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। হিন্দুরাজধানী নবদ্বীপ এক্ষণে মুসলমানরাজধানী। হিন্দুরাজার সিংহাসনে মুসলমান রাজা। সুতরাং তাঁহার ঐশ্বর্য্য রক্ষার আর কিছুই উপায় রহিল না। ক্রমে ক্রমে মুসলমানেরা তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক ভয়ানক অত্যাচার করিবার উপক্রম করিল। তিনি তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন

করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ত্বরাপন্ন হইয়া কতকগুলি বহুমূল্য অলঙ্কার ও মণিমুক্তা লইয়া, সহধর্ম্মিণী ও দুইটি পুত্রের সহিত গুপ্তদ্বার দিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।

তাঁহার অনেকটা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, যখন তিনি স্ত্রী পুত্র লইয়া পলায়ন করিতেছিলেন, তখন সন্ধ্যা বিদায় লইবার জন্য রজনীকে আলিঙ্গন করিতেছিল। বাস্তবিক, দিনের বেলা হইলে, তাঁহার পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করা অতি কঠিন হইত। বক্তিয়ারের ভয়ে মুসলমান সেনারা মধ্যে মধ্যে রাত্রিকালেই নগরবাসীদের গৃহলুণ্ঠন,এমন কি প্রাণবিনাশ পর্য্যন্তও করিত। যাহা হউক, উক্ত বিপদাপন্ন ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও কেবল অন্ধকারের কৃপায় স্ত্রীপুত্রদের সহিত প্রাণান্ত হ'য়েন নাই।

পাঠক, আপনি সেই ব্রাহ্মণের নাম কি, জানেন না। তাঁহার নাম গোলোকনাথ। তাঁহার স্ত্রীর নাম তারাসুন্দরী। আর তাঁহার পুত্র দুইটির মধ্যে অগ্রজের নাম বীরেন্দ্রনাথ এবং অনুজের নাম নাম ধীরেন্দ্রনাথ। গোলোকনাথের বয়ঃক্রম অন্যূন সাতচল্লিশ, তারাসুন্দরীর ছত্রিশ, জ্যেষ্ঠ পুত্রটির যোড়শ ও কনিষ্ঠের চতুর্দ্দশ বর্ষ।

গোলকনাথ, আপনার স্ত্রী ও পুত্র দুইটির প্রাণবিনাশের ভয়ে, একেবারে উদ্ধশ্বাসে গঙ্গাতটে আগমন করিলেন। আসিবার সময় তিনি একবার ভাবিয়াছিলেন যে, এ সময়ে নগরস্থ কোন বন্ধুর বাটীতে গমন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। কিন্তু সেই ভাবনা অন্তরে অনেকক্ষণ স্থান পায় নাই। তিনি আবার আর একটি নূতন চিন্তার অধীন হইয়া ভাবিলেন, মুসলমানেরা ক্রমশঃ যেরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে আর নগরের কোন স্থানেই অবস্থান করা বিধেয় নহে। আজ—না হয় কাল—আবার হয় ত তাঁহাদিগেকে যবনহস্তে পড়িয়া প্রাণান্তকর বিপদের ভাগী হইতে হইবে, সুতরাং চিরকালের জন্যই নবদ্বীপ পরিত্যাগ করা সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য। আবার এ সময়ে সকলেই উৎপীড়িত, সুতরাং কাহার নিকট যাওয়াও বিবেচনাসিদ্ধ নহে। পুনর্ব্বার পিতৃপিতামহদিগের আদিবাসভূমি সপ্তগ্রামে গিয়া বাস করাই সম্পূর্ণ রূপে উপযুক্ত। গোলোকনাথ এইরূপ চিন্তা করিয়া, স্ত্রী ও পুত্র দুইটিকে সঙ্গে লইয়া, ভাগীরথীতটে উপস্থিত হইলেন।

গোলোকনাথ যখন গঙ্গার তীর-ভূমিতে উপনীত হইলেন, তখন রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। সে দিন কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি; সুতরাং নিশাকর সেই সময়ে ধীরে ধীরে তমোরাশিকে সরাইয়া, পূর্ব্বগগনে উদয় হইতেছিলেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আকাশের অনন্ত দেহে চক্ষের অলক্ষ্যে অস্থির জলদজাল চলিয়া বেড়াইতেছিল, কিন্তু এক্ষণে, যদিও পূর্ব্বের ন্যায় চলিয়া যাইতেছে, তথাপি আর মূর্ত্তি লুকাইতে পারিতেছে না। চন্দ্রের ধবল কৌমুদীমণ্ডিত হওয়ায়, নীরদখণ্ডগুলির প্রকৃত রূপ লুক্কায়িত হইয়া, রজতখণ্ডমণ্ডিত হইয়াছে। মেঘখণ্ডগুলির এইরূপ রূপান্তর নিরীক্ষণ করিয়াই যে, নীতিবিৎ পণ্ডিতেরা "লোকে সঙ্গদোষে দোষী ও সঙ্গগুণে গুণী হইয়া থাকে" এই পদটিতে নীতিশাস্ত্রের নীতিসূত্রসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্ধকারের দোষে মেঘখণ্ডগুলি তমোময় হইয়াছিল, কিন্তু চন্দ্রের গুণে রজতখণ্ডবৎ হইয়া দর্শকগণের দর্শনসুখ পরিবর্দ্ধন করিতেছে। চন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বে ঊর্দ্ধগগনে নক্ষত্রমণ্ডলী আর তলগগনে জ্যোতিরিঙ্গণসমূহ যেরূপে গর্ব্ব করিতেছিল, এক্ষণে ঠিক তাহার বিপরীত। চন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বে তাহাদের মূর্ত্তি পণ্ডিতকুলচূড়ামণি বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশের "নিরস্তে পাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে" এই অর্দ্ধ শ্লোকটির, পরে মহাকবি কালিদাসের

"অরিষ্টশয্যাং পরিতোবিসারিণা সুজন্মনস্তস্য নিজেন তেজসা।

নিশীথদীপাঃ সহসা হতত্বিষো বভূবুরালেখ্যসমর্পিতা ইব ॥"

কবিতার ভাবার্থের সত্যতা সম্পাদন করিল। সুধাংশুকিরণ কোনখানে বৃক্ষশাখার ব্যবধান দিয়া ভাগীরথীর শীতল সলিল স্পর্শ করিতে লাগিল, কোনখানে তীরস্থ গৃহের বাতায়ন দিয়া নিদ্রাভিভূতা যুবতীর বদনকমল চুম্বন করিয়া যেন কতই তৃপ্তিলাভ করিল। চন্দ্র কখন কখন চলজ্জলদাবলীর পৃষ্ঠদেশে লুক্কায়িত হইতেছিলেন, আবার কখন কখন তাহাদের তরল দেহ ভেদ করিয়া নিজের সুধাময়ী কৌমুদী ধরাবক্ষে ছড়াইতে লাগিলেন। তন্দ্রাভিভূত কোকিল কোকিলা দিবাভ্রমে এক একবার কুহু কুহু করিয়া উঠিতেছে, আর সেই শ্রুতিসুখবর্দ্ধিনী কুহুধ্বনি নিস্তব্ধ আকাশে সমীর-সঞ্চারে গড়াইয়া যাইতেছে। প্রকৃতি দেবী নির্ব্বাক্ হইয়া যেন মহাধ্যানে নিমগ্ন

হইয়াছেন। কেবল তীরসংলগ্ন কোন কোন তরণী হইতে নাবিককণ্ঠে এক এক বার গ্রাম্য গীতের মধুর শব্দ কর্ণকুহরে আশ্রয় লইতেছে।

এমন সময়ে গোলোকনাথ ভাগীরথীর উপরিতট হইতে তলতটে অবরোহণ করিয়া "মাঝি—মাঝি" বলিয়া দুই চারি বার মধ্যম স্বরে ডাকিলেন। একখানি ক্ষুদ্র নৌকা হইতে এক ব্যক্তি "কে ডাকেন, আজ্ঞে" বলিয়া উত্তর দিল। তখন গোলোকনাথ তাহাকে আপনার নাম বলিলেন। মাঝি তৎক্ষণাৎ ব্যস্তসমস্ত হইয়া নৌকা হইতে নামিল এবং তাঁহার নিকটে আসিয়া নম্রতাহঙ্কারে বলিল: "ঠাকুর মশাই! আপনি এমন সময়ে এখানে কি মনে ক'রে এলে?" এই মাঝি গোলোকনাথকে অনেক বার অনেক স্থানে নৌকা করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সুতরাং বলা বাহুল্য যে, এই ব্যক্তি তাঁহাকে বিশেষরূপে জানে।

প্রকৃত কথা বলিলে পাছে মাঝি ভয় পায়, এইজন্য গোলোকনাথ তৎক্ষণাৎ নূতন কথা গড়িয়া তাহাকে বলিলেন: "মথুর! সপ্তগ্রাম হইতে একটা বিশেষ সংবাদ আসিয়াছে, এইজন্য আমি সেখানে সপরিবারে এখনই যাইব। আমি একেবারে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি, কোনক্রমেই আর বিলম্ব করিতে পারিব না। তোর যদি কোন বাধা না থাকে, তবে তুইই আমাদিগকে লইয়া যাইতে পারিস্; আর যদি এখন তোর যাইবার সুবিধা না হয়, তবে না হয়, আর একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া দে,—কিন্তু আমি আজিই প্রস্থান করিব।" এই মাঝির উপাধি সমেত নাম মথুর হাজরা।

মথুর প্রায় চারি পাঁচ দিন হইতে কিছুই রোজগার করিতে পারে নাই, সুতরাং গোলোকনাথকে সপ্তগ্রামে লইয়া যাইবার জন্য অনিচ্ছুক হইল না। আরও সে ভালরূপেই জানিত, অপরাপর আরোহীর অপেক্ষা তিনি তাহাকে ভাড়া ছাড়া টাকা কাপড় পুরস্কার দিয়া থাকেন।

অনন্তর মথুর মাঝি পুনর্ব্বার নিজের নৌকায় উঠিয়া দুই জন নিদ্রিত দাঁড়ীকে জাগাইল; জাগাইয়া তাহাদের কাণে কাণে কএকটি বাক্যব্যয় করিল। দাঁড়ী দুই জন অবিলম্বে নৌকাচালনোপযোগী দ্রব্যগুলি ঠিক করিতে লাগিল। মথুর স্বয়ং চকমকি ঝাড়িয়া একখণ্ড শোলায় অগ্নি সংযোগ করিল এবং সেই অগ্নিতে একটি মৃৎপ্রদীপ জ্বালিল। দুর্ভাগ্যক্রমে

প্রদীপটির মুখ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সুতরাং মথুর উহার বর্ত্তিকাটিকে বঙ্কিম-ভাবে রাখিয়া পুনর্ব্বার গোলোকনাথের নিকট আসিল।

তখন গোলোকনাথ মথুরকে লইয়া উপরি-তটে গেলেন এবং মথুরের হস্তে একটি কাপড়ের গাঁঠরী দিয়া, স্ত্রী ও পুত্রদিগকে সঙ্গে করিয়া জলের নিকট উপস্থিত হইলেন। মথুর সর্ব্বাগ্রে নৌকার উপর গাঁঠরী রাখিয়া, একে একে বীরেন্দ্র ও ধীরেন্দ্রকে নৌকায় উঠাইয়া দিল। তাহার পর গোলোকনাথ ও তারাসুন্দরী গঙ্গাবারি শিরঃস্পর্শ করিয়া, নৌকায় আরোহণ করিলেন। সর্ব্বশেষে মথুর মাঝি নৌকার উপর বসিয়া, জলমধ্যে কর্দ্দম-সংলগ্ন পদ ধৌত করিল। পা ধুইয়া স্বস্থানে দাঁড়াইয়া হাইল ধরিল। অনন্তর নৌকাবন্ধন বংশদণ্ড উত্তোলন করিয়া মথুর ও দুই জন দাঁড়ী "গঙ্গার পিরতি হরিবোল" বলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা ভাটি বহিয়া দক্ষিণ দিকে চলিল।

দুই দিকে দুইটি দাঁড় পড়িতেছে—নৌকাও কিঞ্চিৎ দমক্ দিয়া চলিতেছে। মথুর ও দাঁড়ী দুই জনের সুখের বিষয় বলিতে হইবে যে, সৌভাগ্য-ক্রমে তাহাদিগকে উজান ঠেলিতে হইল না। মথুর হাজরা সঙ্গী দুইটির সঙ্গে ঘরের কত কি কথা আরম্ভ করিল। কখন মথুর প্রশ্ন করিতেছে, দাঁড়িরা উত্তর দিতেছে—কখন দাঁড়িরা প্রশ্ন করিতেছে—মথুর উত্তর দিতেছে। তিন জনের মধ্যে কেহ কখন হাসিতেছে—কেহ কখন কিঞ্চিৎ রোষ প্রকাশ করিতেছে—কেহ আবার প্রফুল্লমনে এই বলিয়া গান করিতেছে;—

"পার কর পার কর ব'লে ডাক্‌ছি কত বেলা;
(ও তুমি) শুনেও কি, শ্যাম শুন না হে, হ'য়েছ কি কালা?"

মথুর মাঝির নৌকা এইরূপে যাইতে লাগিল। ক্ষেপণীনিক্ষেপের মৃদুমধুর শব্দে গোলোকনাথের পুত্র দুইটি ঘুমাইয়া পড়িল; কিন্তু গোলোকনাথ ও তারাসুন্দরীর চক্ষে নিদ্রার আভাসও আসিল না। তাঁহারা উভয়ে মনশ্চক্ষে আপনাদের সেই বিপৎপাত মুহুর্মুহু দর্শন করিয়া নিরতিশয় আকুল হইতেছিলেন। দাঁড়িমাঝির কথা বা গান শুনিয়াও শুনিতে ছিলেন না—কেবল সেই দুর্ঘটনা ও বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিয়াই অস্থির হইতেছিলেন।

পাঠক, গোলোকনাথ ও তারাসুন্দরীর মনের ভিতর—হৃদয়ের ভিতর কিরূপ তরঙ্গাঘাত হইতে লাগিল, তাহা লেখনীমুখে কখনই ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই। তুমিও যদি কখন এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া থাক, তবে এই সময়ে একবার তাহা স্মরণ কর—বুঝিতে পারিবে। নতুবা শত-পৃষ্ঠাত্মক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াও গোলোক-তারার মনের ও হৃদয়ের এই চিত্র তোমাকে বুঝাইতে পারিব না। ব্যথার ব্যথী না হইলে এই বিপন্ন দম্পতীর হৃদয়মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার কাহারই ক্ষমতা নাই।

সুদূর আকাশে চন্দ্রমণ্ডলে সুশীতল কিরণ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে—আবার উহা ভাগীরথীর সুনির্ম্মল জলে পতিত হইয়া তর তর করিয়া ভাসিতেছে। আকাশেও চাঁদ—গঙ্গাজলেও চাঁদ। ইহা দেখিয়া বোধ হইতেছে, চন্দ্র যেন দিবাভাগে রবিকিরণে হতশ্রী হইয়াছিল বলিয়া রাত্রি-কালে জলদর্পণে মুখ দেখিতেছে। কিন্তু এক্ষণে চাঁদের বদন-শোভাই বা কত। দিবার চাঁদ আর নিশার চাঁদ যেন পরস্পর স্বতন্ত্র। এক্ষণে এই যে, যেখানে সেখানে কিরণের ছড়াছড়ি, ইহা আর কিছুই নহে—চাঁদের মুখভরা হাসি। অন্ধকার পাইয়া চাঁদ বড়ই খুসী—তাই এত হাসি। যা'ই হউক্, চাঁদ বড় নির্ব্বোধ, কেন না,সে জানে না যে, যত হাসি—তত কান্না। আর একটি কথা,—চাঁদ যেমন নির্ব্বোধ, আবার তেমনই নির্দ্দয়। তা' নহিলে কি গোলোক-তারার এই অভূতপূর্ব্ব বিপদেও সে এত হাসে?

দেখিতে দেখিতে প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া আসিল, নবদ্বীপের নৌকাখানিও রাজধানী ছাড়িয়া প্রায় আট নয় ক্রোশ দক্ষিণে আসিয়া পড়িল। চতুর্দ্দিক নীরব;—কেবল দুইটি শব্দ শ্রুতিপথে আসিতেছে। তাহার মধ্যে একটি ঝিল্লির, অপরটি ক্ষেপণী-নিক্ষেপের শব্দ। নদীতট-বিরাজিত পাদপশ্রেণী হইতে ঝিল্লিকুল একত্র হইয়া যেন সমস্বরে ঝিঁ ঝিঁ করিয়া কহিতেছে "কে?—কে?" আর নৌকার ক্ষেপণী জলে আঘাত করিয়া যেন উত্তর দিতেছে "চুপ্—চুপ্।"

"ভবিষ্যৎ অভেদ্য অন্ধকারে সৃষ্ট, সুতরাং মানব উহা দেখিতে পায় না। যদি ভবিষ্যতে আলোকের ছায়া মাত্রও থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীকে কেহই দুঃখের প্রসূতি বলিতে সাহসী হইত না। কিন্তু ভবিষ্যৎ অন্ধকার—

পৃথিবীও দুঃখের প্রসূতি।" গোলোকনাথ নেত্র নিমীলন করিয়া এই কথাগুলি পীড়িত অন্তরে প্রস্তরাঙ্কিত রেখাবৎ খোদিত করিতেছিলেন। এমন সময়ে সহসা মথুর মাঝি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ও কেষ্টলা! ওরে হরে! লৌকো বুঝি বাণচাল হ'ল। দেখ্ দেখ্, শীগ্গির দেখ্—পাট গুঁজে দে।" এই কথা বলিবা মাত্র নৌকার মধ্যে বিষম গোলযোগ পড়িয়া গেল। আমরা ভাবিয়াছিলাম, গোলোকনাথ ও তারাসুন্দরীর মনোমধ্যে যে দুশ্চিন্তা আধিপত্য লাভ করিয়াছে, তাহা অক্ষয়। কিন্তু "বাণচাল" শব্দটি উত্থিত হইবামাত্রই তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। তদপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তা তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। উভয়েই তাড়াতাড়ি করিয়া পুত্র দুইটিকে জাগাইতেও অবকাশ পাইলেন না। ডাকিতে ডাকিতে তাহাদিগকে নৌকার ভিতর হইতে টানিয়া আনিলেন। সেই সময়ে বালক দুইটির নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। তাহারা প্রথমে অর্দ্ধনিদ্রিত ও অর্দ্ধজাগরিত হইল বটে, কিন্তু সহসা নৌকার মধ্যে গোলমাল শুনিয়া ভয়ে চম্‌কাইয়া উঠিল—কথা কহিতে পারিল না, কিন্তু কাঁদিয়া ফেলিল। গোলোকনাথ একাকী নৌকায় থাকিলে তত ভয়ের কারণ ছিল না, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে বালক বীরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র ও সন্তরণাক্ষমা তারাসুন্দরী। তিনি সেই তিন জনের জন্য নিতান্ত কাতর ও নিরুপায় হইয়া মাঝিকে বলিলেন, "মথুর!—মথুর! যদি আজ বাঁচাইতে পারিস্ তবে তোকে পাঁচ সহস্র টাকা দিব।"

মথুর বলিল, "ভয় নেই, কত্তা! ভয় নেই; তোমার আশীর্ব্বাদে এখুনি জল ধ'রে দিচ্চি।" একজন দাঁড়ি নৌকার জলপ্রবেশস্থলে হাত চাপিয়া পাট গুঁজিতে লাগিল। অপর জন সেচনী দিয়া নৌকোত্থিত জল সেচন করিতে লাগিল। তাহাদের দৃঢ়তর যত্ন ও পরিশ্রমে বিপদনাশের অনেকটা সম্ভাবনা হইল বটে, কিন্তু বিপদের উপর বিপদ! নৌকার যে স্থানে বাণচাল হইয়া গিয়াছিল, তাহার পার্শ্বেই আবার আর একখানা তক্তা ফাঁসিয়া গেল। এবার আর কিছুতেই জলোত্থান থামিল না। সকলেই হতাশ হইল। তারাসুন্দরী ও বালক দুইটি আতঙ্কে জড়িত স্বরে কাঁদিয়া উঠিল। দুই চারিবার 'হে মা গঙ্গা, হে ঈশ্বর,—গেলাম, বাঁচাও—হায় হায়" শব্দমাত্র রোদনের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গঙ্গাগর্ভ নীরব হইল। জলে নৌকা নাই! নৌকায় যাহারা

ছিল, তাহারাও নাই! ক্ষণকালের মধ্যে নির্জীব ও সজীব উভয়েই অভিন্ন হইল।

ভাগীরথীর যে স্থলে গোলোকনাথ সপরিবারে নৌকাডুবী হইয়াছিলেন, উহা তীর হইতে অন্যূন ১৫।১৬ হস্ত দূর হইবে। কিন্তু জলস্রোত অত্যন্ত প্রখর ছিল।

গোলোকনাথের বিপদের উপর বিপৎপাত দেখিয়া আমাদের মনে পড়িল—

"একস্য দুঃখস্য ন যাবদন্তং
গচ্ছাম্যহং পারমিবার্ণবস্য।
তাবদ্দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে
ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি॥"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জগদীশপ্রসাদ।

যে স্থানে গোলোকনাথের নৌকা মগ্ন হয়, ঠিক সেই স্থান হইতে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে মধুপুর নামে একটি গণ্ডগ্রাম ছিল। সেই গ্রামটি উত্তরপাড়া ও দক্ষিণপাড়া, এই দুই আখ্যায় বিভক্ত। উভয় পল্লীতেই অনেক ভদ্রলোকের বাস। কিন্তু সেই সকল ভদ্রলোকের মধ্যে তিন চারি জন ব্যক্তি অপরাপর লোকদিগের অপেক্ষা ধনসম্পন্ন ছিলেন। আবার সেই কএক ব্যক্তির মধ্যে দক্ষিণপাড়ায় অপর একজন অধিকতর ধনবান্ জমীদার ছিলেন। তাঁহার নাম জগদীশপ্রসাদ। জগদীশপ্রসাদের পুত্র ব্যতীত অন্য কিছুরই অভাব ছিল না। যাহা হউক, তথাপি তাঁহাকে নিঃসন্তান বলা যায় না। কেন না বিধাতা তাঁহাকে দুইটি কন্যা দান করিয়াছিলেন। পুত্রের মুখদর্শনে যে পরিমাণে পিতা সুখানুভব করিয়া থাকেন,

তিনি কন্যা দুইটির কোমলতাপূর্ণ বদনসুষমা নিরীক্ষণ করিয়া তাদৃশ আনন্দই উপভোগ করিতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন জগদীশ-প্রসাদের জ্যেষ্ঠা কন্যাটির বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর—নাম কিরণময়ী এবং কনিষ্ঠার বয়স চারি বৎসর—নাম হিরণ্ময়ী। পাঠক, যদি কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ীর দেহ, রূপ ও মুখশোভা কিরূপ জানিতে ইচ্ছা কর, তবে একবার কবিবর বিদ্যাপতির

"কনকলতা অবলম্বনে উয়ল হরিণীহীন হিমধামা"*

কবিতাংশটি মনশ্চক্ষের দৃষ্টিতে ভাল করিয়া দেখিয়া লও। আর যদি উভয় ভগিনীর ভালবাসা কিরূপ জানিতে চাও, তবে 'একবৃন্তে কুসুমযুগল' চিন্তা কর।—বাস্তবিক দুইটি ভগিনী একপ্রাণ ও একচিত্ত, কেবল ভিন্ন দেহ। সর্ব্বদাই দুই জনে একস্থানে খেলা করে—একস্থানে বসিয়া আহারকরে—এক দ্রব্য দুই ভাগ করিয়া ভক্ষণ করে—একস্থানে শয়ন করিয়া থাকে। এক জনকে অপর জন দেখিতে না পাইলে কাঁদিয়া উঠে, ভাবিতে থাকে এবং কিছু খাইতে চাহে না। আবার যখন পরস্পরের সহিত পরস্পরের সাক্ষাৎ হয়, তখন উভয়েই উভয়ের গলা জড়াইয়া কতই সুখানুভব করিতে থাকে। আমরা শুনিয়াছি,এক দিন জগদীশপ্রসাদ একটি মেলা হইতে একটি বহুমূল্যের অতি উৎকৃষ্ট পুত্তলিকা ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, দুইটি কন্যার জন্য ঐরূপ দুইটি পুতুল কিনিয়া লইয়া আসেন,কিন্তু তাহা সেখানে পান নাই। অবশেষে তিনি সেই একমাত্র পুতুলটি ক্রয় করিয়া গৃহে আগমন করেন। পুতুল দেখিয়া দুই কন্যাই তাঁহার নিকট দৌড়িয়া আসিল। জগদীশপ্রসাদ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ও কিরণ! ও হিরণ! তোমরা দুইটি পুতুল—আবার আজ এই একটি পুতুল আনিয়াছি, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কাহাকে ইহা দিব? আচ্ছা, তোমরা দুই জনে এইখান হইতে ঐখান পর্য্যন্ত দৌড়িয়া যাও। যে অগ্রে যাইতে পারিবে, তাহারই

* কনকলতা অবলম্বন করিয়া কলঙ্কহীন চন্দ্র উদয় হইল, অর্থাৎ দেহযষ্টি কনকলতা আর মুখমণ্ডল নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র। ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই, অতি সুন্দর শরীরের উপরে অধিকতর সুন্দর মুখমণ্ডল।

এই পুতুল।" এই কথা বলিয়া তিনি দৌড়িয়া যাইবার একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ দুই ভগিনী দৌড়িল। বয়স ও শক্তি অনুসারে দেখিতে গেলে, অগ্রে কিরণময়ীরই তথায় পৌছিবার কথা, কিন্তু তাহা হইল না। হিরণ্ময়ীই কিরণের অগ্রে কথিত স্থানে উপস্থিত হইল। কিরণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল, ছুটিবার সময় পায়ে জড়াইয়া পড়িয়া গেল। হিরণ্ময়ী নগ্না, সুতরাং কিছুই তাহাকে বাধা দিতে পারিল না। তখন জগদীশ-প্রসাদ "হিরণ্ জিতিয়াছে—কিরণ হারিয়াছে" বলিয়া কনিষ্ঠার হস্তে পুত্ত-লিকা প্রদান করিলেন। কিরণময়ী কিঞ্চিৎ ক্রোধমিশ্রিত লজ্জায় বিঘ্নকারণ পরিহিত বস্ত্রের অঞ্চল ছিঁড়িয়া ফেলিল। তখন জগদীশপ্রসাদ তাড়াতাড়ি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "কিরু! কাল তোমাকে এই রকম আর একটি পুতুল আনিয়া দিব।" কিরণময়ী কি ভাবিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। তাহার সেই ভাব দেখিয়া হিরণ্ময়ী ক্ষণেক কাল কি ভাবিল; পরে তৎক্ষণাৎ সেই জয়লব্ধ বহুমূল্যের পুত্তলিকাটি কিরণময়ীকে দিতে চাহিল, কিন্তু সে উহা লইল না।—অবশেষে হিরণ্ময়ী পুত্তলিকাটিকে দ্বিখণ্ড করিয়া ঊর্দ্ধভাগ কিরণময়ীকে দেখাইয়া বলিল, "দিদি! তুমি আধখানা লও আর আমি আধখানা লই।"

জগদীশপ্রসাদ হিরণ্ময়ীকে পুত্তলিকাটি দ্বিখণ্ড করিতে দেখিয়া প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাহার এই অপূর্ব্ব ভগিনীস্নেহ দেখিয়া নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর সাহ্লাদে উভয়কে উভয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া আর এক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই দুই স্নেহময়ী ভগিনীর এইরূপ স্নেহসম্বন্ধিনী অনেক ঘটনা হইয়াছিল। গ্রামের অপরাপর লোকেরা স্বস্ব পুত্র কন্যাদিগকে সদ্ভাব শিখাইবার জন্য কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ীকে দৃষ্টান্তস্থল করিয়া প্রায়ই বলিত—

"কিরণ হিরণ দুই বোন্,
দুই শরীরে এক মন্।"

পাঠক, তোমাকে কিরণময়ী এবং হিরণ্ময়ীর রূপ ও ভগিনীস্নেহসম্বন্ধে একপ্রকার বুঝাইয়া দিলাম, কিন্তু সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ বলিব।—

উহারা উভয়েই রূপবতী, তবু উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ তারতম্য দেখ।— কিরণময়ী স্থবর্ণগঠিতা আর হিরণ্ময়ী সরত্নস্থবর্ণনির্ম্মিতা।

জগদীশপ্রসাদের বয়ঃক্রম অনূ্যন চৌত্রিশ বৎসর। তাঁহার আবয়বিক গঠনপ্রণালী দেখিলে, তাঁহাকে নিরোগ ও বলিষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস হইত। আকৃতি নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব। শরীরের বর্ণ ফিট্ গৌর। ললাটদেশ বিস্তৃত—চক্ষুযুগল আকর্ণবিস্তৃতও নহে, ক্ষুদ্রও নহে, অথচ অতি সুন্দর— যেন পূর্ণমাত্রায় বিকসিত রহিয়াছে। ভ্রূযুগল মূলস্থলে স্থূল হইয়া ক্রমশঃ অন্ত্যস্থলে সূক্ষ্ম হইয়াছে, সুতরাং ভাল বই কি বলিব ? কর্ণ দুইটি যথাযোগ্য। গণ্ডদ্বয় পূর্ণতাবিশিষ্ট। নাসিকাটি টিকলো। ওষ্ঠাধর পুরুও নহে, সরুও নহে। চিবুক মানানসই। তিনি শ্মশ্রুবহন করিতে ভালবাসেন না বলিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক—শ্মশ্রুহীন। কিন্তু ক্ষৌরকারের ক্ষুর-ঘর্ষণে তাঁহার শ্মশ্রুলোমাবলী নির্ম্মূল হইয়াও হয় নাই। এক কর্ণের মূলদেশ হইতে অপর কর্ণের মূলদেশ পর্য্যন্ত ঈষন্নির্গত শ্মশ্রুলোমগুলি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আছে। তাঁহার গোঁফ যোড়াটি বেণীপাতি, সুতরাং গোঁফবংশের রাজা। তাঁহার বক্ষ বিশাল। কটিদেশ অস্থূল। বাহুযুগল বেশ গোল। পদদ্বয়ও শরীরের নির্ম্মাণানুযায়ী উপযুক্ত। সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুব স্থূলও নহে—খুব ক্ষীণও নহে, অথচ কোনখানে একখানি অস্থিরও উচ্চতা দেখা যায় না। সুতরাং ইহারই নাম নিটোল শরীর। জগদীশপ্রসাদ সর্ব্বদাই শ্বেতবস্ত্র ব্যবহার করিতেন। তিনি অনেক ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও পরিচ্ছদের পারিপাট্য ভালবাসিতেন না।

জগদীশপ্রসাদের সহধর্ম্মিণীর নাম জাহ্নবী। তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশ বৎসর। জাহ্নবী অত্যন্ত স্বামিভক্তিপরায়ণা ছিলেন। বাস্তবিক জাহ্নবীকে যে সকল স্ত্রীলোক দেখিত, তাহারা তাঁহাকে পতিভক্তির প্রতিমূর্ত্তি বলিত। যেরূপ রূপ গুণ প্রভৃতি থাকিলে নারীকে বিধাতৃস্থষ্টির সর্ব্বোৎকৃষ্ট কারুস্থল বলা যাইতে পারে, জাহ্নবী দেবীতে তত্তাবৎই লক্ষিত হইত। কেবল তাঁহার বামচক্ষু স্বভাবত ঈষৎ বঙ্কিম ছিল।

জগদীশপ্রসাদের স্কন্ধে অনেকগুলি পোষ্য পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে নিম্নে কএকজন প্রধান ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। তাঁহার একটি

কনিষ্ঠা বিধবা ভগিনী, দুইটি ভাগিনেয়, একটি ভাগিনেয়ী, একটি ষষ্টিবর্ষীয়া পিতৃস্বসা, দুইটি বিধবা মাতুলানী ও পাঁচজন মাতুলপুত্র। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি জ্ঞাতি কুটুম্ব তাঁহার বাটিতে প্রতিপালিত হইত।

জগদীশপ্রসাদের বাস্তবাটী খুব বৃহৎ—সাত মহল। প্রথম মহলে দরদালান ও বৈঠকখানা। দ্বিতীয় মহলে কাচারী বাড়ী। তৃতীয় মহলে দাস দাসী, দ্বারবান্‌গণ ও বিবিধ সামগ্রী থাকিত। অবশিষ্ট চারি মহলের প্রথম মহলে তাঁহার আত্মীয়েরা এবং দ্বিতীয় মহলে আপনি থাকিতেন। তৃতীয়ে গোশালা এবং চতুর্থে পাকশালা ছিল। গোশালা ও পাকশালার বহির্ভাগে আরও দুইটি দ্বাব ছিল। গ্রামেব অনেকানেক দরিদ্র ব্যক্তি প্রত্যহ ঐ দ্বার দিয়া পাকশালায় আসিয়া আহার করিত। এই দরিদ্র-ভোজন-ব্যাপারে জগদীশপ্রসাদের মাসিক ব্যয় প্রায় পাঁচ ছয় শত টাকা পড়িত।

জগদীশপ্রসাদের বাস্তবাটীর পশ্চিম দিকে ঠাকুরবাড়ী। তথায় ৺ রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহ ও শালগ্রামশিলা প্রভৃতি কতিপয় দেবমূর্ত্তি ছিল। সেখানে প্রত্যহ একশত জন অতিথির ভোজনকার্য্য সম্পন্ন হইত। স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি হিন্দুদিগের যাবতীয় পর্ব্বাহোৎসব সম্পাদিত হইত।

পাঠক, এইবার তোমাকে জগদীশপ্রসাদের একটি বিশেষ সখের জিনি-ষের কথা বলিব। সেটি একটি বৃহৎ বাগান। তিনি উহার নামকরণ করিয়াছিলেন—'নন্দনকানন'। তথায় বিবিধজাতীয় বৃক্ষ লতা গুল্ম রোপিত হইয়াছিল। তিনি যেখানে যত প্রকার ভাল ভাল ফলের বা ফুলের গাছ পাইতেন, সকলই আপনার বাগানে আনিয়া রোপণ করিতেন। ছয় ঋতুতেই তাঁহার আদরের নন্দনকানন অপর্য্যাপ্ত ফলপুষ্প প্রসব করিত। নন্দনকানন দুই ভাগে বিভক্ত। সেই দুই ভাগেই দুইটি পুষ্করিণী ছিল। এক্ষণে পাঠককে দ্বিভাগ-বিভক্ত নন্দনকাননের বিষয় সংক্ষেপে বলি-তেছি;—প্রথম বা দক্ষিণভাগ—মধ্যস্থলে সরোবর। ইহার জল অতি পরিষ্কার। কোন স্থানে কিছুমাত্র শৈবাল বা দাম নাই, কিন্তু মৎস্য অপ-র্য্যাপ্ত। চারি দিকে চারিটি ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানবদ্ধ অবতরণ-স্থান (ঘাট)।

তন্মধ্যে পূর্ব্বদিকের ঘাটটিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তন। ঘাটের চাতালের উপরিভাগে লৌহতারনির্ম্মিত ফটক। সেই ফটকের উপর দুই তিন জাতীয়া লতা জড়াইয়া ছিল। সকলগুলিই পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া মৃদুল সমীরণ-হিল্লোলে শিরঃসঞ্চালন করিত। দেখিলে বোধ হইত, যেন তাহারা মানুষকে এই বলিয়া নিন্দা করিত,—"ও মানব! তুমি আত্মাবান্ হইয়াও আত্মাশূন্য আর আমরা আত্মাশূন্য হইয়াও আত্মাবিশিষ্ট। যদি বল, কেন? তবে বলি শোন,—তোমাদের ভালবাসার নাম স্বার্থপরতা আর আমাদের ভালবাসার নাম আত্মসমর্পণ। ও স্বার্থপর মানব! তুমি ভালবাসার ভান করিয়া স্বার্থসাধন কর, কিন্তু আমরা ভালবাসার জন্য আত্মসমর্পণ করি। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে চাও? আইস।—আমার নাম মালতী, আমি মাধবীকে বড় ভালবাসি—মাধবীও আমাকে অত্যন্ত ভালবাসে, এইজন্যই আমরা চির-আলিঙ্গিত হইয়া রহিয়াছি। নিষ্ঠুর মানব! তুমি যদি আমাদের একজনকে টানিয়া বিচ্ছিন্ন কর, তাহা হইলে অপরজন কখনই তাহাকে ত্যাগ করিবে না।—মালতীকে টানিলে মাধবী মরিবে—আর মাধবীকে টানিলে মালতী মরিবে—নিশ্চয় মরিবে। তাই বলিতেছি, মানব! তুমি আত্মাবান্ হইয়া আত্মাশূন্য আর আমরা আত্মাশূন্য হইয়াও আত্মাবিশিষ্ট।"

জগদীশপ্রসাদ এই পুষ্করিণীর নাম রাখিয়াছিলেন—রাধাকুণ্ড। রাধাকুণ্ডের জল অপরটির অপেক্ষা স্বচ্ছ, লঘু ও সম্পূর্ণরূপে পঙ্কবাসশূন্য। ইহার চতুস্তীরে নানাবিধ পুষ্পতরু কুসুমাভরণে সুশোভিত। তৎপশ্চাৎ প্রথম শ্রেণীর শ্রেণীবদ্ধ আম্রবৃক্ষ। রাধাকুণ্ডের তটস্থ ফুলতরুকুলের শাখোপবিষ্ট বিকসিত কুসুমাবলির শ্বেত, রক্ত, নীল, পীতবর্ণ বিশিষ্ট প্রতিবিম্ব স্বচ্ছসলিলে নিপতিত হইয়া দর্শকের চক্ষে ধাঁধা লাগাইত। বাস্তবিক, দূর হইতে দেখিলে এই বোধ হইত, যেন রাশীকৃত পুষ্প ভাসিয়া রহিয়াছে। জগদীশপ্রসাদ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ও অব্যবহিত পরে প্রত্যহ নন্দনকাননে ভ্রমণ করিতে আসিতেন। কিন্তু এই উদ্যানের অপর অংশ অপেক্ষা রাধাকুণ্ড বিভাগই তাঁহার বিশেষ প্রীতিপ্রদ ছিল।

উদ্যানের উত্তর বিভাগের নাম ললিতাকুণ্ড। কেননা এই নামে সেখানেও একটি পুষ্করিণী ছিল। রাধাকুণ্ডবিভাগ জগদীশপ্রসাদের বায়ুসেবনের

আর ললিতাকুণ্ড বিভাগ তাঁহার প্রাত্যহিক ব্যঞ্জন সংস্থানের সম্বল। এই বিভাগে বহুবিধ শাকসবৃজি উৎপন্ন হইত। প্রায় প্রত্যহ পাঁচ ছয় বজরা তরকারীর যোগাড় এইখান হইতেই হইত। রাধাকুণ্ড-সরসী-তীরে একটি ইষ্টকনির্ম্মিত বিলাসভবন, কিন্তু ললিতাকুণ্ডের কপালে তাহা ছিল না। থাকিবার মধ্যে মালীদিগের বাসোপযোগী চারি পাঁচখানি তৃণাচ্ছাদিত গৃহ। যাহা হউক, মধ্যে বৃক্ষমণ্ডলীর এরূপ দৃষ্টিরোধক ব্যবধান ছিল যে, বিলাসভবন হইতে তৃণকুটীরগুলি কোন মতেই দেখা যাইত না। ললিতাকুণ্ডে মীনবংশ বড় বিরল। উহার সলিলোপরি ক্ষুদ্র ও বৃহজ্জাতীয় শৈবালদল জন্মিয়াছিল। জগদীশপ্রসাদ তত্তাবৎ পরিষ্কার করাইতে পারিতেন, কিন্তু শ্বেত ও রক্তপদ্মের ঝাড় তৎসহ মিশ্রিত থাকায়, ছিঁড়িয়া যাইবার ভয়ে তাহা করাইতেন না। একমাত্র কমলদলের গুণে ললিতাকুণ্ডের অপরাপর দোষ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। আমাদের বিবেচনায় গুণ সম্বন্ধে রাধাকুণ্ড যেমন প্রধান, তেমনি রূপসম্বন্ধে ললিতাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। ললিতাকুণ্ডের তীরস্থ বৃক্ষগণ বড় হতভাগ্য। তাহারা তাহার জলদর্পণে একটিবারও আপনাদের পুষ্পভূষণভূষিত শ্যামলবদন দেখিতে পাইত না। এই দুঃখেই যেন শৈবাল সরাইবার আশায় স্ব স্ব শাখা জলমধ্যে প্রবেশ করাইয়া রাখিত, কিন্তু সরাইতে পারিত না। কেবল সমীরণ এক এক বার দয়া করিয়া শাখা নাড়িয়া দিলে, কিছুক্ষণের জন্য জলে তাহাদের প্রতিবিম্ব পড়িত। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উহাতে সমীরের দয়ার পরিচয়ের পরিবর্ত্তে পরিহাসেরই বাড়াবাড়ি বলা যুক্তিসঙ্গত। কারণ, অগ্রে সে বৃক্ষগুলির মস্তক হইতে কুসুম-ভূষণ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, পশ্চাৎ নিরলঙ্কার মুখ দেখাইত। তবে বল দেখি, কে উহাকে দয়ার পরিচয় বলিবে?

জগদীশপ্রসাদের বাস্তবাটীর পূর্ব্বদিকে এই নন্দনকানন ছিল। উদ্যানটি দীর্ঘে প্রস্থে খুব বৃহৎ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আশ্রয়প্রাপ্তি।

পাঠক, তুমি এতক্ষণ ধরিয়া জগদীশপ্রসাদের বাস্তুবাটী, ঠাকুরবাড়ী ও উদ্যানের বিষয় এক প্রকার শুনিলে, এখন একবার তাঁহার বাস্তুবাটীর দেহড়ীতে চল।

অধুনা বঙ্গদেশে যেমন ইংরাজি ধরণের ইষ্টকালয় দেখিতে পাই, ইহার পূর্ব্বে সেইরূপ মুসলমান ধরণের অনেক আবাসগৃহ নির্ম্মিত হইত। আজিও বঙ্গদেশের কোন কোন প্রাচীন হিন্দু জমিদারদিগের প্রাসাদ মুসলমান প্রণালীতে গঠিত হইয়া আছে। কিন্তু এক্ষণে—এই উনবিংশ শতাব্দীতে আর মহম্মদীয় প্রণালী নাই, কিন্তু ইউরোপীয় প্রণালী অনেকটা অনুকৃত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালির পক্ষে নূতন বলিয়া ভাবিবার প্রয়োজন নাই। যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে কোন্ জাতীয় মনুষ্য অনুকরণ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার পাইবার যোগ্য, তাহা হইলে আমরা বলিব —"আমরা"। বাস্তবিক, পরকীয় আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, অশন, বসন, শয়ন, ভবন—রং ঢং সং যা কিছু, সকল বিষয়েই প্রথম শ্রেণীর প্রথম অনুকরণকারী "আমরা"। আমাদের আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু অনুকরণক্ষমতা ষোল আনা আছে। যাহা হউক, এইরূপ সার্ব্বভৌমিক ও বৈরাট অনুকরণবৃত্তি আমাদের অন্ধকার ভবিষ্যৎকে আলোকিত করিবে কি আরও গাঢ়তর অন্ধতমসে ডুবাইবে, তাহার কিছুই জানি না। তবে কি না পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না জানিলেও স্থূলরূপে এইমাত্র জানি যে, এই সর্ব্বগ্রাসী অনুকরণ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম পর্য্যন্তও গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। বোধ হয়, আর কিছু কাল পরে বাঙ্গালি 'ওরকে ফিরিঙ্গি' এই নবজাতিগত মহোপাধিটি আপনা হইতেই আমাদের উপর বর্ত্তিবে। ভগবান্ জানেন, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ কিরূপ ভয়ানক বা ভরসাপ্রদ।

পরিবর্ত্তনশীল কালদেবতার তৌলদণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর মিঃ এ, বি, সি,

বিলাইচাঁড্ বানরজী এস্কোয়ার, রাধু, সাধু, মাধু প্রভৃতির সহিত ত্রয়োদশ শতাব্দীর জগদীশ প্রভৃতিকে ওজন করিয়া দেখিলে চিনিয়া উঠা ভার! এখন কোন কোন বঙ্গীয় ধনী বা মধ্যবিত্তের গৃহে প্রবেশ করিলে সহসা বোধ হয় যে, যেন কোন পিদ্ধব বাড়ীতে আসিয়াছি না কি? এই টেবিল—এই সানক—এই কাচের গেলাস—এই কাঁটাছুরী চাম্‌চে—এই হ্যাট-কোট-পেণ্টুলন—এই রাশিকৃত মদের বোতল! এই সব দেখিয়া কে বলিবে যে, ইহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর জগদীশপ্রসাদের দেশ? তাই বলিতেছি যে, ভগবান্ জানেন্ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ কিরূপ ভয়ানক বা ভরসাপ্রদ।

জগদীশপ্রসাদের অট্টালিকা প্রাচীন হিন্দুস্থপতিদিগের নির্ম্মিত, সুতরাং উহাতে আধুনিক কোন প্রকার অনুকৃতির লেশমাত্রও থাকিবার সম্ভাবনা কি? কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে স্থপতিকার্য্যের কিরূপ গঠনরীতি ছিল, তাহা এক্ষণে ঠিক করিয়া বলা দুঃসাধ্য। তবে এইমাত্র জানা যায়, তখন হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রণালীতে প্রায় অধিকাংশ এবং বঙ্গদেশের আদিম নিবাসীদিগের রীতিতে অল্পাংশস্থপিত কার্য্য সমাধা হইত। প্রসিদ্ধ পীঠস্থান কালীঘাটের কালীমন্দির প্রভৃতি বঙ্গভূমির আদিমনিবাসীর এবং কলিকাতাস্থ জগন্নাথের ঘাটের জগন্নাথদেবের মন্দির বৌদ্ধদিগের স্থপতিকার্য্যের পরিচয়-স্থল। কাশীতে বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি শিবলিঙ্গের যেরূপ মন্দির, তাহা বঙ্গদেশে অতি বিরল, কেবল মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি কোন কোন স্থলে জৈন কেঁয়েরা পার্শ্বনাথের মন্দির সেইরূপ ধরণে নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ মন্দির প্রথমে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বিরা সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলা বড় কঠিন। শুদ্ধ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এইটি ধরিয়া লইতে হইবে যে, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের ন্যায় যে সকল মন্দির, উহা প্রথমে হিন্দু-ধর্ম্মাবলীদিগের দ্বারা সৃষ্ট আর জগন্নাথদেবের মন্দিরের ন্যায় যে গুলির আকার, উহা আদৌ বৌদ্ধমতাবলম্বিগণের কৃত। এইরূপ মন্দিরের ন্যায় অট্টালিকা প্রভৃতিরও আদি সৃষ্টিকর্ত্তা সম্বন্ধীয় মূলানুসন্ধান করা নিতান্ত দুরূহ।

আমরা জগদীশপ্রসাদের অট্টালিকাকে হিন্দু ও বৌদ্ধ এই উভয় রীতির অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লইব। বৌদ্ধ-রীতি হিন্দুরীতির অন্তর্ব্বর্ত্তী, সুতরাং

ইহাকে আমরা পরকীয় অনুকরণ বলিব না। জগদীশপ্রসাদও এরূপ করাতে অপরাধী নহেন।

এ বিষয়ে এই পর্য্যন্ত। পাঠক! এইবার দর্শক সাজিয়া আমার সহিত জগদীশপ্রসাদের দেহুড়ীতে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর।—ঐ দেখ, বহির্দ্বার কত উচ্চ। উহার কপাট-ফলকদ্বয়ে কত স্থূলশিরা লৌহকীলক বিদ্ধ রহিয়াছে। এক্ষণে প্রাতঃকাল, সুতরাং দ্বার মুক্ত হইয়াছে। ঐ দেখ, বহির্দ্বারের বহির্ভাগ হইতে প্রথম মহলের দূরস্থিত অন্ত্য সীমা পর্য্যন্ত বেশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। দেহুড়ীর ভিতর দুই পার্শ্বে দ্বারবান্‌দিগের বিশ্রামস্থান। তথায় উহাদের অনায়াসবহনীয় রজ্জুগর্ভ খট্টাসমূহ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আছে। ঐ আবার, ঐ দেখ, দৌবারিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ ধূলি মাখিয়া দেহুড়ীর বহির্ভাগে ভুব্যায়াম, মুদ্গর সঞ্চালন ও নেজান আকর্ষণ-করিতেছে। এক এক জনকে দেখিলে কংস রাজার চানূর মুষ্টিকে মনে পড়ে। ঐ দেখ, নিক্ষিপ্ত কোমল মৃত্তিকার উপর বিশ্বেশ্বর তেওয়ারি ও গোবিন্‌লাল চৌবে বলপরীক্ষা বা বলবৃদ্ধি করিতেছে। মাধোলাল মিশির বৃদ্ধ, সুতরাং সে আর কুস্তীর দিকে নাই। সে এখন নন্দনকানন হইতে কতকগুলি বিল্বপত্র ও পুষ্প আনিয়া শিবপূজা করিতে বসিয়াছে।—বোধ করি, উহার মন বলিতেছে,"মাধোলাল! তুমিও এক সময়ে তেওয়ারি আর চৌবের ন্যায় মাটীর উপর আমাকে উলট পালট খাওয়াইতে, কিন্তু এক্ষণে তুমিই আবার সেই মাটীতে শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে বসিয়াছ। মাধো! তোমার সেই এক দিন আর এই একদিন! আমার সেই একদিন আর এই একদিন! এবং মাটীরও সেই একদিন আর এই একদিন! মাধোলাল! এই রকম সকলেরই।'

জগদীশপ্রসাদ প্রত্যহ প্রাতঃকালে প্রাণসম নন্দনকাননে বায়ুসেবন ও ভ্রমণ করিতে যান। আজিও তিনি উক্ত নিত্যক্রিয়া সম্পাদন করিয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন, কিন্তু অন্দরমহলে না গিয়া দেহুড়ীর বাহিরে একখানি কাষ্ঠাসনের উপর উপবিষ্ট রহিলেন। প্রত্যহ তিনি এমন সময়ে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল এই স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন। কেন? একটি মনুষ্যোচিত সৎকার্য্যের জন্য। সে কার্য্যটি কি? ভিক্ষুকদিগকে চাউল ও পয়সা দান। একজন দৌবারিক ভিক্ষুকগণকে চাউল ও অর্থ দিতে থাকে,

আর তিনি বসিয়া বসিয়া দেখিতে থাকেন। এক একদিন আপনিও স্বহস্তে এই মহৎ কার্য্যটি সম্পন্ন করেন। যখন তিনি দ্বারে দাঁড়াইয়া স্বভুজে দরিদ্র ভিক্ষার্থীদিগকে চাউল পয়সা দিতে থাকেন, তখন দেখিলে বোধ হয়, যেন তিনি মনে মনে বলিতে থাকেন, 'এই অপর্য্যাপ্ত অসীম কষ্টকর সংসার-দ্বারে অর্থাৎ গৃহদ্বারে আর থাকিতে চাহি না। ভিক্ষুকগণ! তোমরা আমার এই সামান্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়া, আমার একটি অসামান্য উপকার কর—আমাকে চিরানন্দপূর্ণ চিরপ্রার্থনীয় সেই দ্বার—সেই মহাদ্বার দেখাইয়া দাও। তোমরা ব্যতীত কে আমাকে সেই দুর্গম দ্বার দেখাইতে পারে?—বলবানের ক্ষমতা নাই—লক্ষপতির ক্ষমতা নাই—বিদ্বানের ক্ষমতা নাই—কেবল তোমাদেরই ক্ষমতা আছে। সেই মহাদ্বারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ঘোরতর অবিচ্ছিন্ন তমস-শঙ্কটে পড়িতে হয়, সুতরাং তোমরাই কেবল আলোক প্রদর্শন করিয়া লইয়া যাইতে পার।'

অদ্য জগদীশপ্রসাদ স্বীয় দ্বারদেশে ভিক্ষুক-বিদায় করিবার আশায় বসিয়া আছেন।—এক্ষণে বেলা অন্যূন এক প্রহর হইয়াছে।—দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি দরিদ্র শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। ক্রমে দানকার্য্য আরম্ভ হইল।—অদ্য জগদীশপ্রসাদ স্বহস্তে দান করিতেছেন। এমন সময়ে ভিক্ষুকদিগের মধ্য হইতে একটি বালক কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট আসিল। সে কোন কথা কহিল না, কেবল কাঁদিতে লাগিল।

জগদীশপ্রসাদ তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া পরের কষ্টের সহিত নিজের কষ্টের কতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা বুঝিতে পারিলেন।—বলিলেন, "বালক! তুমি কাঁদিতেছ কেন? অন্য কোন বালক কি তোমাকে মারিয়াছে?"

বালক বলিল, "কেহই আমাকে মারে নাই।" এই বলিয়া আবার কাঁদিতে কাঁদিতে নয়ন মার্জ্জন করিতে লাগিল।

জগদীশপ্রসাদ আবার বলিলেন, "তবে তুমি কি জন্য কাঁদিতেছ?"

বালক তাঁহার সেই কথার এই উত্তর দিল, "এখান হইতে নদিয়া কতদূর? সাতগাঁ কোন্ দিকে?"

জগদীশ ভাল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। আবার বলিলেন, "কেন?"

বালক।—"আমাদের নৌকাডুবী হইয়াছে। আমার পিতা মাতা আর বড় দাদা ডুবিয়া গিয়াছেন। আমিও ডুবিয়া গিয়াছিলাম। তাঁহারা সকলে ডুবিয়া কে কোথায় গিয়াছেন জানি না। বাঁচিয়া আছেন কি মরিয়া—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া বালক আর বাক্যোচ্চারণ করিতে পারিল না। আপনা-আপনি কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। কেবল অস্ফুটস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

জগদীশপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ আপনি স্বহস্তে তাহাকে উঠাইয়া বসাইলেন। একজন দ্বারবান্‌কে জল আনিতে বলিলেন। জল আনীত হইলে, দ্বারবান্ ঐ বালকের মুখে দিয়া কতকটা সুস্থির করিল।

জগদীশপ্রসাদ আবার বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় নৌকা-মগ্ন হইয়াছে? কখন হইয়াছে?"

বালক।—"গাঙ্গায় পরশু রাত্রিতে।"

জগদীশ।—"কি করিয়া?"

বালক।—"তা' জানি না। তবে এইমাত্র জানি, নৌকার মধ্যে হুহু করিয়া জল উঠিয়াছিল।"

জগদীশপ্রসাদ বুঝিতে পারিলেন, নৌকা বাণচাল হইয়া গিয়াছে। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

বালক।—"শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।"

জগদীশ।—"তোমার পিতার নাম?"

বালক।—"শ্রীগোলোকনাথ শর্ম্মা।"

জগদীশ।—"তোমার বয়ঃক্রম কত?"

বালক।—"চতুর্দ্দশ বৎসর।"

জগদীশ।—"তুমি নবদ্বীপ আর সপ্তগ্রামের নামোল্লেখ করিলে কেন?"

বালক।—"নবদ্বীপে আমাদের বাড়ী। সপ্তগ্রামে যাইতেছিলাম। তা'র পর গঙ্গায়—"

জগদীশপ্রসাদ বাধা দিয়া বলিলেন, "কেন সপ্তগ্রামে যাইতেছিলে?"

বালক।—"যে রাত্রিতে নৌকা ডুবে, সেই রাত্রিতে সন্ধ্যার সময় মুসল-মানেরা আমাদের বাড়ী লুঠ করে। আমার পিতা, পরে আরও বিপদ

ঘটিবে ভাবিয়া, আমাদিগকে লইয়া গোপনে নৌকা-আরোহণে সপ্তগ্রামে যাইতেছিলেন।—তার পর দুরদৃষ্টক্রমে—"

"আচ্ছা, সপ্তগ্রামে কি তোমাদের কোন আত্মীয় লোক আছেন?" জগদীশপ্রসাদ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

বালক বলিল, "তা আমি ভাল জানি না। তবে শুনিয়াছিলাম যে, সেখানে আমাদের পূর্ব্বনিবাস ছিল। আমার পিতামহ নবদ্বীপের রাজ-সরকারে কার্য্য করিবার জন্য স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন।"

জগদীশ।—"সপ্তগ্রামে তোমার কে আছে, তুমি তা জান না,—তবে সেখানে কি জন্য যাইবে?

বালাক।—"আমার পিতা যে যাইতেছিলেন।"

জগদীশ—"হয় ত তাঁহার কোন বন্ধুবান্ধব সেখানে থাকিতে পারেন। কিন্তু তোমাকে সেখানকার কে চিনে?"

জগদীশপ্রসাদের এইরূপ বাক্য শুনিয়া বালকের চিত্ত অত্যন্ত চিন্তিত হইল। সে আর সপ্তগ্রামের নাম মনোমধ্যে আঁকিয়া রাখিতে পারিল না।—জগদীশপ্রসাদের একটি কথাতেই বালকের নিকট সপ্তগ্রাম অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। বালক বিমর্ষ হইয়া অধোমুখে কি ভাবিতে লাগিল।

এ দিকে ক্রমে ক্রমে বালকের সঙ্গী ভিক্ষুকেরা কৃতকার্য্য হইয়া প্রস্থান করিল। ইহার সহিত তাহাদিগের অল্প সময়ের আলাপ, সুতরাং তাহারা যাইবার সময় ইহার বিষয় কিছুই ভাবিল না। জগদীশপ্রসাদের সহিত বালকের অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা হইতেছে দেখিয়া দুই তিন জন ভিক্ষুক যাইবার সময় এই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল, "এ ছোঁড়ার আজ সুপ্রভাত। কর্ত্তা মহাশয় হয় ত ইহাকে নূতন কাপড় দিবেন।"

অনন্তর জগদীশপ্রসাদ বালককে বলিলেন, "তুমি জলমগ্ন হইবার পর কিরূপে তীরে উঠিলে?—তুমি সাঁতার জান কি?"

বালক। "সাঁতার জানি না। নৌকা ডুবিয়া যাইবার সময় যে ঠিক কি রকম হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে আমি জানিলাম, যেন কিসে আট্‌কাইয়া গিয়াছি। অমনি তখন জানিতে পারিলাম, জলে একটা বড় গাছ পড়িয়া আছে—উহার কতকটা জলের ভিতর আর কতকটা

জলের উপর রহিয়াছে। সেই গাছটা নদীর তীর হইতে জলে হেলিয়া পড়িয়াছিল। উহা কি গাছ তাহা আমি তখন ঠিক্ করিতে পারি নাই। আমি সেই গাছটিতে আটক পড়িয়াছিলাম বলিয়া বাঁচিয়াছি, নতুবা নিশ্চয় মরিয়া যাইতাম। আমি সেই প্রাণদাতা বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে উপরে আসিলাম, কিন্তু মগ্নাবস্থায় অনেকটা জল খাইয়া ফেলিয়াছিলাম বলিয়া অনেকক্ষণ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। অবশেষে গলায় আঙ্গুল দিয়া বমি করিয়া ফেলিলাম। তখন আপনাকে কিঞ্চিৎ সুস্থবোধ করিলাম। কিন্তু সুস্থ হওয়া অপেক্ষা আমার মৃত্যু হইলে ভাল হইত।” বালক এই কথা বলিয়া আবার কাঁদিয়া উঠিল।

তখন জগদীশপ্রসাদ দেখিলেন, এক্ষণে বালককে আর কিছু বলা ভাল নহে। সে এইরূপ কথায় অত্যন্ত কষ্ট পায়। সুতরাং তাহাকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পাঠগৃহে।

জগদীশপ্রসাদ যে সময়ের লোক, সে সময়ে বঙ্গদেশে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন ছিল কি না, তাহা আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই না। কিন্তু জগদীশপ্রসাদ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জগদীশপ্রসাদের কন্যা দুইটি পুত্রস্থানীয়া। তিনি তাহাদিগকে বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিবার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি নিজে স্বয়ং একজন বিশিষ্টরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি ছিলেন, সুতরাং তাঁহার উত্তরাধিকারিণীদ্বয় ভবিষ্যতে যে পরিমাণেই হউক, কতকটা লেখাপড়া শিখিলে তাঁহার মনোবাঞ্ছা চরিতার্থ হয়। তিনি এই জন্যই পুত্রী দুইটিকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

এক্ষণে পূর্ব্বাহ্ণ। ও দিকে দুর্দ্দশাপন্ন ধীরেন্দ্রকে লইয়া জগদীশপ্রসাদ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন, এ দিকে পাঠগৃহে রামজয় বিদ্যানিধি কিরণ-

ময়ীকে পাঠাভ্যাস করাইতেছেন। কিরণময়ী শিক্ষার প্রথম পুস্তকখানি সমাপ্ত করিয়া দ্বিতীয়খানি আরম্ভ করিয়াছে। কিরণময়ী শিক্ষকের যত্নে ও আপনার বুদ্ধিবলে অল্প দিনের মধ্যে পিতার সন্তোষ বৃদ্ধি করিতেছে।

বিদ্যানিধি মহাশয় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। তাঁহার বয়ঃক্রম ষষ্টি বর্ষ হইয়াছে। তাঁহার সুবিস্তৃত ললাটদেশ তাঁহাকে একজন সুবিদ্বান বলিয়া পরিচয় দিতেছে। মস্তকের সম্মুখভাগে টাক পড়িয়াছে—পশ্চাদ্ভাগে ক্ষুরমুণ্ডিত হইলেও, সেই স্থান যে কেশোৎপাদনের পক্ষে উর্ব্বর, তাহা বিলক্ষণরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। বয়ঃক্রমানুসারে তাঁহার কেশ শুভ্রবর্ণ হইয়াছে।—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্যক্তির মুখের নিকটে দাড়ী গোঁপ কখনই বয়োবৃদ্ধ হইতে পারে না। তাহাদের সঙ্গে পণ্ডিতদিগের বড় শত্রুতা। এই জন্য বিদ্যানিধি মহাশয় ক্ষৌরকারকে বড় ভাল বাসেন। রামজয় পণ্ডিত হিন্দুধর্ম্মের একজন প্রথমশ্রেণীর ভক্ত। তিনি কপালে দীর্ঘ ফোঁটা কাটেন, গলায় ত্রিকণ্ঠী তুলসী মালা ধারণ করেন এবং সর্ব্বদাই মুখে হরিনাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তিনি ছয় ঋতুতেই পট্টবস্ত্র পরিধান করেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে প্রাণের ন্যায়, সর্ব্বদা একটি শম্বুকের নস্যাধার থাকে। তিনি আলস্য, নিদ্রা এবং শারীরিক ও মানসিক জড়তা দূর করিবার জন্য, সেই শম্বুককোষে শুষ্ক চূর্ণমিশ্রিত তাম্রকূটচূর্ণ পরিপূর্ণ করিয়া রাখেন। প্রয়োজন হইলে তন্মধ্য হইতে এক টিপ্ নস্য বাহির করিয়া নাসারন্ধ্রে স্পর্শ করাইয়া সুদীর্ঘ অন্তর্নিশ্বাসে আকর্ষণ করিয়া ফেলেন, অমনি আলস্য, নিদ্রা ও জড়তা কোথায় পলাইয়া যায়। কতক্ষণের জন্য তাহাদের আর অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি সর্ব্বদাই সাধুভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার শারীরিক বার্দ্ধক্য-বশতঃ বাক্যেরও বার্দ্ধক্য জন্মিয়াছে।—ফল কথা, একজন সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে যে সকল গুণ ও লক্ষণ থাকা চাই, তত্তাবৎ রামজয় বিদ্যানিধি পণ্ডিত মহাশয়ে বর্ত্তিয়াছিল। জগদীশপ্রসাদ তাঁহাকে বিশেষরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন।

পাঠগৃহের মধ্যস্থলে বিদ্যানিধির সম্মুখে বসিয়া কিরণময়ী আপনার পুরাতন পাঠ আলোচনা করিতেছে, আর বিদ্যানিধি মহাশয় নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া আদ্যোপান্ত শুনিতেছেন। কিন্তু মনুষ্য নানাচিন্তার চির-

কিঙ্কর। যে দিন হইতে মনের সৃষ্টি, সেই দিন হইতেই চিন্তা তাহার জীবন, সুতরাং যেখানে মন সেই খানেই চিন্তা—চিন্তামনের কখনই বিরহ ঘটে না। ইহাদের পরস্পরের বিচ্ছেদ সংঘটনেরই নাম মৃত্যু। যে দিন মানুষ মরিবে, সেই দিন মনও মরিবে। এক দিকে মনুষ্যের বায়ুজ প্রাণ দেহ ছাড়িয়া পলায়ন করিবে, অপর দিকে মনের প্রাণরূপ চিন্তা পলাইয়া যাইবে।—ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। বিদ্যানিধি মহাশয় মন দিয়া কিরণের পুরাতন পাঠ শুনিতেছিলেন বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে, কি জানি, কিসের চিন্তা আসিয়া তাঁহার মনকে অন্য স্থানে লইয়া যাইতেছিল। কাজেই তিনি থাকিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি বলিলে মা! আবার বল।"

কিরণময়ীও চিন্তার নূতন সহচরী। সেও পড়িতে পড়িতে অন্যমনস্ক হইতেছিল। তাহার তৎকালের অন্যমনস্কতার কারণ হিরণ্ময়ী। হিরণ্ময়ী পণ্ডিত মহাশয়ের পশ্চাতে কিঞ্চিদ্দূরে বসিয়া একটি কাষ্ঠ পুত্তলিকা লইয়া খেলা করিতেছিল, আর কিরণময়ীর উচ্চারিত এক একটি বর্ণ ও বাক্য এক একবার সুমধুর কণ্ঠে অস্ফুটস্বরে প্রতিধ্বনিত করিয়া পুতুলটিকে আপন মনে তালে তালে মৃত্তিকার উপর ফেলিতেছিল। পণ্ডিত মহাশয় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আছেন দেখিয়া, কিরণময়ী নিঃশঙ্ক চিত্তে হিরণ্ময়ীর পাঠাভ্যাস শুনিতেছিল এবং তাহার পুত্তলিকাক্রীড়া দেখিতেছিল। কিরণের মুখ পাঠ অধ্যয়ন করিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মন চিন্তার সঙ্গে ছুটিয়া গিয়া হিরণকে আলিঙ্গন করিতেছিল। এমন সময়ে চিন্তার পুরাতন সহচর নেত্র উন্মীলন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি বলিলে মা! আবার বল।"

অমনি চিন্তার নব সহচরী কিরণময়ী চমকাইয়া উঠিয়া আবার অধীত পাঠের সহিত সাক্ষাৎ করিল।—এইরূপে গুরুশিষ্যার পাঠকার্য্য চলিতেছে, এমন সময়ে ধীরেন্দ্রকে লইয়া জগদীশপ্রসাদ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

জগদীশপ্রসাদের প্রতি ক্রীড়ানিমগ্না হিরণ্ময়ীর সর্ব্বপ্রথমেই দৃষ্টি পতিত হইল। সে "এই বাবা, কোলে কর, বাবা!" বলিতে বলিতে পিতার নিকট দৌড়িয়া আসিল। তখন পণ্ডিত মহাশয় "আসিতে আজ্ঞা হউক" বলিয়া জগদীশপ্রসাদকে অভ্যর্থনা করিলেন। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের নমস্কার-

প্রতিনমস্কার-ব্যাপার চুকিয়া গেল। জগদীশপ্রসাদের সঙ্গে একটি অপরিচিত বালককে গৃহমধ্যে আসিতে দেখিয়া রামজয় বিদ্যানিধি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! এই বালকটি কে?"

তখন জগদীশপ্রসাদ ধীরেন্দ্রনাথের বিষয় আদ্যোপান্ত বলিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় তাহা শ্রবণ করিয়া দুঃখসহকারে কতকটা বিস্মিত হইলেন।

জগদীশপ্রসাদ ও রামজয় বিদ্যানিধি উভয়ের মধ্যে যে সময়ে ধীরেন্দ্রনাথের কথা হইতেছিল, সে সময়ে ধীরেন্দ্রকে দেখিয়া কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ীর দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিরণময়ী বালিকা হইলেও কিঞ্চিৎ বয়সের আধিক্যবশতঃ লজ্জার বশীভূতা আর হিরণ্ময়ী কিরণময়ীর অপেক্ষা বয়োন্যূন বলিয়া লজ্জার শাসনাধীন নহে। সুতরাং অপরিচিত বালককে দেখিয়া উভয়েরই দুই প্রকার দৃষ্টিপরিবর্ত্তন ঘটিল। কিরণময়ী প্রথমে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ অধ্যয়ন করিতেছিল, কিন্তু যেমন ধীরেন্দ্রকে দেখিল আর অমনি তাহার উচ্চ স্বর মৃদু হইয়া আসিল। সে এক একবার নবাগত বালকের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল আর আস্তে আস্তে অনুচ্চ স্বরে পাঠ অধ্যয়ন করিতে থাকিল। পরবালককে নিরীক্ষণ করিয়া লজ্জা যেন তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। কিন্তু এ দিকে হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রকে অপরিচিত বুঝিতে পারিয়াও ভ্রূক্ষেপ করিল না। সে ধীরেন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার সঙ্গে তুমি পুতুল খেলা করিবে?"

হিরণ্ময়ীর সেই সুমধুর কণ্ঠনিঃসৃত কথা কএকটি শুনিয়া ধীরেন্দ্র আত্মাবস্থা ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গিয়া তাহার দিকে চাহিয়া একবার ঈষৎ হাসিল। আবার তৎক্ষণাৎ অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

কথার উত্তর না পাইয়া হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রের হস্ত ধারণ করিল। তাহার মাতা তাহাকে একখানি লালরঙের কাপড় পরাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সে পাঠগৃহে আসিয়া উহা খুলিয়া গলদেশে ও স্কন্ধে জড়াইয়া রাখিয়াছিল। যখন সে ধীরেন্দ্রনাথের হস্ত ধারণ করিল, তখন বাম হস্তে সেই গলস্কন্ধবেষ্টিত বস্ত্রের একাংশ চর্ব্বণ করিতে করিতে দক্ষিণ হস্তে তাহার দক্ষিণ কর আকর্ষণ করিয়া বসন চর্ব্বিত মুখে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "তুমি কেন আমার সঙ্গে খেলিবে না? বড় দিদির সঙ্গে কি খেলিবে?"

হিরণ্ময়ীর কাণ্ডকারখানা দেখিয়া লজ্জিতা কিরণময়ী অধোমুখে একটু হাসিয়া উঠিল।

হিরণ্ময়ীকে ক্রোড়ে লইতে ধীবেন্দ্রনাথের অত্যন্ত ইচ্ছা হইল, কিন্তু স্বয়ং অপরিচিত বলিয়া তাহা পারিল না।

এ দিকে জগদীশপ্রসাদ আবাব বিদ্যানিধিকে বলিলেন, "মহাশয়! এই বালকটিকেও আপনি লেখা পড়া শিখাউন। এখন যেকালে আমি ইহার প্রতিপালনের ভাব লইয়াছি, তখন বিদ্যাশিক্ষাব ভাবও লইতে হইবে। যত দিন ইহার পিতামাতা ও অগ্রজের কোন সন্ধান না পাইতেছি, তত দিন ইহাকে পুত্রের ন্যায় দেখা কর্ত্তব্য।

বিদ্যানিধি বলিলেন, "ইহা আপনাব ন্যায় দয়ালু ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য কার্য্য বটে। যাঁহাব আশ্রয়ে প্রতিদিন শত শত লোক প্রতিপালিত হইতেছে, তাঁহার নিকট ইহা কোন্ বিচিত্র বিষয়?" এই কথা বলিয়া তিনি এক টিপ্ নস্য গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে ধীবেন্দ্রনাথেব ভরণপোষণ ও শিক্ষালাভেব বন্দোবস্ত হইয়া গেল। ধীবেন্দ্র জগদীশপ্রসাদেব এই সদাশয়তায় অত্যন্ত আনন্দিত হইল, কিন্তু তথাপি তাহার হৃদয়ে যেন কিসের অত্যন্ত কষ্ট রহিয়া গেল। সে কষ্ট যে কি, তাহা পাঠককে আব বলিতে হইবে না।

অনন্তর বিদ্যানিধি মহাশয় সে দিনকার মত বিদায় হইলেন। জগদীশ-প্রসাদও দুইটি কন্যা ও ধীরেন্দ্রকে লইয়া বাটীর মধ্যে গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধান।

জগদীশপ্রসাদের পুত্রবৎ অকৃত্রিম স্নেহে ধীরেন্দ্রনাথ প্রতিপালিত হইতে লাগিল। যখন যাহা প্রয়োজন হয়, তাহাই পায়। অধিক আর কি বলিব, একজন ধনীর পুত্র যে অবস্থায় কালযাপন করিয়া থাকে, ধীরেন্দ্রনাথ ঠিক্ সেই অবস্থায় রহিল। এইরূপে পাঁচ ছয় মাস অতীত হইয়া গেল।

এক দিন জগদীশপ্রসাদ সন্ধ্যার পর গৃহমধ্যে বসিয়া সংস্কৃত রামায়ণ পাঠ করিতেছেন, এমন সময়ে ধীরেন্দ্র তাঁহার নিকট আসিয়া বসিল। জগদীশ-প্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আহার করিয়াছ?"

ধীরেন্দ্র অধোমুখে যেন কি ভাবিতে ভাবিতে উত্তর দিল, "আজ্ঞা করিয়াছি।"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "অমন করিয়া বলিলে কেন?—কেহ কি তোমায় কিছু কষ্টকর কথা বলিয়াছে?"

ধীরেন্দ্র।—"না।" এই বলিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া অশ্রু মোচন করিল।

জগদীশপ্রসাদ তাহা দেখিতে পাইয়া, তাহার পৃষ্ঠে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে কহিলেন, "তুমি কাঁদিতেছ কেন?—বল না কি হইয়াছে?"

ধীরেন্দ্র।—"আপনি কি অনুসন্ধান পাইয়াছেন?"

জগদীশপ্রসাদের অন্তঃকরণ চঞ্চল হইল। তিনি রামায়ণের পুথি বন্ধ করিলেন। কহিলেন, "ধীরেন্! আজিও কি তুমি ভুলিতে পার নাই?"

ধীরেন্দ্র কোন উত্তর করিল না।

জগদীশপ্রসাদ আবার বলিলেন, "আচ্ছা, আমি আগামী কল্য নবদ্বীপে ও সপ্তগ্রামে দুই জন লোক প্রেরণ করিব। তুমি আর ভাবিও না। যাও শয়ন কর গিয়ে।" ধীরেন্দ্র বালক, শয়ন করিলেই নিদ্রা আসিবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে সে আর চিন্তা করিবে না, এই ভাবিয়াই তিনি তাহাকে শয়ন করিতে যাইতে বলিলেন।

ধীরেন্দ্র ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কিন্তু জগদীশপ্রসাদ আর পুথি খুলিলেন না। তিনি ধীরেন্দ্রনাথের পিতা মাতা ও ভ্রাতার অনুসন্ধানের জন্য নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। তখন তিনিও শয়ন করিতে গেলেন।

এ দিকে জগদীশপ্রসাদের শয়নগৃহে জাহ্নবী দেবী ও জগদীশপ্রসাদের বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনী বসিয়া ধীরেন্দ্রনাথের কথা কহিতেছিলেন। এই বিধবা স্ত্রীলোকটির নাম অম্বিকা। জাহ্নবী দেবী অম্বিকাকে বলিলেন, "হ্যা দেখ, ঠাকুরঝি! ছেলেটি বড় শান্ত ও বুদ্ধিমান। সর্ব্বদাই আমাকে ভক্তি

করে। আমি ধীরেন্দ্রকে পুত্রের মত নিরীক্ষণ করি—পরপুত্র বলিয়া ক্ষণ-কালও ভাবি না। আর দেখ, এই পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে ছেলেটি কেমন লেখা পড়া শিখিয়াছে। অন্য বালক যাহা দশ মাসেও শিখিতে পারে না, ধীরেন্দ্র তাহা এই কএক মাসেই অভ্যস্ত করিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, ধীরেন্দ্র যেমন শান্ত, তেমনি বুদ্ধিমান্।”

অম্বিকা মনঃসংযোগ করিয়া জাহ্নবীর মুখনিঃসৃত ধীরেন্দ্র-প্রশংসা শুনিতেছিলেন, আর এক এক বার ভাবিতেছিলেন, ধীরেন্দ্র যদি তাহার পিতা মাতা ও অগ্রজকে না হারাইত, তবে এই সময়ের মধ্যে আরও লেখা পড়া শিখিতে সক্ষম হইত। তবু যা’ হউক, এত চিন্তিত হইয়াও সে যেমন বিদ্যার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছে, তাহা মধুপুরের কোন্ বালক এই বয়সে পারিয়াছে?” অম্বিকা এইরূপ চিন্তা করিয়া একটি জৃম্ভন ত্যাগ করিলেন। সেই সময় তাঁহার নেত্রদ্বয়ে আপনা আপনি অনাহূত অশ্রুসঞ্চার হইল। তিনি দুই চক্ষে দুই হস্ত দিয়া শিথিল ঘর্ষণে উহা মোচন করিতে করিতে বলিলেন, “বৌ! তবে এখন আমি শয়ন করি গিয়ে। কাল আবার খুব সকালে উঠিতে হইবে।” এই বলিয়া অম্বিকা আপনার শয়নগৃহে প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে জগদীশপ্রসাদ শয়নকক্ষে আসিলেন। জাহ্নবী তাঁহাকে দেখিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, “আজ যে এত সকাল সকাল এলে? নিদ্রার প্রতি বুঝি দয়া জন্মিয়াছে? ভাল।”

“ও গো, তা নয়। ধীরেন্দ্রনাথের জন্য ভাবনা জন্মিয়াছে।” এই বলিয়া সহধর্ম্মিণীর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন।

জাহ্নবী শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “সে কি? ধীরেনের কি কোন অসুখ হইয়াছে? সে এই যে কিছু আগে আহার করিয়া তোমার কাছে গেল। এখন্ সে কোথায়?”

জগ। “শয়ন করিতে গিয়াছে। তাহার কোন অসুখ হয় নাই।”

জাহ্নবী। “তবে তোমার আবার কিসের জন্য ভাবনা হ’ল?”

জগ।—“তাহারই ভাবনার জন্য।”

জাহ্নবী।—“তাহার আবার কিসের ভাবনা? সে কি আমাদের নিকট থাকিয়া মনে মনে কষ্ট বোধ করে?”

জগ।—"তা' কি তুমি আজিও বুঝিতে পার নাই ?"

জাহ্নবী।—"কই না। আমি অত তন্ন তন্ন করিয়া কিছুরই অনুসন্ধান করি না। সে কি তোমাকে তাহার কষ্টের কথা খুলিয়া বলিয়াছে ?"

জগ।—"প্রায়ই ত বলে, কিন্তু আজ এই কতক্ষণ সে যে প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করিল, তাহা দেখিয়া কে তাহাকে সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত বলিতে পারে ?"

জাহ্নবী।—"তুমি আমাকে তাহা বলিবে না কি ?"

জগ।—"তোমাকে বলিব বলিয়াই ত আজ সকাল সকাল এখানে আসিলাম !" এই বলিয়া তিনি ক্ষণ কাল কি চিন্তা করিয়া নীরব রহিলেন। আবার বলিলেন, "হ্যা দেখ, ধীরেন্দ্র তাহার পিতা মাতা ও অগ্রজের জন্য সর্ব্বদাই চিন্তিত এবং দুঃখিত। সে এত সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও সুখী নহে।"

জাহ্নবী এতক্ষণে জগদীশ বাবুর ভাবনার কারণ বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, "তবে তা'র এখন্ কি করিবে ?"

জগ।—"কাল প্রাতে নবদ্বীপ ও সপ্তগ্রামে দুই জন লোক পাঠাইব। একবার সন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা উহার চিন্তা ক্রমশঃ উহাকে জীর্ণ শীর্ণ করিবে।"

স্বামীর এই কথাগুলি শ্রবণ করিয়া জাহ্নবী দেবীও চিন্তিত হইলেন। অনেকক্ষণ ভাবিবার পর বলিলেন, "যদি সন্ধান পাওযা যায়, তবে তুমি কি করিবে ?"

জগ।—"ধীরেন্দ্রকে তাহার পিতা মাতার নিকট পাঠাইয়া দিব।"

জাহ্নবী।—"আর যদি না পাওয়া যায়।"

জগ।—"তা' হ'লে তাহাকে নিশ্চিন্ত করিব।—এক বার সন্ধান না করিলে তাহার চিন্তা দূর হইবে না ; কারণ, সে ভাবিয়া ঠিক করিয়াছে যে, অনুসন্ধানে তাহার পিতা মাতার খবর পাওয়া যাইবে। কাজেই আমাকে তাহা না করিলে, কার্য্যটা ভাল দেখায় না।"

"তবে তাহাই করা উচিত হইতেছে।" জাহ্নবী দেবী এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীরব হইলেন।

অনন্তর উভয়ে শয়ন করিলেন। অনেকক্ষণ উভয়েই ধীরেন্দ্রের চিন্তায় চিন্তিত থাকিয়া ক্রমে নিদ্রিত হইলেন। তখন সকল চিন্তাই বিলীন হইল।

রাত্রি প্রভাত যইয়া গেল। জগদীশপ্রসাদ, জাহ্নবীদেবী ও বাটীস্থ সকলেই জাগরিত হইলেম। সে দিন প্রভাতে জগদীশ প্রসাদ আর বায়ু সেবনার্থ নন্দনকাননে গেলেন না। প্রাতঃক্রিয়া সমুদয় সম্পাদন করিয়া একখানি অঙ্গমার্জ্জনীতে মুখ মুছিতে মুছিতে একবারে বৈঠকখানায় আসিলেন।

আসিয়া জমাদারকে ডাকিলেন। জমাদার উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিল।

জগদীশ বলিলেন, "জয়মঙ্গল তেওয়ারী! তুমি হারাধন দত্ত ও কালিদাস ঘোষালকে শীঘ্র এখানে ডাকিয়া আন।" এই দুই ব্যক্তি জগদীশপ্রসাদের বিশ্বাসী সরকার।

জমাদার শিরোনমন করিয়া প্রস্থান করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে জয়মঙ্গল তেওয়ারী হারাধন ও কালিদাসকে লইয়া বৈঠকখানায় পুনর্ব্বার আসিল।

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "দেখ, হারাধন! কালিদাস! তোমরা অদ্যই সকাল সকাল আহারাদি করিয়া লও। বিশেষ কার্য্য পড়িয়াছে। তোমরা দুই জন না হইলে উহা সংসাধিত হইতে পারিবে না।"

হারাধন।—"কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন্।"

জগ।—"তোমাকে নবদ্বীপে আর কালিদাসকে সপ্তগ্রামে যাইতে হইবে।"

হারা।—"কি প্রয়োজনে, মহাশয়?"

তখন জগদীশপ্রসাদ ধীরেন্দ্রনাথের বিষয় আদ্যোপান্ত বিশেষ করিয়া বলিলেন। হারাধন দত্ত ও কালিদাস ঘোষাল সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিল, "অদ্যই কি যাইতে হইবে?"

জগ।—"নিশ্চই।" এই বলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "দেখ, অনুসন্ধানের যেন তিলমাত্রও ত্রুটি না হয়। গোলোকনাথ বা তাঁহার সহধর্ম্মিণী তারাসুন্দরী দেবী কিংবা জ্যেষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্রনাথের মধ্যে যে কোন একজনেরও সন্ধান লইয়া

আসিবে। সন্তোষকর সংবাদ দিতে পারিলে আমি তোমাদিগকে বিশেষরূপে সন্তুষ্ট করিব।"

হারা।—"আমরা সাধ্যসত্ত্বে কিছুই ত্রুটি করিব না। আপনি প্রভু, আপনার আদেশ পালনে কখন কোনরূপ ত্রুটি বা ছল করি নাই, পরেও করিব না।"

কালিদাস ঘোষাল জগদীশপ্রসাদকে বলিল, "ধর্ম্মাবতার! আমাদের সঙ্গে কি আর কোন লোক জন যাইবে?"

জগ।—"যদি ইচ্ছা কর, তবে দুই জনে দুই জন দ্বারবান্ ও দুই জন ভৃত্য লইয়া যাইতে পার। আর দেখ, দেওয়ানজীর নিকট হইতে তোমাদের গমনাগমনের পাথেয় লইয়া যাও।" এই বলিয়া তিনি আবার ত্বরা দিতে লাগিলেন।

তখন দুই জন সরকার জগদীশপ্রসাদকে অভিবাদনাদি করিয়া বৈঠকখানা হইতে নির্গত হইল। অনন্তর স্নানাহার শেষ করিয়া হারাধন দত্ত নবদ্বীপ ও কালিদাস ঘোষাল সপ্তগ্রামাভিমুখে যাত্রা করিল। তাহাদিগের প্রত্যেকের সঙ্গে এক জন দ্বারবান্ ও এক জন ভৃত্যও চলিল।

এ দিকে জগদীশ বৈঠকখানায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে এক একবার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ কেশ-গুচ্ছের মধ্যে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন, আবার কখন কখন উভয় হস্তে শিথিল-মুষ্টি আবদ্ধ করিয়া মুখাগ্রে রাখিয়া ফুৎকার দিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন যুগলের দৃষ্টি এক একবার কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া এক পদার্থের উপর পতিত রহিল। আবার এক একবার তিনি নেত্র নিমীলন করিয়া বামহস্তে বামগণ্ড রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চাপে দক্ষিণ পদে অঙ্গুলি গুলি আস্তে আস্তে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া কে বলিবে যে, তিনি নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন? এই সকল লক্ষণ যে চিন্তার কারণ, তাহা আমরাও জানি।

এমন সময়ে এক জন ভৃত্য আসিয়া বলিল। "মহাশয়! নায়িবার জল তুলা হ'য়েছে।"

জগদীশপ্রসাদ তখন নয়ন মুদ্রিত করিয়া ভাবিতেছিলেন, ভৃত্যের কথা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবার কিয়ৎক্ষণ পর উত্তর করিলেন, "যাইতেছি।"

ভৃত্য প্রস্থান করিল। তাহার পর তিনিও স্নানগৃহে গমন করিলেন। কিন্তু চিন্তা তাঁহাকে ছাড়িল না। এ চিন্তা কিসের, তাহা আর পাঠককে বলিতে হইবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধানের ফল।

যথা সময়ে হারাধন দত্ত নবদ্বীপে এবং কালিদাস ঘোষাল সপ্তগ্রামে পহুঁছিল। জগদীশপ্রসাদ যাহা যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহারা তত্তাবৎ প্রতিপালন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এক দিনে কোন সন্ধান মিলিল না বলিয়া, উভয়ে বাসা গ্রহণ করিল।

অনন্তর উভয়ে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু কোনরূপ শুভজনক সংবাদ পাইল না। ক্রমে পাঁচ ছয় দিন অবস্থান করিয়া দুই জনেই মধুপুরে প্রত্যাগত হইল। প্রথমে হারাধন দত্ত, তাহার পর কএক দিন বাদে কালিদাস ঘোষাল জগদীশপ্রসাদের নিকট উপস্থিত হইল।

হারাধন আসিয়া বলিল, "মহাশয়! আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। তিন জনের মধ্যে এক জনকেও দেখিতে পাইলাম না। সেখানকার লোকেরা আমাকে বলিল যে, "গোলকনাথ এখানে ছিলেন। তিনি এক জন গণ্য মান্য ধনী ব্যক্তি। কিন্তু আমরা তাঁহাকে পাঁচ ছয় মাস হইতে দেখিতে পাইতেছি না। তিনি যে সপরিবারে কোথায় গিয়াছেন, তাহা জানি না। তাঁহার অনেক বিষয় সম্পত্তি ছিল, কিন্তু তাহাও যে কি হইল, বলিতে পারি না। এখানে মুসলমানেরা আসিয়া প্রথমতঃ যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাতে অনেকেই দেশত্যাগী, ধনত্যাগী ও প্রাণত্যাগী হইতে হইয়াছে। আমরা জানিয়াছি গোলোকনাথ তাহাদেরই অত্যাচারে পীড়িত হইয়াছিলেন। মুসলমানেরা তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাঁহাকে সপরিবারে নিহত করিয়াছে, কি

তিনি এ স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছেন, তাহা আমরা বিশেষ করিয়া বলিতে পারি না, তবে ইহাও জানি যে, তিনি তাহাদেরই অত্যাচারে নবদ্বীপে নাই।"

হারাধন এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীরব হইল। জগদীশপ্রসাদ ভাবিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গোলোকনাথ পরিত্যক্ত বাস্তবাটী দেখিয়া আসিয়াছ?"

হারা।—"আজ্ঞে, দেখিয়াছি। তাঁহার অট্টালিকা দেখিয়া তাঁহাকে নিশ্চয়ই এক জন বিশিষ্টরূপ ধনী বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আর কি বলিব, এক্ষণে সেই হিন্দুগৃহে মুসলমানেরা বাস করিতেছে। গোলোকনাথের বিষয় সম্পত্তির অধিকাংশই সেই অট্টালিকা হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে, অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল, তাহা সেই অট্টালিকাবাসী যবনেরা ভোগ করিতেছে।"

হারাধনের প্রমুখাৎ জগদীশপ্রসাদ এই সকল দুঃখজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "জগদীশ্বর! তোমার ইচ্ছা মানুষিক ইচ্ছার অতীত। তুমি যে কাহাকে কিরূপ কর, তাহা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষের কি শক্তি বুঝিতে পারে? আর তোমার সৃষ্ট অদৃষ্টচক্র যে কিরূপ পরিবর্ত্তনশীল হইয়া পলকে পলকে নূতন নূতন গতিতে ঘুরিতেছে, তাহাও মানবী চিন্তার অজ্ঞেয়। দেব! তোমাকে এই কএকটি কথা বলিতে আমার যতটুকু সময় লাগিল, এই সময়ের মধ্যেই তোমার অসীম বিশ্বরাজ্যের কত স্থানে কত কি ঘটিয়া গেল। ইহা ভাবিতে গেলেও হৃৎকম্প হয়। বিশ্বপতি! তোমারই চক্রে—অনাথ বালক ধীরেন্দ্রনাথের সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আহা, সে শিশু, কিছুই জানে না। এই অল্প বয়স হইতেই তাহার ভাগ্যচক্রের এই মহাপরিবর্ত্তন, না জানি ভবিষ্যতে আরও কি হইবে। জগদীশ্বর! তুমিই একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ, তুমিই জীবের সমস্তই জান। তোমার ইচ্ছা, কার্য্য, বিবেচনা মানুষে কি বুঝিবে?" অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই কথা গুলি বলিয়া জগদীশপ্রসাদ আরও কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

হারাধন বলিল, "যদি মহাশয়ের আদেশ হয়, তবে এক্ষণে গৃহে গমন করি।"

জগদীশপ্রসাদ তাহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। সেও প্রস্থান করিল।

জগদীশপ্রসাদ ক্রমে ক্রমে ধীরেন্দ্রনাথের ভাবনায় অত্যন্ত অস্থির হইলেন আর সেখানে থাকিতে পারিলেন না—অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

কিছু দিন গত হইল। কালিদাস ঘোষাল মধুপুরে ফিরিয়া আসিল। জগদীশপ্রসাদের একটি শেষ আশা ছিল, তাহাও বিনষ্ট হইল। কালিদাস জগদীশপ্রসাদকে বলিল, "বাবু মহাশয়! সপ্তগ্রামের বৃদ্ধ লোকেরা বলিলেন গোলোকনাথ শর্ম্মা সেখানে যান নাই। তাঁহারা আরও বলিলেন যে, গোলোকনাথ তাঁহার পিতার সহিত শৈশবকালে এখানে দুই তিন বার আসিয়াছিলেন, তাহার পর আর আসেন নাই।"

জগদীশপ্রসাদ নীরব হইয়া এই কএকটি বাক্য শুনিলেন। তাহার পর বলিলেন, "সেই সপ্তগ্রামবাসী বৃদ্ধেরা তোমাকে আর কি বলিলেন? আর তুমিই বা তাঁহাদিগকে কি বলিলে?"

কালিদাস বলিল, "তাঁহারা গোলোকনাথের অপর যে সব কথা বলিলেন, তাহাতে তাঁহাকে এক জন ভাল ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ হইল। আমি আর কিছু বলি নাই।"

জগ।—"তিনি যে সপরিবারে নৌকামগ্ন হন, সে কথা তাঁহাদের কাছে উত্থাপন করিয়াছিলে?"

কালি।—"আজ্ঞে না।"

জগদীশ।—"ভালই করিয়াছ; কারণ, দুঃখের কথা তাঁহাদিগকে শুনান কর্ত্তব্য নহে। যদি তাঁহাদিগের মধ্যে গোলোকনাথ শর্ম্মার কেহ আত্মীয় থাকিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইত।" অনন্তর জগদীশ-প্রসাদ কালিদাসকে বিদায় দিলেন।

মনুষ্য আশার দাস—মনুষ্যের মন আশার প্রসাদভিক্ষুক আর তাহার জীবন আশার অধীন। মানুষ সমস্তই ভুলিতে পারে, কিন্তু আশাকে ভুলিতে পারে না। সে যে দিন আশাকে ভুলিবে, সে দিন সে আপনাকেও ভুলিবে। তখন সে জীবিত থাকিয়াও মৃতপ্রায় হইবে। জগদীশপ্রসাদেরও তাহাই ঘটিল।—তিনি প্রথম কুসংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষসংবাদটি ভাল হইবে বলিয়া কতকটা সুস্থির ছিলেন; আশাকে

ষোড়শোপচারে পূজা করিতেছিলেন। কিন্তু মায়াময়ী আশা তাঁহাকে ছলনা করিয়া চলিয়া গেল। তাঁহার আশার্চ্চনা পণ্ড হইল। তখন তিনি অধিকতর চিন্তা করিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, "ধীরেন্দ্রকে কি বলিব—কি বলিয়া বুঝাইব?" আবার ভাবিলেন, "সজ্ঞানে কখন মিথ্যা কথা কহি নাই, অদ্য তাহাই কহিব। ধীরেন্দ্রকে মিথ্যা কথায় প্রবোধ দিয়া সান্ত্বনা করিব। এরূপ মিথ্যা কথায় আমার পাপ হইবে না বোধ হয়।" আবার ভাবিলেন, "না—তাহা বলিব না; বলিলে কি হইবে? প্রকৃত কথা বলিয়া ধীরেন্দ্রকে বুঝাইব। ধীরেন্দ্র ত এখন আর একেবারে শিশু নহে, বুঝাইলে বুঝিতে পারিবে। আমি তাহাকে আপনার পুত্রের মত দেখি। আমি যত দিন বাঁচিব, তত দিন তাহাকে ত্যাগ করিব না।"

জগদীশপ্রসাদ কতক্ষণ ধরিয়া এইরূপ ভাবিলেন। তাঁহার পর আরও কত কি ভাবিলেন,এমন সময়ে এক জন ভৃত্য তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা মহাশয়! আপনার কাছে ধীরেন্দ্রনাথ আসিতে চাহিতেছেন।"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "এখানে আর আসিতে হইবে না। তাহাকে বাড়ীর ভিতর যাইতে বল্। আমিও যাইতেছি।

ভৃত্য প্রস্থান করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জগদীশপ্রসাদও অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সান্ত্বনা।

"কি করিব, বাপু! আমি ত সন্ধান করিবার ত্রুটি করি নাই, কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় আর তোমার দুরদৃষ্টক্রমে তিন জনের মধ্যে কাহারই কোন খোঁজ খবর পাওয়া গেল না।" জগদীশপ্রসাদ ধীরেন্দ্রকে এই বলিয়া তাহার কেশগুলি অঙ্গুলি দিয়া পরিষ্কার করিতে লাগিলেন।

ধীরেন্দ্র জগদীশপ্রসাদের মুখে এই নির্ঘাত বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল। তাহার অন্তরনিহিত আশা অলক্ষ্যে কোথায় চলিয়া গেল।

সে যাইবার সময় একাকিনী গেল না, ধীরেন্দ্রনাথের যে কয়টি ভাল জিনিষ; তাহাও লইয়া গেল। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ধীরেন্দ্রকে যেরূপ দেখিয়াছি, এক্ষণে আর সেরূপ দেখি না। ধীরেন্দ্র অন্তরে ও বাহিরে আর একরূপ হইয়া উঠিল। তাহার মুখমণ্ডলের আর সৌন্দর্য্য নাই—অন্তরে আলোক নাই—হৃদয়ে আনন্দ নাই। সকলই ঘুচিয়া গেল।—তাহার নয়ন ছলছল করিয়া উঠিল—দুই একটি করিয়া অশ্রুবিন্দু পড়িতে লাগিল।

জগদীশপ্রসাদ তাহার এই অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। আপনি তাহার নয়ন মার্জ্জনা করিয়া দিয়া কহিলেন,—

"বাবা! কাঁদিলে কি হইবে? তুমি ত নিতান্ত শিশু নও—কতক বুঝিতে সুঝিতে পার, তবে কেন ভাবিতেছ? মানুষের অবস্থা চিরকাল কি সমান যায়? তোমার অপেক্ষা কত লোকের কত বিপদ ঘটে। তারাও ত সময়ে সময়ে ধৈর্য্য ধারণ করে। তবে তুমি কেন আর এত অধীর হইতেছ? আমি তোমাকে আপনার পুত্রের মত ভালবাসি। তোমার যাহাতে কোন কষ্ট না হয়, সর্ব্বদা তাহাই করিয়া থাকি। তুমি তোমার পিতামাতার কাছে যেরূপ আদরে ছিলে, আমাদের কাছে কি তাহার অপেক্ষা অল্প সুখ-সচ্ছন্দতায় আছ?"

ধীরেন্দ্র ধীরে ধীরে বলিল, "না, মহাশয়! আমি এখন আপনার কাছে খুব সুখে আছি। আপনি যে এই অনাথকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন, আমি তাহা ভালরূপে জানি। আর আপনি আমাকে আশ্রয় না দিলে, আমি এত দিন জীবিত থাকিতাম কি না সন্দেহ।" এই বলিয়া অশ্রুমোচন করিল।

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "তবে তুমি সর্ব্বদা এত বিষন্ন হইয়া থাক কেন? বিশেষতঃ অদ্য তোমাকে আমি যেরূপ দেখিতেছি, পূর্ব্বে একটি দিনও এরূপ দেখি নাই।"

ধীরেন্দ্র বলিল, "আজ আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও সুস্থির হইতে পারিতেছি না।"

জগদীশপ্রসাদ এই কএকটি কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "ধীরেন্দ্র এখনো বালক, ইহার বুদ্ধিশক্তি এখনও অপক্ক, সুতরাং পিতামাতার শোকে

যে অত্যন্ত কাতর হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কিছু দিন পরে অবশ্য ইহার এই শোক অনেক লাঘব হইয়া যাইবে। প্রথমাবস্থায় শোক যতদূর পরাক্রম প্রকাশ করে, শেষাবস্থায় আর তাহা ততদূর করিতে পারে না। শোক যদি বরাবর সমান ভাবে মানবহৃদয়কে নিপীড়িত করিত, তাহা হইলে এত দিন পৃথিবীতে এত লোক জীবিত থাকিত না। সকলেরই উৎপত্তি ও নিবৃত্তি আছে।" এই বলিয়া ধীরেন্দ্রকে আর কিছু বলিলেন না।

এমন সময়ে সেই গৃহমধ্যে জাহ্নবী দেবী আসিলেন। ধীরেন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল, "মা! তোমাকে আর গঙ্গার দেবীর পূজা দিতে হইল না।—আমার পিতা মাতার আর দাদার কোন সুখবর পাওয়া গেল না। মা! তাঁহাদের মধ্যে আর কেহই জীবিত নাই মা!" এই বলিয়াই জগদীশপ্রসাদের ক্রোড়ের উপর পড়িয়া গেল।

জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবী দেবী অতিশয় শশব্যস্ত হইলেন।

জাহ্নবী দেবী বলিলেন, "বাবা ধীরেন্! এত অধীর হইলে কি হইবে, বাবা? শান্ত হও, এখন না হইল, এর পরেও ত সুখবর পাওয়া যাইতে পারে। ভয় কি, কিসের দুঃখ? তোমার পিতা মাতা ভ্রাতা জীবিত আছেন। তুমি আর শোক দুঃখ করিও না—সুস্থির হও।" এই বলিয়া তিনি স্বামিক্রোড়পতিত শোকার্ত্ত ধীরেন্দ্রকে আপনার ক্রোড়ে লইলেন।

জগদীশপ্রসাদও তাহাকে নানাবিধ সান্ত্বনা বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন। ধীরেন্দ্র আর কোন কথা উচ্চারণ করিতে পারিল না, কেবল নেত্রজলে তাহার মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার দুঃখ শোক অপরে কি কখন সমান ভাবে বুঝিতে পারিবে? কখনই না। সে আপনিই তাহা বুঝিতেছে বলিয়া এত কাঁদিতেছে।

অনন্তর তাহাকে লইয়া জাহ্নবী দেবী ও জগদীশপ্রসাদ সেই কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কালচক্র।

আমরা জানি, শকট-চক্রে পতিত হইলে জীব পেষিত হইয়া মরিয়া যায়, কিন্তু কালচক্রের কার্য্য অন্যরূপ।—কালচক্র প্রতি আবর্ত্তনে শত শত জীবকে পেষণ করিয়া যেমন নিধন করে, সেইরূপ আবার শত শত প্রাণীকে উৎপন্নও করিয়া থাকে। অনেকেই কালচক্রের আবর্ত্তনকে কেবল দুঃখের কারণ বলিয়া জানে, কিন্তু আমরা ইহাকে সুখ ও দুঃখ উভয়েরই বীজ বলিয়া বিশ্বাস করি। এই স্থলে আমরা কালচক্রের একবার স্তব করিব। পাঠক-বর্গের কর্ণে উহা ভাল না লাগিলেও, ক্ষমা করিবেন। কেন না, আমাদের বিবেচনায় মনুষ্যের স্তব করা অপেক্ষা কালচক্রেরই বন্দনা সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। তবে এক্ষণে কালচক্রের স্তব আরম্ভ করা যাউক্;—

হে অনিবার্য্যগতিশীল অখণ্ড প্রতাপ কালচক্র!—তোমাকে নমস্কার। তোমার একদিবরাত্রিক গতির নাম সংক্রমণ—তিন শত পঞ্চষষ্টি দিবস ষষ্ঠ ঘটিকাপরিমিত অর্থাৎ একবার্ষিক সংক্রমণের নাম আবর্ত্তন—আর শতবাৎ-সরিক আর্ত্তনের নাম মহা-আবর্ত্তন। অতএব তোমাকে নমস্কার।

হে চিরভ্রমণকারিন্! কাহার এমন ক্ষমতা আছে যে, তোমার সহিত সমান ভাবে সমান পরাক্রমে ভ্রমণ করিতে পারে? তোমার গতিরোধ করিতে পারে, এমন কেহই আজিও জন্মগ্রহণ করে নাই। অতএব তোমাকে নমস্কার।

হে মহাগতিশালিন্ চক্রেবর! আমরা সৌরজগতের অন্তর্গত সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির গতি দেখিতে পাই। এমন্ কি মানবজাতির নির-বয়ব মনের গতিও প্রত্যক্ষ করিতে পারি, কিন্তু তোমার অলক্ষ্য গতির প্রতি আমাদের লক্ষ্য হয় না। সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহনক্ষত্রগণ এবং মনুষ্যদিগের মন তোমারই গতিবলে আঘাতিত হইয়া গতিশিক্ষা করিয়া থাকে। তুমি অগতির গতি। অতএব তোমাকে নমস্কার।

হে চক্রেশ্বর! যখন তুমি ধাবন-ব্যায়ামে চিত্তসংযোগ কর, তখন ঘূর্ণন-ঘর্ঘর-শব্দে জড়-প্রকৃতি জাগরিত হইয়া উঠে। সূর্য্য সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া ভয়ে পূর্ব্ব দিক্ হইতে পশ্চিম দিকে ছুটিয়া যায়—চন্দ্র একপক্ষকাল দেখা দিয়া আর একপক্ষ লুক্কায়িত থাকিতে চেষ্টা করে—অন্যান্য গ্রহগণ আত্মগোপন করিবার জন্য যেন ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিয়া সুনীল নভোগর্ভে মিশাইতে চেষ্টা করে—মহাসাগর উত্তালতরঙ্গমালা উত্তোলন করিয়া গর্জ্জন করে—উর্দ্ধচূড় শৈলশ্রেণী নদীরূপ জলরাশি উদ্গার করে—সুবিশাল শ্যামবসনা মেদিনী কাঁপিয়া উঠে। অতএব তোমাকে নমস্কার।

হে মহাচক্র! তোমারই কৌশলে "সেই এক দিন আর এই এক দিন" এই বিচিত্র পদটির সৃষ্টি হইয়াছে। এই পদের অভ্যন্তরে তোমার ভ্রমণশীল পদ কত বিপদ, আপদ, সম্পদ প্রভৃতির পরিবর্ত্তন করিয়াছে—করিতেছে ও করিবে, তাহা কে বলিতে পারে?—যখন ভারত স্বাধীন ছিল, তখন "সেই একদিন" আর এখন ভারত হইয়াছে, "এই একদিন"। যখন ভারত-সন্তান-গণ শত্রুমুণ্ড লইয়া কন্দুকক্রীড়া করিত, তখন "সেই একদিন", আর এখন তাহারা সেই শত্রুপদে স্ব স্ব মুণ্ড স্থাপন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছে,—"এই একদিন"। যখন ভারতীয়েরা সুরাকে বিষবিষ্ঠাসম জ্ঞান করিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিত, তখন "সেই একদিন", আর এখন তাহারা উহাকে সুধাজ্ঞানে গলাধঃকরণ করিয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে,—"এই একদিন"। যখন 'এই কার্য্য করিও না, ইহাতে পাপ হইবে' এইরূপ মূলবিধির উৎপত্তি হইয়াছিল, তখন "সেই একদিন", আর এখন সেই মূলবিধির স্থলে 'এই কার্য্য করাই উচিত, নহিলে পাপ হইবে', সুতরাং "এই একদিন"। যখন সরস্বতী নদীতটস্থ অরণ্যে বৈদিক মহর্ষিগণ শুদ্ধচিত্ত হইয়া যাগযজ্ঞ সাধন করিতেন, তখন "সেই একদিন", আর এখন বিহার-উদ্যানের সরোবর-তট-শোভিত "ললিত-লবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে, মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিত-কুঞ্জকুটীরে" মহাপুরুষগণ রমণীমণ্ডলীবেষ্টিত হইয়া সুরা সেবনে অধঃপতন সাধন করিতেছে,—"এই একদিন"। যখন পিতৃবৈরনির্যাতনের আশায় অসীম বিক্রমশালী মহারাজ সগর ম্লেচ্ছগণের মস্তক মুণ্ডন প্রভৃতি অবমাননাসূচক শাস্তি প্রদান করিয়া ভারতবর্ষ হইতে তাহাদিগকে দূরীভূত

করিয়াছিলেন, তখন "সেই এক দিন", আর এখন সেই অপদস্থ ম্লেচ্ছকুলের পাদনিহিত চর্ম্মপাদুকার ধূলি ঝাড়িয়া ভারতবর্ষীয়েরা জীবন সার্থক করিতেছে, সুতরাং "এই এক দিন।" হে মহাচক্র! তোমার কৌশলচক্রে আরও যে এইরূপ কত "সেই এক দিন আর এই এক দিন" বাহির হইয়া পড়ে, অনন্ত আকাশের নক্ষত্রসমূহ, মহাসমুদ্রের বালুকারাশি ও সমুদয় জীবের লোমরন্ধ্ররাজি গণনা করিয়া একত্র সমষ্টি করিলেও তাহার সংখ্যা হয় না। ধন্য তুমি ও ধন্য তোমার অদ্ভুত লীলা। অতএব তোমাকে নমস্কার।

পাঠক, এই অনন্তগমনশীল কালচক্রে ঘূরিয়া ঘূরিয়া এক দিন, দুই দিন করিয়া ত্রিশ দিনে এক মাস—এক মাস দুই মাস করিয়া বার মাসে এক বৎসর উল্টাইয়া গেল, কিন্তু আর ফিরিল না—কেবল কালচক্রের মহাপরিধির কতকটা আকার বৃদ্ধি করিয়া অলক্ষ্যে আসিয়া—অলক্ষ্যে থাকিয়া—অলক্ষ্যে কোথায় মিশাইয়া গেল। এই এক বৎসরের মধ্যে কত কি ভালমন্দ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা এই এক বৎরের মধ্যে পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণীর যত নিমেষপাত হইয়াছে, তদপেক্ষাও সংখ্যায় বহুগুণ হইবে। এই এক বৎসরের মধ্যে কেহ প্রতিনিশ্বাসপাতে কাঁদিয়াছে, আবার কেহ হাসিয়াছে—কেহ প্রাণাধিক পুত্র কন্যা হারাইয়াছে, আবার কেহ লাভ করিয়াছে—কাহার ভাগ্যে পত্নী লাভ হইয়াছে—কেহ সংসারশূন্য হইয়াছে—কেহ খুন করিয়াছে—কেহ খুন হইয়াছে—কেহ কাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ধনী হইয়াছে—কেহ যথাসর্ব্বস্বলুণ্ঠিত হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছে—কাহারও ভাগ্যে একাদশ বৃহস্পতি হইয়াছে, আবার কাহারও অদৃষ্টে রন্ধ্রগত শনি অত্যাচার করিয়াছে। স্থূলকথা এই এক বৎসরে ভালমন্দ—পাপপুণ্য—ধর্ম্মাধর্ম্ম—হিতাহিত—ক্ষতিলাভ সমস্তই ঘটিয়াছে।—বাকী কিছুই নাই, যদি থকে, তবে তাহা কিছুই নহে—শূন্য। এইরূপে এইরূপ অসংখ্য ঘটনা-সমষ্টির উপর দিয়া তিন শত পঞ্চষষ্টি দিনের একটি বৎসর ঘূরিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে এক দুই করিয়া আরও দশটি বৎসর চলিয়া গেল।

এত দিন পরে ধীরেন্দ্রনাথ চতুর্ব্বিংশ, কিরণময়ী পঞ্চদশ এবং হিরণ্ময়ী চতুর্দ্দশ বৎসরের হইলেন। সুতরাং উল্লিখিত কালচক্রের আবর্ত্তনে ইহাঁদিগের শরীরের ও মনের অনেক পদার্থ ও বৃত্তিরও আবর্ত্তন পরিবর্ত্তন ঘটিল।

জগদীশপ্রসাদের সময়ে যদি এ দেশে রসায়নচিত্রের অর্থাৎ ফটোগ্রাফের প্রথা থাকিত, তাহা হইলে বিনা বাক্যব্যয়ে এই সমস্ত আবর্ত্তন পরিবর্ত্তনের কথা এক জনকে অপর জন বুঝাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু তাহা হইবার নহে। সুতরাং কতকগুলি কথা খরচ করিয়া প্রথমতঃ ধীরেন্দ্রনাথের কথা পাড়িতে হইল।

ধীরেন্দ্রনাথ এক্ষণে যুবা। এখন তাঁহার নূতন অবস্থা। শৈশবকালের খেলাধূলা, আহার ও শয়নপ্রণালী প্রভৃতি প্রায় সমস্তই স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতেছে। এখন নূতন শরীর—নূতন জীবন—নূতন প্রাণ—নূতন মন—নূতন কার্য্য এবং নূতন ইচ্ছা বা সখ্। এখন আর সে গুলিডাণ্ডা—কপাটী—চোর চোর—ছুটাছুটি—হুটাহুটি কিছুই নাই। তবে কি আছে?—আছে শতরঞ্জ—পাশা—বাঘছাগল ইত্যাদি। আর ধূলামাখা কাপড়ের বদলে পরিষ্কার কাপড়—'যা' পাই, তা'ই খাই'র বদলে দুই সন্ধ্যা নিয়মিত আহার এবং বিকালে কিঞ্চিৎ জলযোগ—সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই গাঢ় নিদ্রার বদলে রাত্রি গাঢ় হইলে অপ্রগাঢ় নিদ্রা—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থানের বদলে সূর্য্যোদয়ের কিছু পরে শয্যাপরিত্যাগ। তখন সঙ্গীত শিখিতে ইচ্ছা থাকিলেও অনবরত বিদ্যাভ্যাসেই লিপ্ত থাকিতে হইত, এখন সঙ্গীতবিদ্যা ও লেখাপড়ার বিদ্যা উভয়েরই অভ্যাস হইয়া থাকে, তবে লেখাপড়া অপেক্ষা সঙ্গীতের সঙ্গে সম্বন্ধটাই অধিক। বোধ হয় বকেয়া বাকীটা পূরাইবার জন্যই এইরূপ হইয়া থাকিবে। তখন যে ধীরেন্দ্রের অপক্ক নাসারন্ধ্রে ছিদ্র করিয়া তাঁহার পিতা একটি নোলক দুলাইয়া দিয়াছিলেন,এখন সে ছিদ্র বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার নিম্নে ও ওষ্ঠের উপরে কৃত্রিম ভূষণের পরিবর্ত্তে অন্যতম স্বভাবসিদ্ধ প্রধান অলঙ্কার শোভিত হইয়াছে—উহার নাম, পাঠক বুঝিয়া লও। ধীরেন্দ্র শ্মশ্রু ধারণ করিতে ভালবাসেন না বলিয়া প্রতি সপ্তাহে ক্ষৌরকারকে দিয়া উহাকে বিদায় করেন। ধীরেন্দ্রের সেই চক্ষু এখনও সেই, তবে কিনা কিছু বড় হইয়াছে, আর সেই বড়র সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে একটি নূতন জিনিষ আশ্রয় লাভ করিয়াছে, উহার নাম অপাঙ্গদৃষ্টি। ফলকথা ধীরেন্দ্রনাথ এখন যুবা।

পাঠক! তোমার নিকটে আমরা ধীরেন্দ্রনাথের যৌবনবৃত্তান্ত একপ্রকার

বলিলাম। সময়ে কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ীরও বিষয় বলিবার ইচ্ছা আছে। এক্ষণে তুমি যেরূপ জান, সেইরূপ করিয়া মনে মনে বর্ণনা কর।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ-প্রস্তাব।

বেলা দ্বিপ্রহর। প্রকৃতির প্রথম মূর্ত্তির আর কিছুই নাই—এক্ষণে দ্বিতীয় মূর্ত্তি। আকাশ পরিষ্কার নীল। সূর্য্যদেব উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া সেই নীলিম গগনে তেজঃ প্রকাশ করিতেছেন। প্রাতঃকালে ইহাঁকে দেখিয়া যেরূপ আরাম লাভ হইয়াছিল, এখন্ তাহার ঠিক বিপরীত। এখন ইনি অস্তাচলে গেলেই বাঁচি। কেহ যে বরাবর এক অবস্থায় থাকিতে ভালবাসে না—তাহার সাক্ষী এই সূর্য্য। কোমলপ্রকৃতিও যে সময়ে উগ্র ও নীরস প্রকৃতির বশীভূত হয়, তাহারও সাক্ষী এই সূর্য্য। আর‚কাহারই অবস্থা যে চিরকাল সমান থাকে না, তাহার সাক্ষী এই মধ্যাহ্ন প্রকৃতি।

বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে বলিয়া সকলেই একপ্রকার নিস্তব্ধ। চারি দিক্ রৌদ্রে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। পক্ষিরা ঝোপেঝাপে চুপেচাপে বসিয়া আছে। মাঠের মধ্যে গাভীগণ দলবদ্ধ হইয়া আর চরিতে চাহে না। যেখানে একটি বৃক্ষ দেখিতেছে, তাহারই মূলে আশ্রয় লইতেছে,—কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ শুইয়া চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিতেছে। তাহাদের পরিচালক রাখাল বালকও পরিহিত মলিন বস্ত্রের এক দিক বিছাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। শুইয়া ঘুমাইয়া পড়ে নাই—গান গায়িতেছে। গাভিদের কেহ কেহ এক একবার গুঁতা-গুঁতি করিতেছে—রাগে কি আমোদে, তাহা জানি না, কিন্তু রাখালবালক 'আরে মর—শালার গরু' বলিয়া স্তব করিতেছে। বৃক্ষের ছায়া যে জীবনের কিরূপ প্রয়োজনীয় সামগ্রী, তাহা এতক্ষণে পথিকেরা বুঝিয়াছে। জল যে কিরূপ মূল্যবান্ পদার্থ, তাহা তৃষাতুরের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

প্রত্যহ এই দ্বিপ্রহরের সময় জগদীশপ্রসাদ আহার করেন; এইজন্য তাঁহার ভোজনগৃহে একটি দাসী একখানি বড় চতুষ্কোণবিশিষ্ট আসন

পাতিয়া তাহার নিকটে শ্বেত প্রস্তরের একটি চুম্‌কীতে কর্পূরবাসিত জল পূরিয়া রাখিল। তাহার পার্শ্বে একখণ্ড ক্ষুদ্র কদলীপত্রে কিঞ্চিৎ লবণ আর একখানি ক্ষুদ্র রৌপ-রেকাবীতে কতকটা উত্তম মাখন রাখিয়া দিল। এমন সময়ে পাচকব্রাহ্মণ একখানি রৌপ্যনির্ম্মিত থালায় উত্তম অন্ন ও সাত আটটি বাটীতে নানাবিধ ব্যঞ্জন সাজাইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনের সম্মুখে রক্ষা করিল। ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া রহিল, দাসী চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবী দেবী সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন পাচক ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিল।

জগদীশপ্রসাদ আসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করিলেন। অনন্তর পঞ্চপ্রাণকে পঞ্চগ্রাস অর্পণ করিয়া আহার করিতে বসিলেন। জাহ্নবী পার্শ্বে বসিয়া একখানি তালবৃন্ত লইয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে বীজন করিতে লাগিলেন।

আহার করিতে করিতে জগদীশপ্রসাদ জাহ্নবী দেবীকে বলিলেন, "দেখ, আজ কয় দিন ধরিয়া তোমাকে একটি কথা বলিব বলিব মনে করিয়াছি, কিন্তু বলি নাই—আজ বলিব।"

জাহ্নবী বলিলেন, "বুঝিয়াছি, ব্যঞ্জন ভাল হইতেছে না।"

"তবে ত তুমি সকলই বুঝিয়াছ। জ্যোতিষ শাস্ত্রটাও কি কণ্ঠস্থ করিয়াছ?" সাহস্যমুখে এই কএকটি কথা বলিয়া জগদীশ একগ্রাস অন্ন মুখে দিলেন।

জাহ্নবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কেন, তবে কি হইয়াছে? কি কথা বলিবে?"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "কথাটা এই,—কিরণময়ী দেখিতে দেখিতে পনর বৎসরে পড়িয়াছে। এক্ষণে ইহাকে একটি উপযুক্ত পাত্রের করস্থ করিতে হইতেছে। আর বৃথা সময়ক্ষেপ করা ভাল দেখায় না। এত দিন আমার মনের মত পাত্র পাই নাই বলিয়াই, কন্যার প্রতি পিতার এই কর্ত্তব্য কার্য্যটি করিয়া উঠিতে পারি নাই।"

জাহ্নবী দেবী আনন্দিত হইলেন। বলিলেন, আমার বড় সৌভাগ্য যে, আজ তোমার নিজের মুখ দিয়াই আপনা আপনি এই কথা নির্গত হইল। আমি আজ ক্রমাগত ছয় সাত বৎসর ধরিয়া তোমার নিকট এই কথার প্রসঙ্গ

করিয়া আসিতেছি, কিন্তু তুমি একটি দিনের জন্যও আমার সেই কথায় মনোযোগ দাও নাই। যখনই বলিয়াছি, তখনই 'না—না—এখন না' বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছ। তাই বলিতেছি আমার বড় সৌভাগ্য।"

জগদীশ হাসিয়া বলিলেন,"তোমার সৌভাগ্যে আমারও সৌভাগ্য।"

জাহ্নবী বলিলেন, "আচ্ছা, সে যাহা হউক, এক্ষণে কোথায় পাত্র ঠিক করিলে? পাত্রটি ত দেখিতে বেস্ সুশ্রী, লেখাপড়া জানে ত? চরিত্র ভাল ত?"

জগদীশ বলিলেন, "হাঁ।" এই বলিয়া আর এক গ্রাস অন্ন গ্রহণ করিলেন।

উভয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তার প্রসঙ্গ করিতেছেন, এমন সময়ে সেই দাসী একটি রূপার বড় বাটী পরিপূর্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ আনয়ন করিল। জাহ্নবী দেবী স্বয়ং গাত্রোত্থান করিয়া সেই বাটীটি লইলেন। দাসী আবার চলিয়া গেল। জগদীশপ্রসাদের পাত্রের দক্ষিণদিকে দুগ্ধপাত্র রক্ষিত হইল।

আবার উভয়ের কথাবার্ত্তা চলিল।

জাহ্নবী বলিলেন,"পাত্রটি কোথাকার?"

জগদীশ বলিলেন, "বড় দূরের নয়—এই বাটীর।"

জাহ্নবী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বলিলেন, "অ্যাঁ, এই বাটীর? নাম কি?"

জগদীশ বলিলেন, "ধীরেন্দ্রনাথ।"

"ধীরেন্দ্রনাথ?—আমাদের ধীরেন্দ্রনাথ?—তা বেস হইয়াছে।" এই বলিয়া জাহ্নবী দেবী কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন, "না, তুমি পরিহাস করিতেছ।"

জগদীশপ্রসাদ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "না—আমি পরিহাস করিতেছি না,—সত্যই বলিতেছি।"

জাহ্নবী দেবী অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। ধীরেন্দ্রের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত মায়া মমতা জন্মিয়াছিল, এইজন্য তাঁহারও ইচ্ছা ছিল, ধীরেন্দ্রনাথের সহিত জ্যেষ্ঠা কন্যা কিরণময়ীর শুভ বিবাহ হয়। আজ স্বামীর মুখে সেই মনোগত কথাগুলি শুনিয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইলেন। শশাঙ্ক যেমন চকোরীকে সুধা দান করে, সেইরূপ জগদীশপ্রসাদের মুখমণ্ডল জাহ্নবী দেবীকে যেন কি এক অপূর্ব্ব পদার্থ ঢালিয়া দিল। জাহ্নবীর সুখের আর অবধি রহিল না।

ভোজনব্যাপার সমাপ্ত হইল। জগদীশপ্রসাদ আচমন করিয়া নির্দ্ধারিত স্থানে গমনপূর্ব্বক হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিলেন। জাহ্নবী দেবীও অবিলম্বে একটি রূপার ডিপায় করিয়া চারিটি তাম্বুল তাঁহাকে দিলেন। অনন্তর উভয়ে উক্ত কথার প্রসঙ্গ করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রণয়সঞ্চার।

পাঠক! তোমাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, নন্দনকানন ব্যতীত জগদীশপ্রসাদের আরও একটি উদ্যান ছিল। সেটি তাঁহার অট্টালিকার উত্তরপার্শ্বে সংলগ্ন। তদীয় পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা সেই উদ্যানে গিয়া পুষ্পচয়ন করিতেন। সেই উদ্যানে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল। বাটীর স্ত্রীলোকেরা তাহাতে স্নান করিতেন। উক্ত উদ্যানের পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিমের দিকে দুই মানুষ প্রমাণ উচ্চ প্রাচীর, সুতরাং বহির্ভাগ হইতে অভ্যন্তরভাগ বা অভ্যন্তর ভাগ হইতে বহির্ভাগ দেখা যাইত না। তবে কেবল বহিঃপ্রদেশ হইতে উদ্যানের মধ্যস্থ বড় বড় বৃক্ষগুলির শীর্ষদেশ দেখা যাইত। কোন কোন উচ্চ বৃক্ষের দীর্ঘ শাখা প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া বাহিরে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। গ্রামের বালক বালিকারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ঢেলা মারিয়া সেই সব শাখা হইতে ফল ভাঙ্গিয়া লইত।

সেই উদ্যানের মধ্যে এক দিকে তুলসীবন ও কএকটি বিল্ববৃক্ষ ছিল। বিধবা স্ত্রীলোকেরা তথা হইতে সাজী ভরিবার বিশেষ যোগাড় পাইত। অন্য দিকে অনেকগুলি ভাল ভাল ফুলের গাছ। তাহারই নিকটে স্বচ্ছ সরোবরটি সুশোভিত ছিল।

পাঠক মহাশয়কে বলা বাহুল্য যে, জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবী দেবী ধীরেন্দ্রকে পর ভাবিতেন না। বাল্যকাল হইতে তাঁহারা তাঁহাকে এতদূর আপনার করিয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহার যৌবনাবস্থাতেও তাহার অণুমাত্র

অন্যরূপ ভাবেন নাই। তাঁহারা প্রথম দিন ধীরেন্দ্রকে যে চক্ষে দেখিয়াছিলেন, আজিও তাহাই।

ধীরেন্দ্রনাথ, কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ী এক এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেই উদ্যানে বেড়াইতে যাইতেন। কেহ ফুল তুলিতেন—কেহ তাঁহার নিকট হইতে উহা লইতেন। কেহ মালা গাঁথিতেন—কেহ উহা গলদেশে ধারণ করিতেন। এই তিন জনের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বড় ভাব জন্মিয়াছিল। তবে কি না, মুখের ভাবের সহিত মনের ভাব সকলের সমান হয় না। এই জন্য ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীকে মুখে মনে যেরূপ ভাল বাসিতেন, কিরণময়ীকে ঠিক সেইরূপ ভালবাসিতেন না। মনুষ্যের এইরূপই স্বভাব, সুতরাং কেন যে এমন হইয়াছিল, তাহা কি করিয়া বলিব? কিন্তু ধীরেন্দ্রের প্রতি হিরণ্ময়ীর মনে মুখে যেরূপ ভাব, কিরণময়ীরও ঠিক তাহাই। ইহাও মনুষ্যের স্বভাব, সুতরাং কেন যে এমন হইয়াছিল, তাহাই বা কি করিয়া বলিব?

কিরণময়ীর প্রতি ধীরেন্দ্রনাথের ভালবাসা লজ্জামিশ্রিত, কিন্তু হিরণ্ময়ীর প্রতি তাহা নহে। এইজন্য তিনি যখন কিরণের সঙ্গে কথা কহিতেন, তাহা একজাতীয়, আর যখন হিরণের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেন, তাহা অন্যজাতীয়। যদিও তিনি উভয়ের সঙ্গে প্রয়োজনানুসারে এক প্রকার কথা কহিতেন, তথাপি উহা ভিন্নতর হইয়া দাঁড়াইত।

ধীরেন্দ্র কিরণময়ীর নিকট সকল কথা ফুটিয়া বলিতে পারিতেন না, কিন্তু হিরণ্ময়ীর কাছে বলিতেন। কিন্তু তাঁহার নিকট কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ী উভয়েই মনের কথা সমানভাবে ফুটিয়া বলিতেন।

এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ধীরেন্দ্রনাথ একাকী উক্ত উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার হস্তে একগাছি ছড়ি ছিল। তিনি সেই ছড়িটি কখন সঞ্চালন, কখন ঘূর্ণন, কখন শ্যামল দুর্ব্বাদল ও পুষ্পতরুর উপর নিক্ষেপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছিলেন। এইরূপে কতক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুষ্করিণীর ঘাটের উপর আসিয়া উপবেশন করিলেন। দেখিলেন, কতকগুলি ক্ষুদ্র, মধ্যম ও বৃহৎ মৎস্য চারি পাঁচ অঙ্গুলি জলের নিম্নে সন্তরণ দিয়া বেড়াইতেছে। তিনি অনন্যমনে তাহাই দেখিতে লাগি-

লেন। সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া কতকগুলি পাখী সেই পুষ্করিণীর উপর দিয়া নীড়াভিমুখে উড়িয়া গেল, আর অমনি ভয় পাইয়া সন্তরণশীল মৎস্য গুলিও জলের ভিতর ডুব দিল। ডুবিবার সময় জলে এক প্রকার অস্ফুট অথচ মধুর শব্দ হইল—আবার জল নড়িতেছে; কেন নড়িতেছে?—সান্ধ্য সমীরণের নীরব হিল্লোলে। সুধীর পবন ক্রমাগতই দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিকে যাইতেছে, আর ক্রমাগতই সরোবরের দক্ষিণ দিক হইতে একখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরীময় সুবিস্তৃত আস্তরণ উত্তর দিকে সরাইয়া দিতেছে। এক্ষণে ধীরেন্দ্রনাথ তাহাই দেখিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা আসিল। উদ্যানটি সারাদিন নানা পক্ষীর নানা কথা শুনিয়া আসিতেছিল, এক্ষণে আর শুনিতে পাইতেছে না। এক্ষণে পক্ষিকুলও নীরব—উদ্যানও নীরব। কেবল ধীরেন্দ্রনাথ এক একবার শিশ্ দিতেছেন—অনুচ্চস্বরে গান গায়িতেছেন—মধ্যে মধ্যে ছড়িগাছটি সোপানের উপর তালে তালে ঠুক ঠুক করিয়া ঠুকিতেছেন। এক জন হইতে তিন রকম শব্দ হইতেছে—এ শব্দ উদ্যানের পক্ষে বিরক্তিকর নহে—বড় মনোহর। ধীরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর বস্তুত মধুর বলিয়া ইহা উদ্যানের পক্ষে মনোহর, অধিকন্তু তাঁহার গান যে একবার শুনিয়াছে, সে আবার শুনিবার জন্য অনবকাশকে অবকাশ করিয়া লয়। বাগানের গায়েই বাড়ী, সুতরাং কোন গুরুজন গান শুনিতে পাইবেন, এই ভয়ে তিনি অনুচ্চস্বরে গায়িতেছিলেন। তবে কি তিনি কখন উচ্চকণ্ঠে গান গাহেন না?—গাহেন। কোথায়?—প্রিয়মাধবের বাড়ীতে। প্রিয়মাধব কে?—ধীরেন্দ্রের প্রিয়তম বন্ধু। তিনিই এক্ষণে তাঁহার বাড়ীর কর্তা, সুতরাং তিনিও গাহেন, আর ইনিও গাহেন।

সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিল, কাজেই চাঁদের চাঁদনীও গাঢ় হইয়া উজ্জ্বল হইল। দিনেও বৃক্ষের ছায়া ছিল, এখনও তাহাই। তবে প্রভেদ এই,—দিনে ছায়া ভাল লাগিত—ছায়ার বাহিরে রৌদ্র ভাল লাগিত না; এখন ছায়া তত ভাল লাগে না, কিন্তু ছায়ার বাহিরে জ্যোৎস্না ভাল লাগে। এই জন্য ধীরেন্দ্রনাথ বৃক্ষছায়া-বিবর্জ্জিত পুষ্করিণীর সোপানের উপরেই বসিয়া রহিলেন। ধীরেন্দ্রকে সকলেই ভালবাসে।—এই জন্য মৃদুমন্দ সমীরণ আপন মনে তাঁহার উত্তরীয় লইয়া খেলা করিতে লাগিল; জ্যোৎস্না তাঁহার সুন্দর

দেহে হাত বুলাইতে লাগিল; প্রস্ফুটিত পুষ্পগুলি তাঁহার নাসিকায় সুগন্ধ যোগাইতে লাগিল। ধীবেন্দ্রকে সকলেই ভালবাসে।—সেই জন্য জগদীশ-প্রসাদ ও জাহ্নবী দেবী তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন; কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ী ভালবাসার চক্ষে নিরীক্ষণ করেন। ফল কথা, ধীবেন্দ্রনাথ ভাগ্যবান্ যুবা।

প্রায় এক ঘণ্টা কাল অতীত হইল, তথাপি ধীরেন্দ্রনাথ সোপান ত্যাগ করিলেন না। এক্ষণে তিনি নীরব হইয়া বসিয়া আছেন।—দেখিলে বোধ হয়, যেন কিসের তত্ত্বানুসন্ধান করিবেন বলিয়া চিন্তার পরিচর্য্যা করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে তিনি এতদূর চিন্তামগ্ন হইলেন যে, বাহিরে কি কি ব্যাপার হই-তেছে, তাহা দেখিতে বা জানিতে পারিলেন না। ক্রমে চক্ষু নিমীলন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে হটাৎ কে একজন আসিয়া পশ্চাৎ দিক হইতে তাঁহার চক্ষু টিপিয়া ধরিল। ধীরেন্দ্রনাথের গাঢ়চিন্তা সরিয়া গেল—তিনি চমকিয়া উঠিলেন। "কে—কে" বলিয়া নিজহস্তে তাহার হস্ত ধারণ করিলেন। বুঝিতে পারিলেন, তাহার হস্ত কোমল ও তাহাতে বলয় রহিয়াছে। অমনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যে তাঁহার চক্ষু টিপিয়া ধরিয়াছিল, কাজে কাজে তাহার হস্ত খুলিয়া গেল। সে অন্য উপায় না দেখিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের বস্ত্রে নিজের মুখমণ্ডল ঢাকিয়া ফেলিল। ধীরেন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখি-লেন,—হিরণ্ময়ী।

তখন তিনি বলিলেন "হিরণ্!"

হিরণ্ময়ী তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "উহুঁ, কিরণ।"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দেখ, হিরণ! এ পরিহাসের স্থানও নহে—সময়ও নহে। তুমি এখানে এখন একাকিনী আসিয়াছ কেন?"

হিরণ্ময়ী হাসিতে হাসিতে মুখের কাপড় খুলিয়া বলিলেন, "তুমি এখানে আছ বলিয়া।"

"আমি যেখানে থাকিব, সেইখানেই কি তোমাকেও থাকিতে হইবে? এমন সময়ে এমন স্থলে তোমার আসা ভাল হয় নাই। তুমি শীঘ্র গৃহে যাও।" ধীরেন্দ্রনাথ এই কথাগুলি বলিয়া, তাঁহাকে ফিরিয়া যাইবার জন্য পুনঃপুনঃ ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

হিরণ্ময়ী কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "ধীরেন্! আমি যাইব না।"

ধীরেন্দ্র বলিলেন, "যদি কেহ দেখিতে পায়, তবে কি বলিবে? বিশেষতঃ কিরণময়ী তোমাকে এক মুহূর্ত্তও চক্ষের অন্তরালে রাখেন না, যদি তিনিই তোমার অনুসন্ধানে এখানে আসিয়া পড়েন, তাহা হইলে তিনিই বা কি মনে করিবেন?

এই কথাগুলি কর্ত্তব্যের অনুরোধে ধীরেন্দ্রনাথের মুখ হইতে নির্গত হইল, কিন্তু হিরণ্ময়ীর কর্ণে তিক্তরস ঢালিয়া দিল। তখন তিনি বলিলেন, "ধীরেন্! আর বলিতে হইবে না, আমি বুঝিয়াছি। এই তবে আমি যাই।" এই বলিয়া তিনি ফিরিয়া দুই চারি পদ অগ্রসর হইলেন। আবার একবার মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "ধীরেন্! তবে চলিলাম।" এই বলিয়া গৃহের দিকে যাইতে লাগিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ নির্ব্বাক হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিছুই বলি-লেন না। কিন্তু যখন দেখিলেন, হিরণ্ময়ী বাস্তবিকই চলিয়া যাইতেছেন, তখন আর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। দ্রুতগমনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ইচ্ছা ধরিবার।

হিরণ্ময়ী যাইতে যাইতে এক একবার পশ্চাদ্ভাগে চাহিয়া দেখিতেছিলেন, এইবার যেমন চাহিলেন, আর অমনি দেখিলেন, ধীরেন্দ্রনাথ দ্রুতগমনে আসিতেছেন। তিনি তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া রমণীস্বভাবসুলভ দ্রুতগতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু দৌড়িতে দৌড়িতে একটি কণ্টকিত কুসুমলতায় তাঁহার অঞ্চল বাঁধিয়া গেল—আটক পড়িলেন। কণ্টক হইতে অঞ্চল ছাড়াইতে ছাড়াইতে ধীরেন্দ্রনাথের হস্তে সেই অঞ্চল ধৃত হইল।

তদ্দর্শনে হিরণ্ময়ী তীক্ষ্ণ পরিহাসের সহিত বলিলেন, "ছাড় ছাড়, শীঘ্র ছাড়—এখনি কেহ দেখিতে পাইবে—পাইলে কি বলিবে?—ছাড় ছাড়—আঁচল ছাড়।"

ধীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "হিরণ! এত পরিহাস কোথায় শিখিলে? আচ্ছা সে যা হউক, তুমি যে আমাকে বলিয়া আসিলে "আর বলিতে হইবে না, আমি বুঝিয়াছি।" কিন্তু আমি ত এ কথার কিছুই মর্ম্মভেদ করিতে পারিলাম না। তুমি কি দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিবে? কেন এমন কথা

বলিলে? কখন ত তোমার মুখে এরূপ বাক্যের আভাসও পাই নাই।" এই বলিয়া আবার তিনি ব্যগ্রতাসহকারে বলিলেন, "হিরণ! আমার নিতান্ত অনুরোধ—আমি যোড়হাত করিয়া বলিতেছি, তুমি এই কথার মর্ম্মভেদ কর।" এই বলিয়া হিরণ্ময়ীর হস্ত ধারণ করিলেন।

হিরণ্ময়ী কোন উত্তর করিলেন না, কেবল অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে উদ্যানের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে কতকটা দূরে একটি মনুষ্যের ন্যায় কি দেখা দিল। হিরণ্ময়ীর দৃষ্টি ভূক্ষিপ্ত থাকাতে, তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ দেখিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি হিরণ্ময়ীর হস্ত পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহা আর তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন না। তিনি বিপদে পড়িলেন, ভাবিয়া অস্থির হইলেন। দুই পদ অগ্রসর বা দুই পদ পশ্চাৎ যাইতে পারিলেন না--চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু হিরণ্ময়ী তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিলেন, প্রশ্নের উত্তর করেন নাই বলিয়া, ধীরেন্দ্র ভগ্নমনোরথ হইয়া তাঁহার হস্ত ছাড়িয়া দিয়াছেন। তখন অবসর পাইয়া, কণ্টক হইতে অঞ্চল ছাড়াইয়া, হিরণ্ময়ী বরাবর গৃহের দিকে প্রস্থান করিলেন।

মনুষ্যের ন্যায় যাহাকে দেখিয়া ধীরেন্দ্র ভীত হইয়াছিলেন, তাহাকেও আর দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে হিরণ্ময়ী তাঁহার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। আর তিনি যাহাকে দেখিয়াছিলেন, সেও কোথা লুক্কায়িত হইল, কি মিলাইয়া গেল,তাহারও কিছু ঠিকানা হইল না। তিনি আবার ঘাটে গেলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, আর বসিতে পারিলেন না। সরঃ-সোপানাবলির সর্ব্বোপরিস্থ চাতালের উপর উত্তরীয় বিছাইয়া শুইয়া পড়িলেন। নেত্র নিমীলন করিয়া আবার ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহাকে এতাদৃশ বিষম চিন্তায় নিপীড়িত দেখিয়া নিদ্রা যেন দুঃখিত হইলেন; তাই তাঁহার শুশ্রূষা করিবার জন্য নেত্রযুগলে স্বীয় সুকোমল ও চিন্তানিবারক হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

এমন সময়ে একখণ্ড বৃহৎ মেঘ আসিয়া চন্দ্রের উজ্জ্বল মূর্ত্তি ঢাকিয়া ফেলিল। বোধ হইল, শশধর যেন ধীরেন্দ্রনাথের দুঃখে দুঃখিত হইয়া মেঘান্তরালে প্রচ্ছন্ন হইলেন। পাছে নিদ্রিত যুবার চক্ষের উপর করজ্যোতিঃ পড়িয়া নিদ্রার ব্যঘ্যাত ঘটে, সেই জন্যই যেন তিনি সেই বৃহদায়তন জলদ-খণ্ডকে টানিয়া আনিয়া আপনাকে ঢাকা দিলেন। অনুতপ্ত ঔজ্জ্বল্য-ভাণ্ডার চন্দ্রমণ্ডলে মেঘাবরণ, সুতরাং উদ্যানের রজতাভ সুন্দর চিত্র কতকটা মলিন হইয়া গেল। তরল অন্ধকারে সরোবর-বারি, তরু লতা, ফোটা অফোটা ফুল, দূর্ব্বাদল, ভুভাগ প্রভৃতি সকলই ম্লান হইয়া গেল। পূর্ব্বের ন্যায় দূরের বস্তু আর তেমনতর দৃষ্টিগোচর হইল না।

পাঠক! ঐ দেখ, নিদ্রাভিভূত ধীরেন্দ্রনাথের শিয়রে কে আসিয়া বসিল—কোনরূপ সাড়াশব্দ হইল না। ও কে?—স্ত্রী কি পুরুষ? পুরুষ নহে, একটী যুবতী রমণী। যৌবনভারে কিছু ব্যগ্র হইয়াছে, বোধ হয়। তাই কি উহার চিক্কণ চিকুরজাল আলুলায়িত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে? তাই কি ও কবরীবন্ধন করিতে সময় পায় নাই? তাই কি উহার বক্ষোলম্বিত মুক্তা-মালা পৃষ্ঠলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে? তাই কি উহার বস্ত্রাঞ্চল আপৃষ্ঠ আবৃত না হইয়া গুচ্ছাকারে কণ্ঠদেশে জড়িত রহিয়াছে? হইতে পারে, জানি না। এই রমণী যে নবযৌবনের পথিক, তাহা মুখ দেখিলেই চেনা যায়। এখনও ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যৌবন-তুলিকার সকল প্রকার রঙ প্রতিফলিত হয় নাই। কাহার সহিত ইহার মনোহর বদনকমলের তুলনা করিব? কিসের সহিত ইহার লাবণ্যের উপমা হইবে, তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। চাঁদ ত ঢাকা পড়িয়াছে।

এই নবযুবতী নির্ব্বাক ও নিশ্চল হইয়া কিয়ৎকাল বসিয়া রহিল। ভাসা-ভাসা চক্ষে নিদ্রিত ধীরেন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল দেখিতে লাগিল। কতবার দেখিল, কিন্তু আশা মিটিল না। যে মেঘখানা চন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা সরিয়া গেল। আবার উদ্যান পূর্ব্বের ন্যায় কৌমুদী-বিধৌত হইয়া উজ্জ্বল হইল। নিদ্রিত যুবার মুখমণ্ডলও সেই সঙ্গে যেন বিমল হইয়া উঠিল। যুবতী আবার তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল, কিন্তু এবারও আশা মিটিল না। অনন্তর কি ভাবিয়া চাঁদের দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিয়া, আবার

ধীরেন্দ্রনাথের পরিলক্ষিত মুখখানি দেখিতে লাগিল। গগন-চাঁদের সহিত এই চাঁদের সাদৃশ্য আছে কি না, যুবতী তাহাই দেখিবার জন্য কি ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল বা চাঁদকে পুনর্ব্বার মেঘান্তরালে থাকিবার নিমিত্ত চাহিল, তাহা কে বলিতে পারে?—সুতরাং আমরাও বলিতে পারি না। কে কি চক্ষে কাহাকে দেখে—কে কিরূপ উপমেয়ের জন্য কিরূপ উপমান খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহা অন্যের পক্ষে জ্ঞাতব্য নহে।

যুবতী নিশ্বাস অবরোধ পূর্ব্বক নিদ্রিত যুবার মুখের কাছে মুখ অবনত করিয়া কি দেখিল। পাছে নিশ্বাস লাগিলে যুবার নিদ্রাভঙ্গ হয়, তাই যুবতী এই বুদ্ধি খাটাইয়া দেখিল। যুবতী কি জন্য যুবার শীর্ষদেশে উপবিষ্ট হইয়া এরূপ করিতে লাগিল? এরূপ অজ্ঞাত দর্শনের মর্ম্ম কি? এ যুবতী কে? এই যুবার সহিত ইহার কি সম্বন্ধ?—কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

যুবতী উপবিষ্ট হইয়া অবধি এখন পর্য্যন্তও যুবার গাত্রস্পর্শ করিল না। কি জানি স্পর্শ করিলে, পাছে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে বা বিবেচনায়, বিনাস্পর্শে কেবল দর্শন করিতে লাগিল। এক এক বার ভাবিল, "আমি ধীরেন্দ্রনাথকে জাগাই।"—আবার ভাবিল, "না—জাগাইব না; জাগাইলে এমন করিয়া প্রাণ ভরিয়া—সাধ মিটাইয়া—চক্ষু জুড়াইয়া দেখিতে পাইব না।" এই ভাবিয়া আবার মনে মনে বলিল, "আহা, আমি কি সৌভাগ্যবতী, আজ আশানুরূপ মনোমুগ্ধকর চিত্র দর্শন করিতেছি।"

এক্ষণে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়াছে। চন্দ্রদেব পূর্ব্বাকাশে পর্য্যটন করিয়া পশ্চিমাকাশের সীমায় উপনীত হইলেন। অস্ত হইতে আর বড় বিলম্ব নাই।

তখন যুবশির্ষবিরাজিনী বনদেবী-সদৃশা যুবতী আপনার অঞ্চল হইতে একখানি লিপি খুলিয়া ধীরেন্দ্রনাথের ভুবিস্তৃত উত্তরীয়ের একটি কোণে আস্তে আস্তে বাঁধিয়া রাখিল। যুবতীর আগমনাবধি এখন পর্য্যন্ত কি কি হইল, ধীরেন্দ্র তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না। যুবতী আর একবার নিমেষরহিত নয়নচকোরে নিদ্রিত যুবার মুখচন্দ্রের অনুপম সুধাপান করিয়া, আস্তে আস্তে তথা হইতে উঠিয়া গেল। কিন্তু তাঁহার নিকট আসিবার সময় যে চরণভূষণ হস্তে করিয়া আসিয়াছিল, যাইবার সময় তাহা সেই খানে ভুলিয়া গেল।

যুবতী প্রস্থান করিল আর ও দিকে রজনীরঞ্জনও চলিয়া গেলেন। উদ্যানভূমি কিঞ্চিৎ আভামিশ্রিত অন্ধকারে ডুবিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নিদ্রাভঙ্গ—লিপিপ্রাপ্তি।

যে উদ্যানের সরোবর-সোপান-চত্বালে ধীরেন্দ্রনাথ নিদ্রিত ছিলেন, তাহার ঈশাণ কোণে একদল শৃগাল 'হুয়া হুয়া হুক্কা হুয়া' করিয়া ডাকিয়া উঠিল। ধীরেন্দ্রনাথ সেই শব্দে জাগিয়া উঠিলেন। চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া দেখিলেন, চারি দিক অন্ধকার;—উদ্যানের সেই জ্যোৎস্নালাঞ্ছিত শোভা নাই—আর এক প্রকার হইয়াছে। তিনি যেমন জাগিলেন, অমনি তাঁহার মনে সেই দৃষ্ট ব্যক্তির কথা পুনর্ব্বার উদিত হইল। যে দিকে তাহাকে দেখিয়াছিলেন, সেই দিকে আবার দেখিলেন; কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি পূর্ব্বেই তাহাকে সরিয়া যাইতে দেখিয়া ছিলেন, তথাপি এক্ষণেও পুনর্ব্বার দেখিলেন। দেখিবার মর্ম্ম এই যে, যদি সে আবার সেখানে আসিয়া থাকে। কিন্তু অন্ধকার বাধা দিল।

অনন্তর তিনি পূর্ব্বব্যাপার ভাবিতে ভাবিতে এক একটি করিয়া কএকটি সোপানে অবতরণ করিলেন। পুষ্করিণীর জল যে সোপানটিকে স্পর্শ করিয়াছিল, তিনি তাহার উপরিস্থ সোপান পর্য্যন্ত গমন করিয়া উবু হইয়া বসিলেন। সেই খানে বসিয়া মুখনেত্র প্রক্ষালন করিলেন। অনন্তর তথা হইতে চত্বালে আরোহণ পূর্ব্বক উত্তরীয় খানি ঝাড়িয়া যেমন স্কন্ধোপরি রক্ষা করিবেন, অমনি তাঁহার হস্তে গ্রন্থিবদ্ধ একটা কি ঠেকিল। তিনি প্রথমতঃ কি-ত-কি ভাবিয়া, আবার উত্তরীয় খানি ঝাড়িলেন, কিন্তু উহা উত্তরীয়চ্যুত হইল না। তখন তিনি গ্রন্থি উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, একখানি লিপির মত কি রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি উহা খুলিয়া ফেলিলেন, দেখিলেন, বাস্তবিক একখানি লিপি। পড়িবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অন্ধকার শত্রু হইল।

পত্রখানি পাইয়া ধীরেন্দ্রনাথ অধিকতর চিন্তিত হইলেন। ব্যাপারখানা কি, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এক বার ভাবিলেন, "আমি কি কোন পত্রিকা উত্তরীয়তে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম ?—কই না।" আবার ভাবিলেন, "হিরণ্ময়ী কি আমার চক্ষু টিপিয়া ধরিবার পূর্ব্বে চুপি চুপি এই কার্য্য করিয়াছে ? তা' পত্রখানি না পড়িলে ত বুঝিতে পারিতেছি না। যাই হউক, এক্ষণে সকলে শুইয়াছে, আমি এই সময়ে গৃহে যাই। গিয়াই এই পত্রখানি পড়িয়া পরে অন্য কাজ।" এই বলিয়া যেমন অগ্রসর হইবেন, অমনি তাঁহার পদে কি ঠেকিয়া শব্দ হইল। তিনি ত্রস্ত হইয়া দাঁড়াইলেন। কটিদেশ বক্র করিয়া অবনত হইয়া দেখিলেন, কএকখানি অলঙ্কার পড়িয়া রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইলেন। সূক্ষ্মস্পর্শন ও স্থূলদর্শন দ্বারা বুঝিতে পারিলেন, সে গুলি কোন স্ত্রীলোকের পাদভূষণ। দেখিয়া কিছু বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। ভাবিলেন, "কে আমার নিকট এই কএকখানি গহনা ফেলিয়া বা রাখিয়া গিয়াছে ? কেন এমন হইল ? কেহ কি আমার শত্রুতা করিতেছে ?—হইতেও পারে—না হইতেও পারে। যাহার অলঙ্কার, সে কি এখন্ এখানে আছে ?—তাই বা কি করিয়া জানিব ?—অন্ধকারে এত বড় উদ্যানের কোন্ খানে কে আছে, তাই বা কি করিয়া ঠিক করিব ?" যুবা ক্ষণেক কাল ইতস্ততঃ করিয়া আবার ভাবিলেন, "বোধ হয়, কোন তস্করই বা আমাকে বিপদে ফেলিবার জন্য এই কাণ্ড করিয়া থাকিবে। ভাল, আমি ত কাহারও কোন অপকার করি নাই, তবে কেন আমার সহিত তাহার এইরূপ শত্রুতার সূত্রপাত হইল ? অদ্য সন্ধ্যার সময় আমি এখানে আসিয়া ভাল করি নাই।" এই প্রকার সাত পাঁচ ভাবিয়া ধীরেন্দ্রনাথ বিমর্ষের উপর আরও বিমর্ষ হইলেন।

অনন্তর কি ভাবিয়া, অলঙ্কারগুলি লইয়া প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে ক্রমে তিনি কতকটা দূর অতিক্রম করিলেন। এমন সময়ে একটা শৃগাল কি কুক্কুর তাঁহার গমনপথ কাটিয়া দৌড়িয়া চলিয়া গেল। তিনি পত্রালঙ্কারের চিন্তায় তদ্গতচিত্তে যাইতেছিলেন, হটাৎ সেইটাকে যাইতে দেখিয়া যেন চমকাইয়া উঠিলেন। করধৃত যষ্টিখানি মৃত্তিকার উপর দুই চারি বার ঠক্ ঠক্ করিয়া আঘাত করিলেন। আবার গমন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে বাটীর দ্বারদেশে প্রবিষ্ট হইলেন। সরসীতট হইতে এ পর্য্যন্ত আসিয়া তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না—তাঁহাকেও কেহ দেখিতে পাইল না। কারণ, তখন রাত্রি অধিক, জনমানবের কোনই সম্ভব ছিল না।

অনন্তর ধীরেন্দ্রনাথ আপনার কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। স্থিরকর্ণে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, অপরাপর কক্ষ হইতে কাহারই সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছে না। তখন বুঝিলেন, সকলেই নিদ্রিত।

তিনি যখন নিজ কক্ষের রুদ্ধ কপাট খুলিয়া প্রবেশ করিলেন, তখন আলোকাধারের বর্ত্তিকাটি মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। তিনি প্রথমতঃ উহাকে উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। তাহার পর ভিতর হইতে গৃহের দ্বার বন্ধ করিলেন। যথাস্থানে উত্তরীয় রাখিয়া রাত্রিবাস বস্ত্রখানি লইয়া পরিহিত বস্ত্রখানি ছাড়িলেন। উত্তরীয়ের পার্শ্বে উহা রক্ষিত হইল। তিনি কাপড় ছাড়িবার পূর্ব্বেই উত্তরীয়বদ্ধ লিপিখানি খুলিয়া এবং অলঙ্কারগুলি লইয়া শয্যার উপর রাখিয়া দিয়াছিলেন। অনন্তর কৌতূহল ও আগ্রহের সহিত পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। সেই পত্রখানিতে এই লেখা ছিল;—

"প্রিয়তম ধীরেন্!

আমি তোমাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি, কিন্তু তুমি আমাকে তাহার শতাংশের একাংশও কি ভালবাস? যদি না বাস, তবে আমি কি দোষে দোষী, তাহা বলিবে কি?—বাল্যকাল হইতে আমি তোমাকে ভালবাসিয়া আসিতেছি। যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, তত দিন ভালবাসিব, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও। তুমি আমার সহিত মন খুলিয়া কথা কও না,—এই বড় দুঃখ। ধীরেন্, তুমি কি আমার হইবে? তা তুমিই জান,—আমি জানি না; কিন্তু আশা আশ্বাস দিতেছে। আবার শুধু আশার আশ্বাসে সকল সময়ে কে কোথা বিশ্বাস করে? তাই আবার বলি, ধীরেন্! তুমি কি আমার হইবে! আমার প্রাণাধিকা ভগিনী হিরণ্ময়ী সর্ব্বদা কাছে থাকে, তাই আমি মুখ ফুটিয়া তেমোয় কিছু বলিতে পাই না। সেই জন্ম আজ এই পত্রখানিতে

আমার মনের কথা লিখিলাম। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, পিতৃগৃহই যেন আমার ভাগ্যে স্বামিগৃহও হয়,—অধিক আর কি বলিব, ইতি।

আমি একান্ত তোমারি

কিরণময়ী।”

এই পত্রখানি পাঠ করিয়া ধীরেন্দ্রনাথ অগাধ চিন্তাসাগরে ডুবিলেন। মনে মনে কত কি যে তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। একবার ভাবিলেন, “আমি যে কিরণময়ীকে মর্ম্মাহত করিয়া আসিতেছি, তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছে। আমি যে হিরণ্ময়ীকে তাহার অপেক্ষা ভালবাসি, সে তাহা কি করিয়া বুঝিতে পারিল? কেনই বা পারিবে না? তিনজনে এক বাড়ীতে আছি, পরস্পরের সহিত পরস্পরের দেখা শুনা হইতেছে, তবে সে কেন তাহা জানিতে না পারিবে? যেকালে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য আমার মনঃপরীক্ষা করা, সেকালে সে যে অবশ্যই ইহার মর্ম্মোদ্ভেদ করিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? কিরণ যে আমাকে বড় ভালবাসে, আমি তাহা অগ্রেই জানিয়াছি, এক্ষণে আবার আরও জানিলাম। আমার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইলে সে বড় সুখী হয়, এই তাহার পত্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহা বড় গুরুতর সমস্যা। আমি মহাশঙ্কটে পড়িলাম যে। এ বিষয়ে তাহার পিতা মাতার কোন মতামত আছে কি না, তাহা ত জানি না, কিন্তু সে আপনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই ব্যাপারে লিপ্ত হইতেছে। আমার ইচ্ছা যে অন্য কোন পাত্রের সহিত কিরণময়ীর আর আমার সহিত হিরণ্ময়ীর বিবাহ হয়। সে দিন আমার প্রিয়তম বন্ধু প্রিয়মাধব বলিয়াছেন যে, অন্য কোন পাত্রের সহিত কিরণের বিবাহ হইলে হিরণের সঙ্গে আমার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া দিতে পারিবেন। সে কথা বড় সন্দেহের নয়, কারণ, কিরণ-হিরণের পিতা প্রিয়মাধবকে যেরূপ স্নেহ করেন, তাহাতে এ কথায় বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু তাহা হইলে কিরণের দশা কি হইবে?” এই ভাবিয়া যুবা আবার মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “হুঁ, আমি পাগল, তা নহিলে এরূপ ভাবিতেছি কেন? কর্ত্তা মহাশয়ের ইচ্ছা না হইলে, আমাদের কাহারই ইচ্ছা ফলবতী হইবে না। আমি কি দুরাশার দাস—আমি কি ভ্রান্ত! আমি হিরণ্ময়ীর

আশা করিতেছি—কিরণময়ীকে উপেক্ষা করিতেছি। ফল কথা, আমার কিছুই হইবে না।" এইরূপ চিন্তা করিয়া ধীরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে শয্যার উপর শুইয়া পড়িলেন। পত্রখানি বক্ষের উপর হাত চাপা দিয়া নেত্র নিমীলন করিলেন। চিন্তাশূন্য হইলেন কি?—না চিন্তার তরঙ্গ আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। শুইয়া থাকিতে পারিলেন না, আবার উঠিয়া বসিলেন। পত্রখানি আর একবার পড়িলেন। অনন্তর শয্যা পরিত্যাগ করিয়া গৃহের মধ্যে ইতস্ততঃ করিয়া পদচারণা করিতে লাগিলেন। হৃদয়ের অভ্যন্তরে কি যেন হইতে লাগিল, সুতরাং অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। একটির উপর একটি করিয়া নানারূপ বিশৃঙ্খল চিন্তা তাঁহার প্রাণ মন হৃদয়কে অবসন্ন করিয়া তুলিল। উদ্যানে একগুণ নিদ্রা লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে চতুর্গুণ জাগরণ। দেখিতে দেখিতে রজনীর তিন ভাগ অতীত হইয়া গেল।

এক্ষণে ধীরেন্দ্রনাথ শয্যাতলে প্রাপ্ত পাদালঙ্কার কএকখানি ও পত্রখানি লুকাইয়া রাখিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। শুইবার সময় মুখ ফুটিয়া ধীর-স্বরে বলিলেন, "কিরণময়ীই যে নিজে উদ্যানে গিয়া আমার উত্তরীয়তে এই পত্রখানি বন্ধন করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ এই অলঙ্কারগুলি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এগুলি তাহারই পাদালঙ্কার, তাহা আমি আলোকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছি। মুখ ফুটিয়া আবার বলিলেন, "আমি পালঙ্কের সর্ব্বাধঃতলে পত্রখানি ও অলঙ্কারগুলি যেরূপ করিয়া লুকাইয়া রাখিলাম, তাহা আর হিরণ্ময়ী জানিতে পারিবে না।" ধীরেন্দ্রনাথের এই কথাগুলির মর্ম্ম এই, হিরণ্ময়ী প্রত্যহই তাঁহার গৃহে যখন তখন আসিয়া, এটি সেটি করিয়া সকলগুলিই ঘাঁটেন। শুধু ঘাঁটা নয়, অনেক জিনিস নষ্ট করিয়া ফেলেন। হিরণ্ময়ীর হস্তে অন্য জিনিষ পত্র পতিত বা নষ্ট হইলে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু এই পত্রখানি ও অলঙ্কারগুলি পড়িলে বিষম ব্যাপার ঘটিবে। সেই ভয়েই এত লুকাচুরি।

পাঠক! তুমি বলিবে যে, ধীরেন্দ্রনাথ মনে মনে কথা কহিতে কহিতে শেষে মুখ ফুটিয়া কহিলেন কেন? এ কথার উত্তর কি দিব? তুমিও কি কখন কখন মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে মুখ ফুটিয়া কথা কও না? শুনিবার কেহই নাই, অথচ আপনি বলিয়া আপনিই শুন না? কেহই শ্রোতা নাই, অথচ

মানুষ মনের কথা এক একবার ফুটিয়া বলে। তাহা আর কাহারও কর্ণে প্রবেশ লাভ করিতে পায় না, কেবল তাহারই কর্ণে আর বাতাসে, আকাশে।

ধীরেন্দ্রনাথ এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া আবার শুইলেন। কিন্তু নিদ্রার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেন কি না, তাহা তিনিই জানেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রহস্যভেদ।

রাত্রি প্রভাত হইল। কি করিয়া হইল ?—না সদসৎ দুই প্রকার কার্য্য মিশাইয়া হইল।—সৎকার্য্য কি ?—ঈশ্বরাধনা, ধ্যান, জপ যোগ প্রভৃতি। আর অসৎকার্য্য কি ?—না, চুরি, ডাকাইতি, হত্যা প্রভৃতি। এই প্রকার কার্য্য ব্যতীত আর একটি কার্য্যের সহিত রাত্রি প্রভাত হইল।--উহা কি ?—না, ধীরেন্দ্রনাথের সচিন্ত জাগরণ—উদ্যানের মধ্যে নিদ্রাংশ বাদ দিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ। নিশাদেবী ধীরগম্ভীর ভাবে ধরাবক্ষে বিরাম লভিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু স্থান শূন্য থাকিবার যো নাই, কারণ ঊষাদেবী আসিলেন। সর্ব্বাগ্রে শাখারূঢ় বিহঙ্গেরা সুর বাঁধিয়া নিশাকে বিদায় দিয়া ঊষাকে অভ্যর্থনা করিল।

আচ্ছা, পাঠক ! আপনি বলিতে পারেন, ঊষাকে দেখিয়া কে কে সুখী আর কে কে অসুখী হইল ? সুখী হইল কুসীদজীবী, কেন না অধমর্ণের নিকট তাহার ধার দেওয়া টাকার সুদ বাড়িল—সুখী হইল নববিবাহিত যুবা, কেন না তাহার প্রিয়তমা আর একদিনের বড় হইল—সুখী হইল অদ্য যাহার বিবাহ, কেন না সে একটি আশার প্রদীপ পাইবে ; যদিও সে জানে না যে, ভবিষ্যতে এই আশার প্রদীপ তাহাকে প্রকৃত পক্ষে সুখী কি দুঃখিত করিবে, কিন্তু সে এখন ত সুখী ;—আমাদের তাহাই বক্তব্য।---আর কে সুখী হইল ?—না যাহার অসুখ নাই, আর কে ? না যে কারাগারে আছে, কেন না তাহার দিন কমিল। এইরূপ ঊষা-আগমন সন্দর্শন করিয়া আরও কত লোক যে কত প্রকারে সুখী হইল, সে সকল কথা পাড়িবার প্রয়োজন নাই। আচ্ছা, অসুখী

হইল কে কে?—না, অধমর্ণ ব্যক্তি, কেন না তাহার উত্তমর্ণ আসিয়া আসল ও সুদের জন্য উত্তম মধ্যম ও অধম করিয়া কত মিষ্ট কথা শুনাইয়া দিল। অসুখী হইল গলিতদেহ বৃদ্ধ, কেন না তাহার দিন কমিয়া গেল। অসুখী হইল কোন কোন পিতা মাতা, কেন না তাঁহাদের মৃত পুত্রকন্যার শোক জাগিয়া উঠিল। অসুখী হইল বিধবা রমণী আর মৃতদার পুরুষ, কেন না তাহাদের মধ্যে একের ভর্তৃশোক অপরের স্ত্রীবিয়োগ হৃদয়কে আক্রমণ করিল। আর কে? না যাহার সুখ নাই। আর কে? না ধীরেন্দ্রনাথ।

আচ্ছা, পাঠক, তুমি এই নব উষা-আগমনে সুখী কি অসুখী হইয়াছ? তোমার আপনার কথা প্রসঙ্গে বলিতেছি না,—ধীরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বলিতেছি। হয় ত তুমি ইহাঁর অসুখে অসুখী হইয়াছ, নয় ত ইহাঁর অসুখ তোমাকে অসুখী করিতে পারিল না, কারণ একজনের সুখে একজন সুখী ও একজনের অসুখে একজন যে অসুখী হয়, এরূপ লোক বড় বিরল। তা যদি না হইবে, তবে কেন ঐ ধনীর দ্বারদেশে একমুষ্টি অন্নের জন্য ঐ ভিক্ষুক রোদন করিতেছে, আর ধনী ক্ষীরসরনবনী লইয়া নিজের উদরই শীতল করিতেছে? কেন ভিক্ষুকের রোদনে কর্ণপাতও করিতেছে না? বিপদে পড়িয়া একজন একজনের চরণোপান্তে লুটাইয়া গড়াগড়ি যাইতেছে, আর সে কেন সাধ্যসত্বেও তাহার দিকে অনুকূল দৃষ্টিপাত করিতেছে না? একজন স্বজনবিয়োগে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিতেছে, আর একজন কেনই বা তাহার নিকটে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া গান গাহিতেছে? এই পাপ সংসারে এরূপ লোকই সংখ্যাতীত, কিন্তু পরের ব্যথায় ব্যথিত হয়, এরূপ লোক বড় বিরল। সুখসম্বন্ধেও তাই।—একজন যদি সৌভাগ্যবলে শ্রীসম্পন্ন হইল, অমনি দশজন তাহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য আহার নিদ্রা পর্য্যন্তও ত্যাগ করিল। একজনের যদি একটু ভাল হইল, অমনি সাতজন তাহাকে কাঁদাই-বার জন্য ভীষ্মের পণ করিল। এইরূপ আরও যে কত আছে, তাহা বলিতে গেলে সূর্য্যাস্ত হইয়া যায়। এই জন্যই বলিতে হয়,—ইহা পৃথিবী নয়—নরক।

কিন্তু আমরা জানি, আমাদের সহৃদয় পাঠক মহাশয় সেরূপ নহেন। তিনি পরের অসুখে অসুখী আর পরের সুখে সুখী হইয়া থাকেন। ধীরেন্দ্র-

নাথের এই মানসিক অসুখে তাঁহারও চিত্ত দুঃখিত হইয়াছে, এরূপ আশা করিতে পারি।

প্রভাত হইতে দেখিয়া ধীরেন্দ্রনাথ শয্যা পরিত্যাগ করিলেন। রাত্রির অধিকাংশভাগ নিদ্রা হয় নাই বলিয়া এবং মনোমধ্যে চিন্তার উপর চিন্তার দুর্ব্বিসহ ভার সহিয়া, তাঁহার শরীর কতকটা অসুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। মুখ-খানি শুকাইয়া গিয়াছে—নেত্রযুগল রক্তবর্ণ হইয়াছে। গা হাত পা মাটী মাটী করিতেছে—হাই উঠিতেছে—মাতা ঘুরিতেছে। মনের সুখ নাই বলিয়া শরীরেও সুখ নাই। তিনি মধ্যে মধ্যে এক একবার হস্তপদ উৎক্ষিপ্ত পূর্ব্বক গাত্রভঙ্গ করিয়া আলস্য ত্যাগ করিতেছেন।

শয্যা পরিত্যাগের পর হইতে এইরূপে কতকটা সময় অতীত হইল। অনন্তর তিনি মুখ প্রক্ষালনাদি সমস্ত প্রাতঃক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

এমন সময়ে একজন ভৃত্য স্নানের যোগাড় করিয়া দিল। ধীরেন্দ্রনাথ স্নান করিলেন। স্নানান্তে শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন কিন্তু অন্য দিনের ন্যায় আজ উহা ভাল লাগিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে বহির্গমন-বস্ত্র পরিধান করিয়া বাটী হইতে নির্গত হইলেন। নির্গত হইয়া কোথায় গেলেন?—বোধ করি প্রিয়মাধবের নিকট।

পাঠক! গত রাত্রিকালে মনে মনে কহিতে কহিতে ধীরেন্দ্রনাথের মুখ ফুটিয়া যে কএকটি কথা নির্গত হইয়াছিল, তাহা ত তোমার মনে আছে? তুমি সেই কএকটি কথা ভুলিয়া যাও বা মনেই রাখ, তাহাতে তোমার এমন কিছু অনিষ্ট নাই, কিন্তু তাহাতেই একটি সুগভীর রহস্যভেদ হইবার উপক্রম হইল।

গত রজনীতে হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া অবধি নিদ্রা যান নাই। ধীরেন্দ্রনাথের ন্যায় তিনিও নানাচিন্তায় অস্থির হইয়াছিলেন। ধীরেন্দ্র তাঁহাকে কাছে থাকিতে দিলেন না—এক প্রকার তাড়াইয়া দিলেন,—সেই এক ভাবনা। আবার গৃহে আসিয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী কিরণময়ীকে দেখিতে পাইলেন না—সেও এক ভাবনা। এই দুইটি ভাবনার সূত্রপাতে তাঁহার মনোমধ্যে অসংখ্য ভাবনার পুঞ্জ পুঞ্জ সমষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং তিনি ঘুমাইতে পারেন নাই। মধ্যরাত্রিতে কিরণময়ী গৃহে প্রবিষ্ট

হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন, তাহা তিনি জাগিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। কিরণময়ীর আসিবার পূর্ব্বে তিনি শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া চুপ করিয়া এক ধারে পড়িয়া ছিলেন। কিরণময়ী ভাবিয়াছিলেন, হিরণ্ময়ী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার বিপরীত। দুই ভগিনী এক গৃহে এক শয্যায় শয়ন করিতেন।

কিরণময়ী ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু হিরণ্ময়ী, তাঁহাকে তত রাত্রিতে আসিতে দেখিয়া আরও চিন্তিত হইয়াছিলেন, সুতরাং শেষ রাত্রিতে একটু নিদ্রা আসিবার সম্ভাবনা থাকিলেও, তিনি তাহাকে স্পর্শ করেন নাই।

কতক্ষণ পরে হিরণ্ময়ী আস্তে আস্তে শয্যাত্যাগ করিয়া, বাহিরে আসিয়া ছিলেন। আসিয়া কখন্ কিরূপ অবস্থায় ছিলেন, কি কি করিতেছিলেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু একবার ধীরেন্দ্রনাথের গৃহের রুদ্ধকপাটের বহির্দ্দেশে উৎকর্ণ হইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন, ইহা আমরা জানি। ধীরেন্দ্রনাথ তখন গৃহের ভিতর ছিলেন। তিনি কক্ষমধ্যে যেরূপ অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা পাঠক মহাশয়কে বলিয়াছি। তাঁহার সেই মুখফোটা কথাগুলি নিশ্চল প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মানা ধীরেন্দ্রনাথগতা হিরণ্ময়ীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু কি ভাবিয়া, তিনি তখন ধীরেন্দ্রনাথকে ডাকেন নাই বা রুদ্ধকপাটে আঘাত করেন নাই। আবার ধীরে ধীরে শয়নকক্ষে আসিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। তখনও কিরণময়ী নিদ্রায় অভিভূতা। সুতরাং হিরণ্ময়ীর বহির্গমনের বিষয় কিছুই বুঝিতে পারেন নাই।

অনন্তর প্রভাতে উভয় ভগিনীই শয্যা পরিত্যাগ করিয়া আপনাপন ইচ্ছায় আপনাপন কার্য্যগুলি সমাধা করিলেন। মধ্যে মধ্যে হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষের দিকে আসিয়াছিলেন, কিন্তু প্রবিষ্ট হন নাই,—ফিরিয়া গিয়াছিলেন। অদ্য এখন পর্য্যন্তও কিরণময়ী ধীরেন্দ্রের কক্ষে একটি বারও আসেন নাই।

যাহার চিন্তা যেইরূপ, তাহার কার্য্যও সেইরূপ হইয়া থাকে। এইজন্য

হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের বহির্গমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এতক্ষণে তথাস্তু হইল।

তিনি তাহা জানিতে পারিয়া, একাকিনী অন্যের অলক্ষ্যে তাঁহার কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়াই শয্যাতল হইতে পত্র ও অলঙ্কার কএকখানি বাহির করিয়া লইলেন। বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি একটি কক্ষে চলিয়া গেলেন, এ কক্ষ তাঁহার নিজের ; এ গৃহে কিরণময়ীর কোন জিনিষপত্র বড় থাকে না। তিনি সেইগুলি অগ্রে আপনার বাক্সের মধ্যে চাবি দিয়া রাখিয়া, পরে একখানি গ্রন্থ লইয়া পড়িতে বসিলেন। পড়া ত তাঁহার মাথা আর আমাদের মুণ্ড, কেবল ধীরেন্দ্রনাথের পোড়া হইয়া দাঁড়াইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিষাদিনী।

ভিতর ইহতে নিজ কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া হিরণ্ময়ী পত্রখানি দুই তিনবার পড়িলেন। পড়িয়া পড়িয়া শেষে বলিলেন, "হুঁঃ, যা মনে করিয়াছি, তাই। তবে না ধীরেন্ আমাকে ভালবাসে বলে ? এরি নাম বুঝি ভাল-বাসা ? অ্যাঁ, ধীরেন্ এমন !" এই বলিয়া, ক্ষণেককাল কি চিন্তা করিলেন। চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিলেন, "কই, আমি যাহা ভাবিতেছি, ঠিক তাহা ত নয়। পত্রখানির মর্ম্ম ত সেরূপ নয়। ভাবে বোধ হইতেছে, ধীরেন্ এ বিষয়ে কিছুই জানেন না—এই কাণ্ড বড় দিদির। বড় দিদি ধীরেন্‌কে বড় ভালবাসেন, বিবাহ করিতে অভিলাষিণী। আমার দশা তবে কি হইবে ? না, বড় দিদির নিজের ইচ্ছায় কি বিবাহ হইতে পারে ? বাবা আর মা'র মত না হইলে, তাহা হইবে না। আচ্ছা, বড় দিদির যদি অন্য কাহারও সঙ্গে বিবাহ হয়, তবে আমিই কি করিয়া—" এই অসমাপ্তি কথার মর্ম্ম ভাবিতে ভাবিতে তিনি কপাট উন্মোচন করিলেন, দেখিলেন বাহিরে কেহই নাই। আবার কপাট বন্ধ করিলেন।

আবার মনে মনে বলিলেন, "আমি সর্ব্বদা কাছে থাকি বলিয়া বড় দিদি ধীরেন্‌কে মনের কথা ফুটিয়া বলিতে পারেন না। ধীরেনের প্রতি তাঁহার বড় টান—বড় ভালবাসা। আমিও ত ধীরেন্‌কে খুব ভালবাসি। বড় দিদি লিখিয়াছেন, ধীরেন্ তাঁহাকে তাঁহার ভালবাসার শতাংশের এক অংশেও ভালবাসেন না, তা' হইতে পারে,—আমি জানি না, কিন্তু ধীরেন্ আমাকে যে ভালবাসেন, তা' আমি জানি।" এই ভাবিয়া ক্ষণেক কাল চুপ করিয়া থাকিলেন। চক্ষু দুইটি নিমীলিত। আবার ভাবিলেন, "না, ধীরেন্ আমাকে মুখেই কেবল ভালবাসেন, তা' নহিলে আমাকে কাল তাড়াইয়া দিলেন কেন? বুঝিয়াছি—আর কোথায় যায়—বুঝিয়াছি। আচ্ছা—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি আর অধিক বাক্যচয়নে প্রবৃত্ত হইলেন না। এতক্ষণে তাঁহার স্থিরসিদ্ধান্ত হইল, ধীরেন্দ্রনাথের কিরণময়ী আর কিরণময়ীর ধীরেন্দ্রনাথ;—হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের কেহই নহে।

একটি প্রস্ফুটিত সুধাধার পদ্মকে ছিন্ন করিয়া রৌদ্রে রাখিলে যেরূপ রসহীন ও সৌন্দর্য্যচ্যুত হইয়া পড়ে, হিরণ্ময়ীর মনোহর মুখখানিও তাহাই হইল। মনে প্রাণে বুকে শরীরে যেন শত শত কণ্টক বিদ্ধ হইতে লাগিল। একটি একটি করিয়া কএকটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। তন্মধ্যে শেষের গুলি বাধা পাইয়া ছিন্ন হইয়া নাসারন্ধ্র ত্যাগ করিল। এরূপ হইবার কারণ এই, তখন হিরণ্ময়ী ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিলেন। ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিবার সময় উদর ও বক্ষের অভ্যন্তরে মুহুর্মুহু চাপ লাগে, সেই জন্যই রোদনের সহচর দীর্ঘনিশ্বাস ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। আমাদের পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কখন কোন কারণে কাঁদিয়া থাকেন, তবে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। এ সকল কথার অর্থ অভিধানে এবং ভাব টীকায় অপ্রাপ্য, সুতরাং এ সকল কথার অর্থের অভিধান তুমি, আমি, ইনি, তিনি ইত্যাদি এবং ভাবের জন্য টীকাও তুমি, আমি, ইনি, তিনি ইত্যাদি।

করিপদবিদলিত হইয়া মৃণাল যেমন জলে ডুবিয়া যায়; তাহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, বিষাদ বাড়ে, সেইরূপ হিরণ্ময়ী দুঃখসাগরের গভীর জলে ডুবিয়া গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার বরবপুর যে যে স্থলে সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, সেই সেই স্থলে বিষাদ-রেখা যেন অঙ্কিত হইয়া

গেল। হিরণ্ময়ী যৌবনের নব-অধিকারিণী হইলেও, এক্ষণে বালিকা। তিনি আজিও কোন কার্য্যের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা তলাইয়া বুঝেন না। তিনি যাহা করেন বা যাহা বলেন, তাহাই তাঁহার নিকট একবার ভাল আবার পরক্ষণে মন্দ বলিয়া পরিগণিত হয়। তিনি ভালকে মন্দ ভাবেন—মন্দকে ভাল ভাবেন, আবার কখন কখন ভালকেই ভাল আর মন্দকেই মন্দ ভাবেন। আজ তিনি যে কত কি ভাবিতেছেন, তাহা কে বলিতে পারে? আজ অনেক দিনের পর তাঁহার কোমল বক্ষ পরিতপ্ত হইয়াছে, তাই উহা যেন শীতল হইবার আশায় লোচনবর্ষিত দরদর ধারা আকর্ষণ করিতেছে। কখন তিনি গালে হাত দিয়া অর্দ্ধ হেলিত ভাবে একদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, আর তাঁহার আবক্তিম অক্ষিযুগল হইতে উত্তপ্ত অশ্রুরাশি আপনা আপনি স্তবকে স্তবকে উথলিয়া উঠিতেছে। এক একবার তিনি বস্ত্রের সূক্ষ্মাঞ্চলে, আবার এক একবার কোমল করপদ্মে অশ্রুমোচন করিতেছেন। যখন তিনি অঞ্চলে নয়ন মুছিতেছিলেন, তখন এক সূত্রের পর এক সূত্র করিয়া উহার চতুর্দ্দিকে অশ্রু আকর্ষিত হইতেছিল;—তাহা দেখিয়া বোধ হইল, যেন উত্তপ্ত বক্ষে তপ্তাশ্রু পড়িলে পাছে আরও কষ্ট হয়, সেই জন্যই অঞ্চলখানি সমস্ত অশ্রু শোষণ করিবার নিমিত্ত এইরূপ কৌশল প্রকাশ করিল। আর যখন তিনি করপদ্মে নয়ন মার্জ্জন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার হস্তে সুবর্ণ বলয় দুলিতেছিল, তাহা দেখিয়া বোধ হইল, যেন বালা সেই বালাকে কাঁদিতে নিষেধ করিতেছিল।

হিরণ্ময়ী একাকিনী অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এক ব্যক্তি অন্যের নিকট কাঁদিলে, সে ব্যক্তি তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া থাকে, কিন্তু হিরণ্ময়ীকে সান্ত্বনা করিবার কেহই নাই। অপিচ তাঁহার কাহারও নিকট এই কান্না কাঁদিয়া দুঃখ প্রকাশ করিবারও পথ নাই, সুতরাং কে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবে? তিনি নিজে ব্যতীত কেহই তাঁহার রোদন শুনিতেছে না—বুঝিতেছে না।

এক এক বার তিনি কি ভাবিতে লাগিলেন আর অমনি গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। এইরূপে তাঁহার সময় কাটিতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে মনে মনে বলিলেন, "ধীরেন্! আমায় ভুলিলে? আমায়

কাঁদাইলে? তোমার মনে কি এই ছিল?—উঃ, পুরুষের চিত্ত কি কঠিন!” এই ভাবিয়া অনেক যত্নে আত্মভাব গোপন করিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। তাঁহার স্নানাহার করিবার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মাতা বকিবেন বলিয়া একপ্রকার যেমন তেমন করিয়া সারিয়া লইলেন।

তিনি ধীরেন্দ্রনাথ ও কিরণময়ীর চিত্ত পরীক্ষা করিবার জন্য সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

প্রকৃত বন্ধু।

মহাতপ্ত মরুভূমির বক্ষে ওয়েসিস, গভীর ও সুবিশাল মহাসাগরের হৃদয়ে দ্বীপ, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতলে দীর্ঘকালস্থায়ী মেঘখণ্ড, অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় সুশীতল বায়ু ও জল যেরূপ হিতকারী, মনুষ্যের পক্ষে প্রকৃত বন্ধুও তাহাই। বিপদে ধৈর্য্যের ন্যায়, রোগে ঔষধের ন্যায়, ভয়ে ভরসার ন্যায়, অন্ধকারে আলোকের ন্যায়, যন্ত্রণায় উপশমের ন্যায়, অশান্তিতে শান্তির ন্যায়, শরীরে প্রাণের ন্যায় যাঁহার প্রকৃত বন্ধু নাই, তাঁহার কেহই নাই। এই মানব জগতে প্রকৃত বন্ধু নিতান্ত দুর্লভ; তবে যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান্, তাঁহার ভাগ্যেই এ হেন স্বর্গীয় রত্ন লাভ হইয়া থাকে। বন্ধুর নিমিত্ত বন্ধু জীবন দেয়, পৃথিবীতে এরূপ বন্ধুর সংখ্যা কয়টি? একবৃন্তে দুইটি কুসুমের ন্যায়, দুই শরীরে একপ্রাণ না হইলে প্রকৃত বন্ধুত্ব ঘটে না। একজনের সুখে আর একজনের সুখ এবং দুঃখে দুঃখ উৎপন্ন না হইলে প্রকৃত বন্ধুত্ব সংঘটিত হয় না। প্রকৃত বন্ধুর হৃদয় কি উপাদানে নির্ম্মিত? তা' কেমন করিয়া বলিব?—কারণ তাহা এই প্রবঞ্চনা সার পৃথিবীতে নাই। সে উপাদান স্বর্গ হইতে আসিয়া প্রকৃত বন্ধুর হৃদয়ে পরিণত হয়।

কালের কি ভোজবাজী! যাহারা প্রকৃত বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেয়, প্রায় তাহাদের মধ্যে অপ্রকৃত বন্ধুই সকলেই। এক্ষণে যে ব্যক্তি আর একজনকে

ঠকাইতে পারিবে,বিপদের সময় ফিরিয়াও দেখিবে না, প্রাণদানের পরিবর্ত্তে প্রাণ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে, কৌশল করিয়া স্বার্থসাধন করিবে, সেই প্রকৃত বন্ধু! আহা, যে সরল ব্যক্তির ভাগ্যে এরূপ গুণময় বন্ধু যুটে, তা'র পক্ষে এই পৃথিবী নরক এবং এইরূপ মহাপুরুষ বন্ধু নরকের বিষমুখ ও বিষহৃদয় ভুজঙ্গ।

তবে কি প্রকৃত বন্ধু মূলেই নাই?—আছে বই কি। একেবারেই না থাকিলে এত দিনে মানবসমাজের অঙ্গহানি হইত, উন্নতির ব্যাঘাত ঘটিত, জীবিত থাকা বিড়ম্বনা হইত।

একেবারেই প্রকৃত বন্ধু নাই বলিলে ধীরেন্দ্রনাথের প্রিয়মাধব কোথায় দাঁড়ান?

প্রিয়মাধবের পিতামাতা কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে তিনিই বাড়ীর কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সম্পত্তি যদিও বেশী ছিল না বটে, কিন্তু জীবন-যাপনের কোন কষ্ট হইত না। প্রিয়মাধবের বয়ঃক্রম ২৭।২৮ হইবে। তাঁহার একটি পুত্রসন্তান হইয়াছিল, তখন তাহার বয়স এক বৎসর মাত্র। প্রিয়মাধবের স্ত্রী দেখিতে বড় সুশ্রী ছিলেন না, কিন্তু বড় গুণবতী ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ২০।২১ বৎসর, নাম কাদম্বিনী। পত্নী শ্যামাঙ্গী সুতরাং তত সুশ্রী নয় বলিয়া প্রিয়মাধবের মন এক নিমিষের জন্যও বিচলিত হইত না। তিনি কাদম্বিনীকে বড় ভালবাসিতেন, সুতরাং স্বামীর উপযুক্ত কার্য্যই, করিতেন। প্রিয়মাধব যুবা, তাঁহাকে শাসন করে এমন কেহই ছিল না, তাহাতে আবার সহধর্ম্মিণী সুন্দরী নহেন, সুতরাং এমন অবস্থায় তাঁহার চরিত্রে দোষস্পর্শ হওয়াই সম্ভব, কিন্তু প্রিয়মাধব সচ্চরিত্র যুবা ছিলেন। তাঁহার চক্ষে কাদম্বিনী—সৌদামিনী।

এদিকে ধীরেন্দ্রনাথ বাটী হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর প্রিয়মাধবের বাটীতে গমন করিলেন। তিনি যখন তথায় উপস্থিত হ'ন, তখন প্রিয়মাধব সদর দরজায় বসিয়া পুত্রটিকে লইয়া খেলা করিতেছিলেন—এ খেলার নাম আদর। প্রিয়মাধব নামকরণের সময় পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন,—সুধাময়। কিন্তু তাহার আদরের নাম খোঁকা।

খোঁকা কখন পিতার ক্রোড়ে বসিয়া চুষীকাটী চুষিতেছে, কখন তাঁহার

হাত ধরিয়া ক্রোড়ের উপরেই ধেই ধেই করিয়া নাচিতেছে, কখন বা তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিতেছে, আবার কখন বা ধুপুস্ করিয়া পড়িয়া যাইতেছে। পড়িয়া কাঁদিবার যেমন উপক্রম করিতেছে, আর অমনি প্রিয়মাধব তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য মৃত্তিকাকে ভৎর্সনা করিতেছেন। কখন বা তিনি তাহার মুখচুম্বন করিয়া কতই তৃপ্তিলাভ করিতেছেন। এইরূপে পার্থিব জগতে পিতাপুত্রে অপার্থিব ক্রীড়া হইতেছে।

এমন সময়ে ধীরেন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত হইলেন। খোঁকা খেলা বন্ধ করিয়া কিয়ৎক্ষণ হাঁ করিয়া একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আবার মতলব ফিরিয়া গেল, পিতার মুখের দিকে তাকাইল। বলিল,"বা—কে"। প্রিয়মাধব বলিলেন, "খুড়ো"। খোঁকা প্রতিধ্বনি করিল, "খু—"। আবার ধেই ধেই তেই তেই করিয়া, বসিয়া বসিয়া, অঙ্গ দোলাইয়া নাচিতে লাগিল। করতালির ধূম পড়িয়া গেল, কিন্তু শব্দ নাই।

প্রিয়মাধব ধীরেন্দ্রনাথকে "এস,—বস" বলিয়া তাঁহার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "ধীর! আজ্ তোমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে কেন? অসুখ হইয়াছে কি?"

ধীরেন্দ্রনাথ অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন, কথার উত্তর দিলেন না। তাহা দেখিয়া প্রিয়মাধব কিছু উদ্বিগ্ন হইলেন। স্বহস্তে তাঁহার মস্তক ফিরাইয়া আবার কহিলেন "কর্ত্তা মহাশয় কি কিছু বলিয়াছেন? উত্তর দিতেছ না কেন?—বল না, কি হইয়াছে?"

ধীরেন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিষণ্ণ চিত্তে গত রাত্রের ঘটনাগুলি বলিতে লাগিলেন। প্রিয়মাধব স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন। খোঁকা এক একবার উচ্চস্বরে তান ছাড়িতে লাগিল। প্রিয়মাধব মধুর গর্জ্জনে "আঃ—কি করিস্ খোঁকা" বলিয়া ধমকাইতে লাগিলেন। সে তাহাতে দৃক্‌পাতও করিল না।

ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনিয়া প্রিয়মাধব অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিলেন। এই অবসরে ধীরেন্দ্রনাথ, মনে সুখ নাই অথচ মুখের হাসি হাসিয়া সুধাময়কে বলিলেন, "কি খোঁকা! দুদ খেয়েছ?" খোঁকা এ কথার ঠিক উত্তর করিল, "আইমা এনি লিলি—লেই লেই লেই।" ধীরেন্দ্র হাসিয়া

বলিলেন,"বেস্।" প্রিয়মাধব ভাবিতেছিলেন, তিনিও একবার হাসিলেন। হাসিবার সময় তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে বাতাসের সঙ্গে দুই তিনটা 'হুঁ—হুঁ' বাহির হইয়া গেল।

ধীরেন্দ্র বলিলেন, "ভাই প্রিয়! কি ঠিক করিলে?" এই বলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রিয়মাধব কহিলেন, "পত্রখানা আনিয়াছ কি? আমি একবার দেখিব।" এই বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথের চমক হইল। বলিলেন, "ওই যা, আমি আসিবার সময় সেখানা আনিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তাই ত, তবে কি করি? এখন গিয়া আনিব কি?"

"না, এখন আর আনিতে হইবে না। সন্ধ্যার পর লইয়া আসিও। এখন আমার সঙ্গে বাড়ীর ভিতর আইস দেখি। সেখানে দু'জনে বসিয়া যা হয় একটা ঠিক করি গিয়া।" প্রিয়মাধব এই কথা বলিয়া সুধাময়কে ক্রোড়ে লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। "এস ধীর!" বলিয়া অগ্রসর হইলেন। ধীরেন্দ্রনাথ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। উভয়ে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আশা।

লোক বলে প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদই বিচ্ছেদ, কিন্তু আমরা বলি তাহা নয়। আমাদের মতে যে 'এই বস্তুটি প্রিয়' বলিয়া বুঝাইয়া দেয়, তাহার বিচ্ছেদই বিচ্ছেদ। কে মানুষকে তাহা বুঝাইয়া দেন?—আশা। আশা কি?—কিছুই না—অথচ সকলই। রোগ মানুষকে মারিয়া ফেলে, কিন্তু সে মৃত্যুতে সে কথা কয় না—চাহিয়া দেখে না—ভাবিতে পারে না। কিন্তু আশা বিমুখ হইলে মানুষের যে মৃত্যু ঘটে, তাহাতে সে কথা কয়—চাহিয়া দেখে—ভাবিতে পারে। রোগে মৃত্যু হইলে পরে কষ্ট নাই, কিন্তু আশার বিচ্ছেদে

মরিলে আর রক্ষা নাই। মানুষ বাঁচে আশার আবির্ভাবে আর মরে উহার তিরোভাবে। মানুষ ভূমিষ্ঠ হইয়াই আশার ভক্ত হয় আর মরিলেই ত্যাগ করে। এই জন্য মরণের মধ্যে সে কখনই আশাকে ত্যাগ করিতে পারে না। সে ত পারেই না, কিন্তু আশা যদি আপনি সরিয়া যায়, তা' হইলেই তাহার তৎক্ষণাৎ অপমৃত্যু! এ অপমৃত্যুর নাম জীবনে মরণ;—বড় ভয়ানক। ইহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। যাহার ঘটিয়াছে, সেই জানে।

আশা সকলকেই লোভ দেখায়, তাহার মধ্যে 'পনর আনা পনর গণ্ডা তিন পাই'কে ঠকাইয়া 'একটি পাই'কে বরদান করে। আশাই আমাকে তোমাকে ও তাহাকে স্বর্গে তুলে, 'যাহা হইবার নয়, তাহাই হইবে' বলিয়া স্বর্গের কপাট খুলিয়া দেয়, আর যেমন তাহার ভিতর যাইবার শুভদিন, শুভ ক্ষণ ও শুভলগ্ন স্থির হয়, অমনি এক আছাড়ে পাতালের উদরে গুঁজড়াইয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু তা' বলিয়া কে গো শৃঙ্গে সর্ষপস্থিতিরও সহস্রাংশের সময়টুকুর জন্যও ইহাকে ভুলিতে পারে? যত দিন পৃথিবী আর যত কাল সেই পৃথিবীতে মানুষ, তত কাল আশার আধিপত্য যাইবার নয়! যে দিন দেখিবে, আশা ইহলোক হইতে চিরকালের জন্য পরলোকে চলিল, সেই দিনই দেখিবে, পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ মানুষের অস্তিত্বও চিরকালের জন্য বিলীন হইয়া গেল। অহ, আশা তবে কি?

সজীবের ত কথাই নাই, নির্জ্জীব পর্য্যন্তও আশার অধীন।—ফুল ফুটিতেছে, সুগন্ধ বিতরণ করিবার আশায়। বায়ু বহিতেছে, সেই সুগন্ধ চতুর্দ্দিকে ছড়াইবার আশায়। মেঘ উঠিতেছে, বৃষ্টি ঢালিবার আশায়। বৃষ্টি পড়িতেছে, শস্য উৎপাদন করিবার আশায়। সূর্য্য উদয় হইতেছে, বাষ্প সঞ্চয়ন করিবার আশায়। বাষ্প সঞ্চিত হইতেছে, মেঘমূর্ত্তি ধরিবার আশায়। চন্দ্র উদয় হইতেছে,—সূর্য্যের প্রখর কর লইয়া সেই করকে শীতল করিবার আশায়। সূর্য্যের কর শশিসংস্পর্শে শীতল হইতেছে, সকলের চক্ষু জুড়াইবার আশায়। বৃক্ষ লতা সমুৎপন্ন হইতেছে, ফলপুষ্প ধারণ করিবার আশায়। ফলপুষ্প উৎপন্ন হইতেছে, জীবের রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিবার আশায়। নদী বহিতেছে, সমুদ্রসঙ্গমের আশায়। সমুদ্র স্ফীত হইতেছে, নদীর জলবৃদ্ধি করিবার আশায়। এইরূপ সকলেই একটি না একটি কার্য্য

করিবার জন্য আশার আরাধনা করিতেছে। আশাকে ছাড়িয়া কেহই থাকিতে পারে না;—থাকিবার উপায়ও নাই। প্রশ্ন,—অহ, আশা তবে কি? উত্তর,—প্রাণ।

কিরণময়ী এই আশাকে হৃদয়ের গূঢ়তম আসনে উপবিষ্ট করাইয়া গত কল্য পত্র লিখিয়াছিলেন, অদ্যও ইহারই ভরসায় "ধীরেন্দ্রনাথ কিরণময়ীর।"

পাঠক মহাশয় বলিতে পারেন যে, কই কিরণময়ী কোথায়? তাঁহাকে ত দেখিতে পাই না? আসুন, ঐ দেখুন, তিনি তাঁহার কক্ষে বসিয়া আছেন। আজ তাঁহার অন্তরে কোথা হইতে আপনা আপনি আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে। হিরণ্ময়ীর হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার? তাঁহার বিপরীত। আজ তিনি ভাবিতেছেন যে, যেন আশা তাঁহাকে কৃতকার্য্য করিবে—ধীরেন্দ্রনাথকে মিলাইয়া দিবে।

হিরণ্ময়ীর মনোভঙ্গের কথা বাটীর কেহই জানিতে পারে নাই, সুতরাং তিনিও জানেন না। তাঁহার মনের ভাব এই যে, ধীরেন্দ্রনাথ পত্র পড়িয়া যথা সময়ে অবশ্য তাহার উত্তর দিবেন। সে উত্তর কি?—বিবাহ। চমৎকার উত্তর; কার্য্যে পরিণত হইলে কিরণময়ীর পক্ষে সোনায় সোহাগা হইবে। কতই কল্পনা হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। কতই হর্ষোচ্ছ্বাস হইতেছে, তাহার সীমা নাই। আর আশা-লতা কতই বাড়িতেছে, তাহার শেষ নাই।—প্রণয়-সূত্রের কি ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা! উহার এক দিকে এক জন জড়িত হইয়া কাঁদিতেছে আবার অপর দিকে এক জন হাসিতেছে।

কিরণময়ী মনে মনে কত গড়িলেন—কত ভাঙ্গিলেন। শেষে গড়িলেন "ধীরেন্দ্রনাথের সহিত আমার বিবাহ হইবেই হইবে।" এইরূপে মনে মনে গঠনকার্য্য সমাধা করিয়া, ধীরেন্দ্রনাথের নিকট পত্রের উত্তরাভাস জানিবার চেষ্টায় রহিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ফাঁদ।

ধীরেন্দ্রনাথ প্রিয়মাধবের বাটী হইতে ফিরিয়া আসিলেন। বন্ধুর নিকট কোন পরামর্শ করিয়া এখনও কিছু ঠিক হইল না। পুনর্ব্বার সন্ধ্যার পর সেখানে যাইবার কথা আছে। এবার আবার পাছে পত্র ভুলিয়া যান, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি অগ্রে শয্যাতল হইতে উহা বাহির করিতে গেলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পত্র বা অলঙ্কার কিছুই পাইলেন না। চিন্তিত হইলেন;—আবার উলট পালট করিতে লাগিলেন। পরিশ্রম সার হইল। চঞ্চল চিত্ত আরও চঞ্চল হইল। পুনঃ পুনঃ গৃহের এদিক ওদিক খুঁজিয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও দুইয়ের একটিও মিলিল না। অগ্রে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ শয্যার উপর বসিলেন। এই দীর্ঘ নিশ্বাসটি পরিশ্রম জন্য কি পত্রালঙ্কারের অপ্রাপ্তি হেতু তাহা বলিতে পারি না, তবু বোধ হয়, উভয় কারণেই।

ফিরিয়া আসিয়া একটু বিশ্রাম করিতে না করিতে আবার পরিশ্রম, কাজে কাজে তাঁহার শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া গেল। এত ঘর্ম্ম যে, যেন এই স্নান করিয়া গা মুছিবেন। শুষ্ক বস্ত্রে স্বেদ মোচন করিয়া, ধীরেন্দ্রনাথ চুপ করিয়া শয্যার উপরে শুইয়া পড়িলেন। চক্ষু নিমীলিত করিয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।—একবার ভাবিলেন, "আমি কি পত্রখানা আর গহনাগুলা এখান হইতে আমার সিন্দুকে তুলিয়া রাখিয়াছি? হইতেও পারে, কারণ যেরূপ আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছি, ইহাতে যে, সকল কার্য্য মনে ঠিক থাকিবে না, তাহার আশ্চর্য্য কি? ভাল, সিন্দুকটাই খুলিয়া দেখি।" অনন্তর গোপনীয় স্থান হইতে চাবি লইলেন, সিন্দুক খুলিলেন, দেখিলেন,—আশা নিষ্ফলা। আবার বন্ধ করিয়া যথাস্থানে চাবি লুকাইয়া রাখিলেন। "তাই ত, কি হইল, কে লইল" ইত্যাদি মনে মনে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। কক্ষদ্বারের বিপরীত দিকে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া শুইয়া রহিলেন। চক্ষু দুইটি নিমীলিত। গাঢ় চিন্তার সময় প্রায় সকলেই নয়ন মুদ্রিত করিয়া

থাকে। এরূপ করিয়া ভাবিলে চিন্তার অনন্তমূর্ত্তিখানি চক্ষের উপর সম্পূর্ণ-রূপে দেখা যায়। লোকে বলে 'চ'ক বুঝিলে অন্ধকার' সে কথা অন্য স্থলে খাটে, কিন্তু বহুরূপিণী চিন্তার চতুর্দ্দশভুবনবিরাজিত প্রকৃত মূর্ত্তি দর্শন করিবার সময় 'চ'ক চাহিলেই অন্ধকার।' এই জন্যই ধীরেন্দ্রনাথ নেত্র মুদিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে হিরণ্ময়ী ধীরে ধীরে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন নিজের কক্ষে পদালঙ্কারগুলি খুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন। আসিবার সময় দ্বারে চাবি দিয়া আসিয়াছেন। কারণ, বাক্সের ভিতর ফাঁদ আছে।

হিরণ্ময়ী প্রবিষ্ট হইয়া গৃহের একটি কোণের নিকটস্থ দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মুখে কথা নাই—করপদসঞ্চালনের শব্দ নাই। তিনি এরূপ ভাবে দাঁড়াইলেন যে, যেন একখানি মনোহর ছবি অনেক দিন হইতে দেওয়ালে থাকিয়া ধূলি মাখিয়া মাখিয়া মলিন হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক আজ যেন দেওয়ালে একটি বিষাদময়ী ছবি আপনা আপনি লাগিয়া গেল। কিন্তু আজ এই অপূর্ব্বছবিখানি বিষাদ-কালিমায় মলিন হইলেও, গৃহের অন্যান্য রমণীচিত্রগুলি পরাজিত হইল। ধীরেন্দ্রনাথ! একবার পাশ ফিরিয়া এই বেলা চাহিয়া দেখ, নতুবা এই মনোমুগ্ধকরী ছবি দেখিতে পাইবে না। পাঠকগণ! তোমরাও বিশেষ করিয়া দেখ। ইহা দেখিবার সম্পূর্ণ যোগ্য, পূর্ব্বে কখন দেখ নাই—পরেও দেখিতে পাইবে না।

হিরণ্ময়ী দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন আর ধীরেন্দ্রনাথ শয্যায় পড়িয়া আছেন। একজন একজনের পৃষ্ঠদেশ দেখিতেছেন আর একজন আর একজনের গৃহের মধ্যে অবস্থিতিরও কিছুই জানিতে পারিতেছেন না। হিরণ্ময়ীর অনেকক্ষণ ধরিয়া ধীরেন্দ্র দর্শনের আশা ছিল, কিন্তু হইল না। একটা ছোটখাট হাঁচি আসিয়া তাঁহার আশা উড়াইয়া দিল।

হাঁচির শব্দ পাইয়া চিন্তামগ্ন ধীরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন,

"সহসা ও ছবিখানি কে দেয়ালে আঁকিল ?"

অমনি উঠিয়া বসিলেন। চিত্রবৎ হিরণ্ময়ীর নিকটে গিয়া কহিলেন, "হিরণ! তুমি কতক্ষণ এখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছ ?"

"তা জানি না—মনে নাই" বলিয়া হিরণ্ময়ী মুখ অবনত করিলেন।

তদ্দর্শনে ধীরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, কল্য রাত্রি কালে তিনি উদ্যান হইতে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন বলিয়া হিরণ্ময়ীর রাগ হইয়াছে। সুতরাং তদনুসারে বলিলেন, "হিরণ! আমি ভালর জন্য বলি, কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, তুমি উল্টা বুঝিয়া রাগ কর। তুমি ছেলে মানুষ, কিছুই বুঝ না, তাই এমন কর। বুঝিলে আর এমন করিতে না। এখন আমার অনুরোধ এই, যদি আমি এরূপ আচরণে দোষী হইয়া থাকি, তবে কিছু মনে করিও না। আমি আর তোমাকে কখন কিছু বলিব না।" এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে কত কি বুঝাইতে লাগিলেন।

বুঝাইতে বুঝাইতে একবার বলিলেন, "কাল রাত্রিকালে তুমি যে আমাকে বলিযাছিলে, 'আব বলিতে হইবে না—আমি বুঝিয়াছি'।—কিন্তু হিবণ্ময়ি! আমি ত তোমাব সে কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তুমি, কি বুঝিয়াছ, আমাকে বুঝাও। কাল বুঝাও নাই—আজ বুঝাও।"

হিরণ্ময়ী দুঃখমিশ্রিত ঈষৎ ক্রোধের সহিত বলিলেন, "বুঝিবে? আচ্ছা।—কিয়ৎ কাল অপেক্ষা কর। আসিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। কোথাও যাইও না।"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না"।

হিরণ্ময়ী তথা হইতে প্রস্থান করিয়া আপনার কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। বাক্স খুলিয়া কিরণময়ীব লিখিত পত্রখানি বস্ত্রে লুক্কায়িত করিলেন। অতি সাবধানে লুক্কায়িত কবা হইল, অপরের সাধ্য কি যে দেখিতে পায়? আবার দ্বারে চাবি লাগাইয়া ধীরেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য দিন আসিয়া ধীরেন্দ্রনাথের শয্যাব কিঞ্চিৎ দূরস্থাপিত একখানি ক্ষুদ্র চৌকির উপর উপবেশন করেন, কিন্তু অদ্য প্রথমবারেও উহাতে বসেন নাই—এবারেও বসিলেন না—দূবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুতরাং ধীরেন্দ্রও দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হিরণ! বুঝাইয়া দাও।"

হিরয়ণ্মীও বুঝাইলেন। বুঝাইলেন কি? না—পত্রপ্রদর্শন। পত্রখানি দেখাইয়া একবাব তাড়াতাড়ি করিয়া পড়িলেন।

পত্র শুনিয়া ধীরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিলেন,—সাবধান হইলেন।

কিন্তু কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, কি উত্তর দিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

হিরণ্ময়ী বলিলেন, 'আর বলিতে হইবে না—আমি বুঝিয়াছি' কথার মর্ম্ম এতক্ষণে বুঝিলে ত? ধীরেন্! তুমি এমন, তা আমি জানিতাম না! বেস্, ভালই হইয়াছে, সুখে থাক।" হিরণ্ময়ীর এই কথাগুলির প্রত্যেক অক্ষরে যেন তীক্ষ্ণ বিষ ফুটিয়া পড়িল—ক্রোধচিহ্ন দেখা দিল।

নির্দ্দোষ ধীরেন্দ্রনাথ অবাক্। মুখে বাক্য নাই—নয়নে পলক নাই—আর দেহে যেন প্রাণ নাই। ঘটনাশক্তির কি অপূর্ব্ব কৌশল! একে আর হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "হিরণ! তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি, ও পত্রের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আমি উহার কিছুই জানি না।" আত্মপক্ষসমর্থনার্থ ইহা বলিলেন। এ কথায় তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না। তিনি ঠিক্ কথাই বলিলেন।

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "তা' কেমন করিয়া তুমি জানিবে বল? তোমার বিছানার নীচে ছিল কি না!"

ধীরেন্দ্রনাথের মন চঞ্চল হইল, কিঞ্চিৎ ভীতও হইল। তাই এইবার তিনি অন্য উপায় না দেখিয়া বাক্চাতুর্য্য ব্যবহার করিলেন। বলিলেন, "হিরণ! অন্য কেহ কি বিছানার নীচে রাখিয়া যাইতে পারে না?"

"তা' যেন পারে, কিন্তু—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই হিরণ্ময়ী নীরব হইলেন।

"'কিন্তু' কি, হিরণ্ময়ি?" ধীরেন্দ্রনাথের মুখ হইতে এই অদীর্ঘ পঙ্ক্তিটি আগ্রহের সহিত নির্গত হইল।

"কিন্তু কি, বুঝিবে?"

"বল।"

"আগে শপথ কর।"

"কেন?"

"তা নহিলে তুমি বুঝিয়াও বুঝিবে না।"

"শপথ করিতে হইবে না,—তুমি বল, আমি বুঝিব।"

"হিরণ্ময়ী তা' বলে না।"

"ভাল, হিরণ্ময়ি! তুমি ত পূর্ব্বে কখন আমাকে শপথ করিতে বল নাই। আজ কেন এরূপ করিতেছ?"

"তুমি দিব্য করিবে না? না কর। আমি বলিব না।"

ধীরেন্দ্র বিপদে পড়িলেন—উদ্বিগ্ন হইলেন। কারণ জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল, কিন্তু শপথ না করিলে উহার চরিতার্থতার সম্ভাবনা একবারেই নাই। কি করেন? অগত্যা শপথ করিতে হইল। শপথ করিলেন, "হিরণ্! তোমার দিব্য করিয়া বলিতেছি, তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহা বুঝিব।"

তখন হিরণ্ময়ী বলিলেন, "তুমিই কি এই পত্রখানা উদ্যান হইতে নিজে আনিয়া শয্যাতলে লুকাইয়া রাখ নাই?"

ধীরেন্দ্রনাথ আবার উদ্বিগ্ন হইলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হিরণ্ময়ী কি সর্ব্বজ্ঞা? কি করিয়া সন্ধান পাইল?" মনে মনে আরও কত কি তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন।

হিরণ্ময়ী তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন, "ধীরেন্! চুপ করিয়া রহিলে যে? উত্তর দাও না।" এই বলিয়া পত্রখানি দেখিতে লাগিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ অনন্যোপায় হইয়া, ইত্যবসরে হিরণ্ময়ীর হস্ত হইতে সহসা পত্রখানি আকর্ষণ করিয়া লইলেন। "দেখি দেখি, কি পত্র" বলিয়া আকর্ষণ-জনিত দোষ কাটাইতে গেলেন। তদ্দর্শনে হিরণ্ময়ী রাগ করিয়া পুনর্ব্বার উহা যেমন কাড়িয়া লইবেন, ধীরেন্দ্রনাথ দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিলেন বলিয়া, অমনি ছিঁড়িয়া গেল। উভয়ে এইরূপে দুই চারিবার কাড়াকাড়ি করাতে একখানি পত্র তিন চারিখানি হইয়া গেল।

ধীরেন্দ্রনাথের মুষ্টি মধ্যে এক খণ্ড, হিরণ্ময়ীর ক্ষুদ্র মুষ্টির ভিতর এক খণ্ড রহিল এবং ভূতলে দুই খণ্ড পড়িয়া গেল। পড়িয়া বাতাসে কতকটা সরিয়া গেল—বোধ হইল আবার ছিন্ন হইবার ভয়ে। হিরণ্ময়ী অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। রুষ্ট হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তথা হইতে দ্রুতগমনে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "তোমার সঙ্গে আর আমি কথা কহিব না। তুমি যাহাকে ভালবাস, তাহাকে লইয়া থাক। কপট! তুমি এত দিন ধরিয়া আমাকে ভাঁড়াইয়া আসিতেছিলে!

এখন হইতে তোমার ঘরেও আসিব না—তোমার সঙ্গে কথাও কহিব না।"

ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে একবার ধরিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু সাহস পাইলেন না। হিরণ্ময়ী চলিয়া গেলেন। এরূপ ভাবে চলিয়া গেলেন, যেন সহসা বিদ্যুদ্‌রেখা মেঘ হইতে নির্গত হইয়া গেল।

নির্দ্দোষ ধীরেন্দ্রনাথ দুর্ভাগ্যবশতঃ ষোল আনা দোষী হইলেন। ললাটে কর চাপিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ধরা পড়িলেন।

এক কক্ষে ধীরেন্দ্রনাথ ভাবিতেছেন, পত্রখানা ও অলঙ্কারগুলি সিন্দুকের মধ্যে না রাখিয়া ভাল করেন নাই। হিরণ্ময়ীই যে এই পত্র ও অলঙ্কারগুলি শয্যাতল হইতে লইয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাসে স্থান পাইল। কি করিবেন, ভাবিতে লাগিলেন।

হিরণ্ময়ী আপনার কক্ষে গিয়া খিল লাগাইলেন। তিনি রাগ করিলেই আগে দরজার খিল লাগাইয়া দেন। ইহাতে তাঁহার ক্রোধের শান্তি কি বৃদ্ধি হয়, তাহা বলিতে পারি না।—তাঁহার এক্ষণের মনের ভাব এই যে, চোর আপনা আপনি ধরা পড়িয়াছে।

আবার এ দিকে কিরণময়ী আপনার কক্ষে বসিয়া মনে মনে কতই আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। হিরণ্ময়ী ও ধীরেন্দ্রে যে কি ব্যাপার চলিতেছে, তিনি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানেন না। তাঁহার মনের ভাব, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

হিরণ্ময়ী নিজ কক্ষে থাকিয়া উদ্রিক্ত ক্রোধের কিয়ৎপরিমাণে শান্তিবিধান করিলেন। কিরূপে করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। অনন্তর অর্গল খুলিয়া কিরণময়ীর কক্ষে গমন করিলেন। আজ কিরণময়ীর সহিত এ পর্য্যন্ত

তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। কিরণময়ীও তাঁহার অনুসন্ধান লন নাই। তা' যাই হউক, কিন্তু উভয় ভগিনীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালবাসার ত্রুটি ছিল না।

যখন কিরণের কক্ষে হিরণ প্রবিষ্ট হইলেন, তখন কিরণময়ী জলপান করিতেছিলেন। তিনি জলপান করিয়া জলপাত্রটি দক্ষিণ পার্শ্বে রক্ষা করিলেন। তাঁহার ওষ্ঠ বহিয়া দুই চারি ফোঁটা জল বক্ষবস্ত্রে পড়িয়া গেল। তিনি হিরণ্ময়ীকে প্রথমত দেখিয়াই ঈষৎ মধুর হাসিলেন। দেখা হইলেই হাসিয়া থাকেন। হাসিয়াই আবার কিঞ্চিৎ চঞ্চলচিত্ত হইলেন। এরূপ হইলেন, হিরণ্ময়ীর বিষণ্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া। তখন, তাহার কারণ জানিবার জন্য বলিলেন, "হিরণ্! অসুখ হইয়াছে কি ?"

হিরণ্ময়ী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "দিদি! তোমার পায়ের গহনা কই ?" তিনি নিজে পদালঙ্কার ধারণ করিয়া গিয়াছিলেন।

কিরণময়ীর চমক হইল। অলঙ্কার যে পদে আছে, কি কোথা রাখিয়াছেন, এতক্ষণ তাঁহার মনে ছিল না। হিরণ্ময়ীর এক কথায় তাঁহার মনোমধ্যে নানা কথার উদয় হইল। তাঁহার হৃদয়ে প্রতিঘাত হইতে লাগিল। বুঝিলেন, পুষ্করিণীর ঘাটে অলঙ্কারগুলি ফেলিয়া আসিয়াছেন।

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া হিরণ্ময়ী আবার বলিলেন, "তুমি পায়ে গহনা পর নাই, কিন্তু মা দেখিলে তোমাকে বকিবেন। গহনা কোথায় আছে বল না, বাহির করিয়া দি। সিন্দুকে আছে ?"

কিরণময়ী লজ্জার ভয়ে প্রকৃত কথা গোপন করিয়া বলিলেন, "হুঁ"।

"তবে আমাকে চাবি দাও না—আমি বাহির করিয়া পায়ে পরাইয়া দি।"

"চাবি হারাইয়া ফেলিয়াছি। তাই ভাবিতেছি, মা কি বলিবেন।"

"নারাণের মাকে কামারবাড়ী পাঠাইব ?" নারায়ণের মাতা কিরণময়ীর দাসী, ইহা পাঠক মহাশয়কে বলিয়া দেওয়া গেল। না বলিলে তিনি কত খুঁজিবেন ?

কামারবাড়ীর কথা শুনিয়া কিরণময়ী বলিলেন, "না, হিরণ! এখন না। আমি আগে খুঁজিয়া দেখি, একান্তই না পাইলে, ইহার পর তাহাকে পাঠাইয়া দিব।"

হিরণ্ময়ী দেখিলেন, বড় দিদি কথা উপর কথা চাপা দিতেছেন, কোন মতে মনের কথা বা কাজের কথা বলিতেছেন না। বুঝিলেন, দিদি বিষম গোলযোগে পড়িয়াছেন। একবার ভাবিলেন, প্রকাশ করিয়া দি, আবার ভাবিলেন "এখন না—আরও কিছুক্ষণ দেখিয়া প্রকাশ করিব। দেখিই না, বড় দিদি কতদূর মনের ভাব ভাঁড়াইয়া নূতন কথা পড়িতে পারেন।" এই ভাবিয়া বলিলেন, "কি করিয়া চাবি হারাইয়া ফেলিলে ?"

কিরণময়ী উত্তর করিলেন, "বা হাতে কোথায় রাখিয়াছি, বোধ হয়, তাই শীঘ্র মনে আসিতেছে না। ভা বৰং ভাবিতে পাইব এখন।" এই বলিয়া অন্য কথা পাড়িলেন, বলিলেন, "হিরণ! তোমার কি অসুখ করিয়াছে?"

হিরণ্ময়ী বুঝিতে পারিলেন, জ্যেষ্ঠা ভগিনী তাঁহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছেন। কিরণময়ীও ভাবিলেন এই কথা পাড়িয়া কনিষ্ঠা ভগিনীকে পূর্ব্ববিষয়ে নিরস্ত করিবেন। কিন্তু হিরণ্ময়ী ভুলিবার নহেন। অন্য সময়ে ভুলিলেও ভুলিতে পারিতেন, কিন্তু এ সময়ে অন্য সব ভুলিতে পারেন, তথাপি নিজের মৎলব ভুলিতে পারেন না। এই জন্য তিনি অসুখবিষয়ক প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া আবার অলঙ্কারের কথা পাড়িলেন। এবার প্রকাশ করিলেন। বলিলেন," বড় দিদি! আমি যদি তোমাকে তোমার গহনাগুলি দিতে পারি, তবে আমাকে কি দিবে ?"

কিরণময়ী হিরণ্ময়ীর কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া পরিহাসচ্ছলে হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই দিব।"

হিরণ্ময়ী উত্তর দিলেন, "তা আর দিতে হয় না।"

কিরণময়ী ভাবিলেন, হিরণ্ময়ীও তাঁহাকে আর গহনা দিয়াছেন; তিনিও আর তাঁহাকে পুরস্কার দিয়াছেন। অনন্তর মনে মনে বলিলেন, "হিরণ্ময়ী যদি সরিয়া যায়, তাহা হইলে আমি পুষ্করিণীর ঘাট হইতে এই সময়ে গিয়া গহনাগুলি আনয়ন করি।" আবার ভাবিলেন, "সে গহনাগুলি এখনও কি সেখানে আছে ? বোধ হয়—না। হয় ধীরেন্দ্র উহা আনিয়াছেন, তা না হয় ত আর কেহ কুড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। যাহাই হউক, ধীরেন্দ্রের কাছে একবার যাইব। হিরণ্ময়ীকে একবার কোন কৌশলে এখান হইতে সরাইয়া দি।" এই ভাবিয়া, আবার ভাবিলেন, "বোধ হয়, হিরণ্ময়ী সেই

গহনাগুলি সেখান হইতে আনিয়া থাকিবে, তাই এমন কথা বলিতেছে। আমি চতুরতা করিতে গিয়া ঠকিলাম বুঝি।" এই কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে কিরণময়ীর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভয়বিমিশ্রিত লজ্জা আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। হিরণ্ময়ীর কথার উত্তর দিলেন না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

হিরণ্ময়ী বিলম্ব দেখিয়া বলিলেন, "বড় দিদি! আমি যাহা বলিলাম, তাহাই হইল।"

"কি হইল, হিরণ?"

"যাহা চাহিব, তাহা দিতে পারিবে না।"

"তুমি কোথায় গহনা পাইলে?"

"বলিব?"

"বল।" এ কথা মুখে বলিলেন, কিন্তু মনে খট্‌কা লাগিল।

"আমি—" এইমাত্র বলিয়া হিরণ্ময়ী নীরব হইলেন। তাঁহার মনে কি ভাবোদয় হইল। ভাবিলেন, বলিয়া কাজ নাই। ক্ষণেক কাল চুপ করিয়া থাকিলেন। আবার ভাবান্তর হইল। ধীরেন্দ্রনাথের মূর্ত্তি মনে পড়িল। আর থাকিতে পারিলেন না। বলিয়া ফেলিলেন, "ধীরেন্দ্রনাথের শয্যাতলে পাইয়াছি। শুধু গহনাগুলি নয়, তোমার স্বাক্ষরিত একখানা পত্রও পাইয়াছি।" এই বলিয়া অলঙ্কারগুলি বস্ত্রমধ্য হইতে বাহির করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "ধীরেন আমার হস্ত হইতে পত্রখানা লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন।"

কিরণময়ীর মহাশঙ্কট উপস্থিত। কি উত্তর দিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। উত্তর দিবার উপায়ও নাই। তিনি হিরণ্ময়ীর হস্তে ধরা পড়িলেন।

হিরণ্ময়ী গহনাগুলি রাখিয়া চলিয়া গেলেন। কিরণময়ী লজ্জায় তাঁহার মুখের দিকে আর তাকাইয়া দেখিতেও সাহস পাইলেন না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আশ্বাস প্রদান।

সন্ধ্যা হইল। সূর্য্যদেব পাটে বসিলেন। বসিবার সময়, ভবিষ্যতে মঙ্গল লাভের কামনায়, আকাশে স্বর্ণবৃষ্টি করিলেন। ভিক্ষুক মেঘমণ্ডলী তাড়াতাড়ি তাহা কুড়াইয়া লইল। পক্ষিকুল নীড়ে গিয়া বসিল। শাবকগণ চিঁ চিঁ করিয়া উঠিল। কোন পক্ষী কোলে প্রসূত অণ্ড চাপিয়া বসিল। পেচকের কোটর শূন্য হইল। গোপগণ দোহনপাত্র লইয়া গোদোহন আরম্ভ করিল। নিকটে বৎসগণ রজ্জুবদ্ধ; তাহারা মনে করিতেছে, দাতা গোপ মহাশয় যেরূপ অনির্ব্বচনীয় দয়া প্রকাশ করিতেছেন, দুগ্ধ পাই বা না পাই, পেট ভরিয়া বাঁট চুষিব!

ব্যক্তি বিশেষের গৃহে একটি দুইটি চারিটি বা ততোধিক করিয়া দীপ জ্বালিত হইল। গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। ধূনা গুগ্‌গুলের তৃপ্তিকর গন্ধে সন্ধ্যার আমোদ হইল। এমন সময় জগদীশপ্রসাদের নন্দন কাননে এক দল শৃগাল 'হুয়া হুয়া' করিয়া অস্তগত সূর্য্যদেবকে 'হুও হুও' বলিয়া পুষ্করিণীর ধার সরগরম্ করিয়া তুলিল।

জগদীশপ্রসাদের ঠাকুরবাড়ীতে আরতি আরম্ভ হইল। দ্বারদেশে ডগ ডুম্ ডগ ডুম্ বোলে নাগরা বাজিতে লাগিল। দুই জন লোক হাত ঘড়ি, চারি জন কাঁসর বাজাইয়া বিমিশ্রতালজ্ঞতার পরিচয় দিতে লাগিল। ধূপ ধূনার ধূঁয়ায় ঠাকুর ঘর অন্ধকার। ধূমস্তরের মধ্যে উজ্জ্বল প্রদীপালোক মিট্ মিট্ করিতে লাগিল। সিংহাসনে ৺রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। মূর্ত্তি যুগল শৃঙ্গারবেশে (রাজবেশে) সজ্জিত। পূজারী ঠাকুর পর্য্যায়ক্রমে পঞ্চপ্রদীপ জলপূর্ণ শঙ্খ, পাট-করা ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড, দর্পণ, পুষ্প প্রভৃতি লইয়া আরতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার করভঙ্গি দেখিয়া দ্বারের বহির্ভাগস্থ গলবস্ত্র যোড়হস্ত বৃদ্ধ বৃদ্ধা ভক্তগণ মনে মনে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। দুইটি বালক ও একটি বালিকা হাঁ করিয়া পূজারী ঠাকুরের হস্তব্যায়াম দেখিয়া, গৃহে গিয়া সেই-

রূপ করিবে ভাবিতে লাগিল। একদল বালক প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে দৌড়া-দৌড়ি করিতে লাগিল, কেহ বা নিরাজন-বাদ্যের তালে তালে পা ফেলিয়া নাচিতে লাগিল। এ দিকে পূজারী ঠাকুর তিন বার শঙ্খধ্বনি করিয়া আরতি শেষ করিলেন। ভক্তগণ সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। যাহার মনে যাহা চাপা ছিল, এতক্ষণে প্রার্থনা করাতে প্রকাশ হইয়া পড়িল। তথাপি দুই এক জন মনে মনেই ঠাকুরকে মনের কথা জানাইল। পাঠক মহাশয়কে বলিতে ভুলিয়াছি যে, আরতির আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পূজারী ঠাকুরের বাম হস্তে একটা একসের ওজনের ঘণ্টা বাজিয়াছিল।

সন্ধ্যার পর প্রিয়মাধবের বাড়ী যাইবার কথা ছিল বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথ তথা গমন করিলেন। পত্রখানি সঙ্গে লইয়া যাইবার আশা বিফল হইল। রিক্তহস্তে গমন করিলেন।

যখন তিনি তথা উপনীত হইলেন, তখন প্রিয়মাধব গৃহে ছিলেন না। তিনি একাকী বৈঠকখানার গিয়া বসিলেন। প্রিয়মাধবের বৈঠকখানাটি অল্পায়তনবিশিষ্ট হইলেও দেখিতে সুন্দর। বৈঠকখানার মধ্যস্থলে ঘর জুড়িয়া এক খানি শতরঞ্জ পাতিত রহিয়াছে। তাহার উপর ঠিক্ মধ্যস্থলে চারি হস্ত দীর্ঘ ও তিন হস্ত প্রস্থের একখানি গালিচা শোভা পাইতেছে। গালিচার পশ্চাদ্ভাগে একটি বড় এবং বামে দক্ষিণে দুইটি ছোট তাকিয়া পেট ফুলাইয়া পড়িয়া আছে। বৈঠকখানার সর্ব্বসমেত তিনটি দ্বার। তিনটিতেই এক এক খানি করিয়া নারিকেল-ত্বকের পাপোশ পদধূলিতে ভারি হইয়া পাতিত রহিয়াছে। তিনটি দ্বারের উপরে তিন খানি বড় বড় ছবি লম্বিত আছে। সে তিন খানি ছবি এই,—শিবদুর্গা, রামসীতা ও রাধকৃষ্ণ। এতদ্ব্যতীত আরও কুড়ী খানি ছবি দেওয়ালের চারিদিকে আলম্বিত আছে। তাহাদের মধ্যে দশখানি বিষ্ণুর দশাবতার ও বাকী দশখানি শক্তির দশমহাবিদ্যা।

ধীরেন্দ্রনাথ বসিয়া রহিলেন। সম্মুখে একটি কাচনির্ম্মিত আলোকাধারে অন্ধকার নাশিবার দ্রব্য জ্বলিতেছে। বাটীর সমস্ত নিস্তব্ধ; কেবল মধ্যে মধ্যে অন্তঃপুর হইতে সুধাময়ের কণ্ঠশব্দ পাওয়া যাইতেছে। সেই কণ্ঠরব চীৎকার, রোদন ও আনন্দসূচক। বহির্দ্বারের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে এক জন দ্বারবান খাটিয়া পাতিয়া শুইয়া আছে। নিদ্রা যায় নাই, শুইয়া শুইয়া নাকী

(সানুনাসিক) স্বরে ধীরে ধীরে ভজন গায়িতেছে। সেই ভজন গান তাহাকেই ভাল লাগিতেছে, অন্যের কর্ণে কর্কশ। দ্বারবানের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, সে একাকীই কিন্নরকণ্ঠবিনিন্দিত স্বরের কর্ত্তব দেখাইতেছে; কেহ শুনিতেছে না—শুনিলে কালাবৎকে গালি খাইতে হইত। তাহার গীতধ্বনি যেখানে উত্থিত হইতেছে, তাহার কিঞ্চিদ্দূরে গিয়াই বিলয় পাইতেছে—বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে না। প্রবেশ করিলে সুধাময় ভয় পাইত।

এমন সময়ে প্রিয়মাধব দ্বারে প্রবেশ করিলেন। দ্বারবান্ গান বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রিয়মাধব একবার তাহার দিকে চাহিয়া বৈঠকখানায় যাইবার জন্য সোপানে উঠিতে লাগিলেন। চর্ম্মপাদুকার শব্দ হইতে লাগিল। ধীরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, প্রিয়মাধব আসিতেছেন। প্রিয়মাধব বৈঠকখানাগৃহে প্রবেশ করিয়াই "সংবাদ কি" বলিয়া গালিচার উপর উত্তরীয় খানা ফেলিয়া দিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ভাল নয়।"

"কেন?"

"গোলযোগ ঘটিয়াছে। মহাবিভ্রাট।"

"সে আবার কি?"

"হিরণ্ময়ী জানিতে পারিয়াছেন।"

"পত্রখানা আনিয়াছ কি?"

"হিরণ্ময়ী সে খানা আর অলঙ্কারগুলি আমার শয্যাতল হইতে লইয়া গিয়াছিলেন। সমস্তই পড়িয়াছেন। পড়িয়া আমাকে ভৎর্সনা করিতে আসিয়াছিলেন। আমি অনন্যোপায় হইয়া তাহা কাড়িয়া লইয়াছিলাম। তাহা দেখিয়া তিনি উহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন। হিরণ্ময়ীর অত্যন্ত রাগ হইয়াছে।"

এই কথাগুলি শুনিয়া প্রিয়মাধব কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে অর্দ্ধহেলিত ভাবে উপবেশন করিলেন। কটিদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরের ভর দক্ষিণ হস্তের উপর পড়িল আর বাম হস্তের পাঁচটি অঙ্গুলি কেশরাশির মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে লাগিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ নেত্র নিমীলন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া বলিলেন, "ধীর! তুমি ভাবিও না। কোন ভয় নাই।"

ধীরেন্দ্রনাথ উত্তর কবিলেন, "ভয় নাই কেমন করিয়া, প্রিয়মাধব? ভয় সম্পূর্ণ, কারণ হিরণ্ময়ী তাহার বালিকাস্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকেই দোষী করিয়াছে। আমি যে কিরণময়ীকে ভালবাসি, এটি হিরণ্ময়ীর স্থিরসিদ্ধান্ত। যদি সে এই পত্র ও অলঙ্কার লইয়া বাড়ীময় গোল করে, তাহা হইলে তাহার পিতামাতা কি মনে করিবেন? প্রিয়মাধব! আমার কি দুবদৃষ্ট। আমি কোন দোষে দোষী নহি অথচ আমারই উপর সমস্ত দোষ পড়িল। আমি সে দিন উদ্যান হইতে পত্র অলঙ্কার আনিয়া ভাল-করি নাই। পুষ্করিণীব জলে ফেলিয়া দিলেই ভাল হইত। কিন্তু কপালে যাহা আছে, তাহা—" এই পর্য্যন্ত বলিলে পর প্রিয়মাধব বলিলেন,

"আমি বেস্ জানি হিবণ্ময়ী কথনই এ কথা লইয়া বাড়ীতে গোল বাঁধাইবেন না। তুমি নিশ্চয় জানিও যে, যে যাহাকে অত্যন্ত ভালবাসে, সে তাহাকে এইরূপ করিয়া থাকে।—ইহাব নাম ভালবাসাব অভিমান। আমি বলিতেছি, তোমার কোন ভয় নাই। হিরণ্ময়ী তোমাকে রাগ করিয়া মুখে যাই বলুন, কিন্তু মনে তাহাব বিপরীত। তুমি তাঁহার স্বার্থ, সুতরাং তিনি কথনই স্বার্থহানির চেষ্টা করিবেন না। এথন্ একটি কথা শুন,—তুমি তাঁহাকে নিজ নির্দ্দোষিতা আরও ভাল কবিয়া বুঝাইয়া দিও। বালিকা বুঝান বড় কঠিন ব্যাপাব। প্রস্তবের প্রতিমূর্ত্তিকে গান শুনাইয়া থামাইতে হইবে, ইহা যেন মনে থাকে।" প্রিয়মাধব নীবব হইলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তবে আমি এথন যাই। আবার আসিয়া যাহা ঘটে বলিব।"

প্রিয়মাধব বলিলেন, "আহার করিয়া যাও।"

মনে সুথ নাই, সুতবাং ধীবেন্দ্রনাথ অস্বীকার করিলেন। কিন্তু প্রিয়মাধব ছাড়িলেন না। সঙ্গে করিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন। উভয়ে একসঙ্গে আহার করিতে বসিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ থাইতে পারিলেন না, যেমন পূর্ণপাত্র ছিল, প্রায় তাহাই রহিল। তদ্দর্শনে প্রিয়মাধব দুঃখিত হইলেন, কিন্তু উচ্ছিষ্টপরিষ্কারকারিণী কালিন্দীর আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

ধীরেন্দ্র বাটী ফিরিয়া আসিলেন। তিনি যেরূপ চিন্তায় ডুবিয়াছিলেন,

তাহাই রহিলেন। আপনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। একজন ভৃত্য তাঁহাকে আহার করিতে ডাকিতে আসিল। তিনি "ক্ষুধা নাই" বলিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। ভৃত্য মুখে "যে আজ্ঞে" কিন্তু মনে "এ বেলা বিধাতা কপালে মাপেন নাই" বলিয়া ফিরিল। পাঠক, মনে করিবেন না যে, ধীরেন্দ্রনাথের কপালে বিধাতা মাপেন নাই। সে আপনার সম্বন্ধেই বলিল। এ বেলা সে ধীরেন্দ্রনাথের প্রসাদলাভে বঞ্চিত।

ধীরেন্দ্রনাথ দ্বাররুদ্ধ করিয়া, শয়ন করিবার সময়ে শয়ন করিলেন। গ্রীষ্মকালে স্বভাবতঃ রাত্রিমান হ্রস্ব, কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথের পক্ষে শীতকালের অপেক্ষাও দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। বাস্তবিক অসুখের এক দণ্ড যেন এক প্রহর বলিয়া বোধ হয়। সেই রাত্রিকালে কিরণময়ী বা হিরণ্ময়ীর সহিত তাঁহার আর সাক্ষাৎ হইল না। তিনিও তাহার চেষ্টা করিলেন না। সারারাত্রি জাগিয়া শেষ রাত্রিতে কিঞ্চিৎ নিদ্রা হইয়াছিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্দেহোচ্ছেদ।

এক দিন দুই দিন করিয়া এক সপ্তাহ অতীত হইল। ধীরেন্দ্রনাথ, কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ী আপনাপন চিন্তাকে লইয়া এই কয় দিন অতিবাহিত করিলেন। এই সাত দিনের মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ নিজ নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য হিরণ্ময়ীকে কএকবার বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু হিরণ্ময়ী তখনও তলাইয়া বুঝেন নাই।

অদ্য ধীরেন্দ্রনাথের শুভদিন। আজ তিনি প্রাতঃকালে কাহার মুখ দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন, বলিতে পারি না। কিন্তু যদি তিনি কাহার মুখ দেখিয়া থাকেন, তবে সে ব্যক্তি সুমুখ—তাহার মুখের মহিমা আছে।

হিরণ্ময়ী একটি চন্দনচর্চ্চিত পুষ্প হস্তে করিয়া ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ধীরেন্দ্রনাথ একখানি হস্তলিখিত নীতিগ্রন্থ

পাঠ করিতেছেন। কেন যে তিনি উহা পড়িতেছেন, তাহা হিরণ্ময়ীর হৃদয়ঙ্গম হইল না। ফলে ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীর ক্রোধশান্তি ও মতপরিবর্ত্তনের জন্যই পড়িতেছিলেন। কিন্তু আর তাঁহাকে পড়িয়া পড়িয়া, মনের মত শ্লোক খুঁজিয়া মস্তক ঘুরাইতে হইল না। আপনা আপনি উদ্দেশ্য সফল হইবার পন্থা প্রস্তুত হইল।

একটি পুষ্করিণীতে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সবলে নিক্ষিপ্ত হইলে উহার জল যেমন উপর্য্যুপরি তরঙ্গ-চক্রে চঞ্চল হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পত্রালঙ্কার আঘাতিতা হিরণ্ময়ীও প্রথমে কয় দিন উপর্য্যুপরি চঞ্চল হইয়া অদ্য শান্ত হইয়াছেন। অনেক চিন্তা ও মত কাটাকাটির পর তাঁহার চিত্তোদ্বেগ হ্রাস হইয়াছে। ধীরেন্দ্রনাথ আজ কএক দিন ধরিয়া তাঁহার মুখমণ্ডলে যে সকল ক্রোধসূচক অপ্রীতিকর চিহ্ন দেখিয়া আসিতেছিলেন, অদ্য আর তাহা দেখিতে পাইলেন না। তবে কি দেখিলেন ?—দেখিলেন বৎসরান্তে বর্ণবিচ্যুত দেবীমূর্ত্তিতে যেন আবার রঙ ফলান হইয়াছে। অদ্য ধীরেন্দ্রনাথের চক্ষু জুড়াইয়া গেল। নূতন মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার অন্তরে নূতন চিন্তার আবির্ভাব হইল। যাহা হইবার আশা ছিল না, তাহাই হইল। ধীরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, উগ্রচণ্ডা আজ অন্নপূর্ণা। প্রাণ জুড়াইয়া গেল। পুঁথি বন্ধ করিয়া হিরণ্ময়ীকে কেবল দেখিতে লাগিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথকে দেখিলে যে হিরণ্ময়ীর পক্কবিম্ববৎ ওষ্ঠাধরে হাস্যরেখা নাচিয়া উঠিত, কএক দিন ধরিয়া তাহা লুকাইয়াছিল,—আজ আবার দেখা দিল। ধীরেন্দ্রনাথ দেখিলেন যেন গম্ভীর কাদম্বিনী-মুখে সৌদামিনী দেখা দিল—অন্ধকারে আলোক হইল।

হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের সম্মুখে উপবেশন করিলেন। তাঁহার বসনাঞ্চলের কিয়দংশ ভূতলে লম্বমান হইয়া পড়িয়া রহিল। নিবিড় কেশগুচ্ছ আলুলায়িত। তাহার মধ্যাংশ পৃষ্ঠদেশে এবং অপর দুই ভাগ দুই স্কন্ধ বহিয়া সম্মুখে ঝুলিয়া পড়িল। মনোহর মুখমণ্ডল সেই অসিতচিকুরগুচ্ছের মধ্যে সুশোভিত হইল। ধীরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, খনির ভিতরে মণি—মেঘবর্ণসরোজলে প্রফুল্ল কমল। হিরণ্ময়ীর যে চক্ষু আজ কএক দিন ধরিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে ভয় দেখাইতেছিল, আজ তাহাই ভরসার স্থল হইল।

হিরণ্ময়ীর চিত্তভাব যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ধীরেন্দ্রনাথ তাহার দুই জন সাক্ষী পাইলেন। সে দুই জন সাক্ষী কে?—নয়নযুগল।

চন্দ্রের কিরণ মলিন দর্পণেও পড়িলে উহা হাসে, হিরণ্ময়ীর হাস্যরেখা বৈমর্ষ্য-মলিন ধীরেন্দ্রনাথের ওষ্ঠাধরে পতিত হওয়াতে উহাও হাসিল। ধীরেন্দ্রনাথ হাসিলেন বটে, কিন্তু এখনও সাহস করিয়া কোন কথা কহিতে পারিলেন না। অগ্রে হিরণ্ময়ীরই বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল।

তিনি বলিলেন, "ধীরেন্! এই ফুলটি ধর।"

ধীরেন্দ্রনাথের আর বিলম্ব সহিল না। অঞ্জলি পাতিয়া ফুলটি লইলেন।

তখন হিরণ্ময়ী বলিলেন, "এটি ঠাকুরের ফুল। তুমি এইটি ছুঁইয়া শপথ কর।"

ধীরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, আবার পরীক্ষা। ভাবিয়া বলিলেন, "হিরণ্! কি শপথ করিব?"

"তুমি কাহাকে মন খুলিয়া ভালবাস?"

"যিনি এই প্রশ্ন করিলেন, তাঁহাকে।"

"আর বড় দিদিকে?"

"না।"

"তবে তাঁহাকে কিরূপ ভালবাস?"

"সে ভালবাসা তোমার প্রতিকূল নহে।"

"সত্য?

"তোমার প্রদত্ত দেবপ্রসাদী পুষ্পই তাহার সাক্ষী।"

"ভাল, তাহাই হইল, কিন্তু তোমাকে আর একটি শপথ করিতে হইবে।"

"কি?"

হিরণ্ময়ী সহসা ধীরেন্দ্রনাথের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। লজ্জা আসিয়া তাঁহার কণ্ঠ রোধ করিল, সুতরাং জিহ্বা বাক্য উচ্চারণ করিল না। তাঁহাকে নিরুত্তরে থাকিতে দেখিয়া ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কই, চুপ করিয়া রহিলে যে?"

প্রশ্নের উপর প্রশ্ন, সুতরাং হিরণ্ময়ী আর নীরব হইয়া থাকিতে পারিলেন না। উত্তর দিলেন, "ধীরেন! তুমি বড় দিদিকে বিবাহ করিবে না বল।"

এই বলিয়াই লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন। কিন্তু ওষ্ঠাধরে ঈষৎ হাস্যরেখা ফুটিল। ধীরেন্দ্রনাথ তাহা দেখিতে পাইলেন কি না, বলিতে পারি না।

ধীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "হিরণ্! বুঝিয়াছি,—এইটিই তোমার মূলকথা। তা' এত শপথ না করাইয়া অগ্রে এইটির উত্থাপন করিলেই ত চুকিয়া যাইত।" আবার হাসিয়া বলিলেন, "ভাল হিরণ! না হয় আমি শপথ করিলাম যে, কিরণময়ীকে বিবাহ করিব না, কিন্তু তাহাতে তোমার লাভ কি?"

লজ্জাবতী হিরণ্ময়ী আরও লজ্জাবনতমুখী হইলেন। ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কি উত্তর দিবেন, খুঁজিয়া পাইলেন না।

তখন ধীরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বের ন্যায় হাস্য করিয়া পরিহাসচ্ছলে বলিলেন, "আমি চিরকালই অবিবাহিত থাকিব। আমার একেবারেই বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই। বাল্যকাল হইতে তোমাদের দুইটি ভগিনীকে দেখিয়া আসিতেছি, এক্ষণে তোমাদের দুই জনকে দুইটি উপযুক্ত পাত্রের সহিত এক হইতে দেখিলেই আমার আশা মিটে—চক্ষু জুড়ায়।"

সরলা হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের পরিহাস বুঝিতে পারিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন "কি হইতে কি হইল। আমি কি বলিলাম আর ধীরেন্ কি বুঝিলেন!" এই ভাবিয়া আবার ভাবিলেন, "সত্যই কি ধীরেন্দ্রনাথ একেবারে বিবাহ করিবেন না? বোধ হয়, বড় দিদিকে ইহাঁর বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমি এইরূপ গোলযোগ করাতে এক্ষণে বিবাহ-আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতেছেন। বুঝি আমার আশা ভরসা ঘুচিয়া গেল।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার স্মিতমুখখানি শুকাইয়া গেল—আবার বিষাদের রেখা ফুটিয়া উঠিল। মন অস্থির হইল; যেন কি হইতে কি ঘটিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে চক্ষু দুইটি ছলছল করিয়া আসিল। ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ এতক্ষণ নীরব হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলেন। এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন, সুবর্ণ-প্রতিমায় আবার কালিমা আধিপত্য বিস্তার করিল। তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন,—

"হিরণ্ময়ি! তোমার মনের প্রকৃত ভাব কি?"

বিষাদপ্রতিমা হিরণ্ময়ী নিরুত্তর।

ধীরেন্দ্রনাথ আবার বলিলেন, "তোমার কি বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই? তাই কি তুমি বিবাহের নাম শুনিয়া এমন হইলে?"

এবার হিরণ্ময়ী প্রশ্নাত্মক উত্তর করিলেন, "তোমার কেন বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই?" ধীরেন্দ্রনাথ যে পরিহাসচ্ছলে বিবাহ করিব না বলিয়াছিলেন, হিরণ্ময়ী তাহার বিপরীত ভাবিয়া মনে মনে ঠিক করিলেন, ধীরেন্দ্রনাথ জব্দ হইয়াছেন—ফাঁপরে পড়িয়াছেন। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহার এই কথার যেরূপ উত্তর দিলেন, তাহা হিরণ্ময়ীর কল্পনাকে হারাইয়া দিল। তিনি এই উত্তর দিলেন, "হিরণ! আমি যে কেন বিবাহ করিব না, তাহার নিগূঢ় কারণ আছে।"

অমনি হিরণ্ময়ী ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "কি কারণ, ধীরেন্? শুনিতে পাই না?" এই বলিয়া তাঁহার মুখের দিকে একবার দৃষ্টি করিয়া আবার নতমুখী হইলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ চতুরতা প্রকাশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, হিরণ্! সে কথা আর কি বলিব? আমি একটি সুন্দরীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার সেরূপ ইচ্ছা নহে। তিনি, বোধ হয়, আর কাহাকেও স্বামিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং আমি আশায় নিরাশ হইয়া একেবারেই যাবজ্জীবন অবিবাহিত থাকিব মনস্থ করিয়াছি। হিরণ! যদি মনের মানুষ পরের হইতে চলিল, তবে আর অন্য এক জনকে কি করিয়া মনের করিব? তুমি নিশ্চয় জানিও, এক জনের দুই জন ঠিক মনের মানুষ হইতে পারে না। সেই জন্য আমারও আর বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই। শুনিলে ত?"

এই কথা শুনিয়া আবার হিরণ্ময়ী কতকটা পূর্ব্বচিন্তায় প্রগাঢ় ও অপ্রীতিকর ছায়াতলে পড়িলেন। বলিলেন, "বড় দিদির সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে না বুঝি?"

ধীরেন্দ্রনাথ ঈষৎ দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "আবার সেই কথা? এই লও তোমার ফুল। যাহার মন সর্ব্বদা সন্দেহের ক্রীতদাস, তাহার শপথ করাইতে আসা বিড়ম্বনা মাত্র।" হিরণ্ময়ী ইতস্তত করিতে লাগিলেন। বলিলেন,

"ক্ষমা কর, আর বলিব না।" এই বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথের চিত্তোদ্বেগ উপশম করিবার আশায় বলিলেন, "ধীরেন্! তবে কে তোমাকে হতাশ করিল? এমন নিষ্ঠুরা রমণী কে?"

এইবার ধীরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে মনের দ্বার খুলিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "যে বলে—সে।"

হিরণ্ময়ী লজ্জায় মুখ ফিরাইলেন—দুই চারি বার ঈষৎ হাসি হাসিলেন। তাঁহার হৃদয় অপরিসীম আনন্দের আশ্রয় হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কেবল কি ভাবিতে লাগিলেন। এ ভাবনায় যে অনুপম সুখরাশির বিকাশ হইল, তাহা তাঁহার মুখমণ্ডলই বুঝাইয়া দিল। অনন্তর তিনি বলিলেন,

"ধীরেন্! তুমি কি সত্য বলিতেছ?"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সত্য মিথ্যা আমি জানি না। তবে এইমাত্র জানি যে, ঠাকুরের ফুল হাতে করিয়া ধীরেন্দ্রনাথ যাহা বলিতেছে, তাহাতে হিরণ্ময়ীর বিশ্বাস হয় ভাল, না হয় ধীরেন্দ্রনাথ নাচার।"

হিরণ্ময়ী আর কোন উত্তর করিলেন না। কেবল ধীরেন্দ্রনাথের পদধারণ করিয়া এই বলিলেন, "ধীরেন্! তোমাকে আরও একটি শপথ করিতে হইবে। বল, তুমি আমাকে ক্ষমা করিলে—আমার সকল অপরাধ ভুলিয়া গেলে।"

ধীরেন্দ্র সহাস্য মুখে হিরণ্ময়ীর হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "হিরণ! আমি তোমার উপর রাগ করি নাই, তোমার কোন দোষই দেখিতে পাই নাই, তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করিবার যোগ্য এমন কোন কার্য্যই কর নাই; তবে নিরপরাধিনীকে কে কোথায় ক্ষমা করে? সেরূপ ক্ষমা যে আকাশকুসুম, হিরণ! তুমি যাহা করিয়াছ, ভাবিয়াছ, তাহা বালিকায় করে। বালিকার তাহাই স্বভাব। সুতরাং বালিকা হিরণ্ময়ীর কার্য্যে দোষ লক্ষিত হয় না।"

হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের এই যুক্তিগর্ভ কথাগুলি শুনিয়াও, তথাপি আব্দার করিয়া বলিলেন, "না, তোমাকে ক্ষমা করিতেই হইবে। তা নহিলে আমি তোমার পা ছাড়িব না।" এই বলিয়া আবার তাঁহার পদধারণ করিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বাধা দিলেন। বাধা দিয়া বলিলেন, "সাধে কি আমি বলি তুমি বালিকা ?"

"আচ্ছা, আমি বালিকা। তুমি ক্ষমা করিবে কি না ? বল বল, তা নহিলে তোমার পায়ের আঙুল ভাঙিয়া দিব।" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ীর এই ভাবপরিবর্ত্তন দেখিয়া কে বলিবে যে এই হিরণ্ময়ীই সেই হিরণ্ময়ী ?

ধীরেন্দ্রনাথ স্মিতমুখে হিরণ্ময়ীর করতলে নিজ করতল রক্ষা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি যদি দোষী হইয়া থাক, তোমাকে ক্ষমা করিলাম।"

এই মনোমত কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথকে ভূ-ললাট হইয়া একটি প্রণাম করিলেন। এ প্রণাম চতুরতার নহে সরলতার।

ধীরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "উভয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।"

হিরণ্ময়ী এই কথা শুনিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। সে হাসিতে কত মাধুর্য্য, কত সৌন্দর্য্য, কত আনন্দোচ্ছ্বাস যুগপৎ পরিলক্ষিত হইল, তাহা ধীরেন্দ্রনাথের তৃষাতুর নয়নযুগলই জানিতে পারিয়াছিল। এরূপ হাসি ধীরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। এই হাসি—এই অনির্ব্বচনীয় হাসি—এই কল্পনাতীত হাসি হাসিয়া হিরণ্ময়ী বলিলেন, "ধীরেন্! আমায় ভুলিও না।" এই কএকটি অক্ষর ধীরেন্দ্রনাথের হৃদয় ও মনের অন্তস্তলে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইল।

ধীরেন্দ্রনাথ যেন নিদ্রোত্থিত হইয়া জাগরিত হইলেন, নিশার পর দিবা দেখিলেন, দুঃখের পর সুখ দেখিলেন, অন্ধকারের পর আলোক দেখিলেন, নিরাশার পর ভরসা দেখিলেন। অপরিসীম পুলকে মোহিত হইয়া বলিলেন, "ধনেশ-তনয়া হিরণ্ময়ী কখন দরিদ্র ধীরেন্দ্রনাথকে ভুলিতে পারেন, কিন্তু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ধীরেন্দ্রনাথ জীবনের একমাত্র ভালবাসার—পবিত্র ভালবাসার—স্বর্গীয় ভালবাসার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি হিরণ্ময়ীকে কখনই ভুলিবে না। যত দিন ধীরেন্দ্রকে যম ভুলিয়া থাকিবে, তত দিন সে আশাস্বরূপিনী হিরণ্ময়ীকে ভুলিবে না, আর যে দিন যম তাহাকে ভুলিতে ভুলিয়া যাইবে, সে সেই দিনই হিরণ্ময়ীকে—" এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্র হিরণ্ময়ী কোমল কর-কমল

দিয়া ধীরেন্দ্রনাথের মুখ ঢাকিয়া আর কথা কহিতে দিলেন না। দুঃখিত চিত্তে বলিলেন, "ছি ছি, অমন কথা বলিতে নাই। আবার যদি ও কথা মুখে আন, তা' হ'লে আমি আর তোমার কাছে আসিব না।"

ক্ষণেক পরে ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ভাল, হিরণ্ময়ি! তুমি কি আমাকে বরাবর মনে রাখিবে?"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "আমি, ধীরেন্! তোমার মত অত কথা বলিতে জানি না, সুতরাং কেমন করিয়া বুঝাইয়া বলিব? তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি তোমায় বরাবর মনে রাখিব কি ভুলিয়া যাইব, তাহা তুমি আমার কার্য্যেই দেখিতে পাইবে।"

ধীরেন্দ্রনাথ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তাঁহার অন্তরনিহিত হৃদয়-সঞ্চিত দুশ্চিন্তা, দুঃখ, বিমর্ষতা সকলই একে একে বিলীন হইয়া গেল। হিরণ্ময়ীও তত্তাবৎ ভুলিয়া গেলেন। আবার যেই ধীরেন্দ্রনাথ—সেই ধীরেন্দ্রনাথ আর যেই হিরণ্ময়ী—সেই হিরণ্ময়ী।

পাঠক! আইস তোমার সহিত আমরা ঘটনাচক্রকে নমস্কার করি। ঘটনার ষড়যন্ত্রে না হইতে পারে এমন বিষয় আজিও কেহ দেখে নাই—পরেও দেখিবে না।

অনেক ক্ষণ ধরিয়া উভয়ের এই সন্দেহ-নিরাকরণের কথাবার্ত্তা হইল। দেখিতে দেখিতে বেলা বাড়িয়া উঠিল। তখন হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

উভয়েরই সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, এই দীর্ঘকালস্থায়ী কথোপকথনের সময় কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষে আইসেন নাই। অদ্য তাঁহার শরীর কিছু অসুস্থ ছিল বলিয়া আসিতে পারেন নাই।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

মুখবন্ধ।

ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীতে এই কয় দিন ধরিয়া যেরূপ মনান্তর হইয়া আসিতেছিল, কিরণময়ী এতাবৎ তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। মনান্তরের পর পুনরায় উভয়ের মনোমিলন হইল, ইহাও তিনি জানিতে পারিলেন না। তিনি পূর্ব্বে যাহা জানিয়াছিলেন, এখনও তাহাই। আমাদের এরূপ সিদ্ধান্তে, পাঠক মহাশয়, এই কথা বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে, ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীর এই কএক দিনের ভাবপরিবর্ত্তনে কিরণময়ী কি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না? তদুত্তরে আমরা বলি, তিনি যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহা অন্যরূপ। ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীর অসুস্থতা-নিবন্ধন ভাববৈপরীত্য ঘটিয়াছে, ইহাই কিরণময়ী বুঝিয়াছিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীর পুনর্ম্মনোমিলনের পর দেখিতে দেখিতে পাঁচ ছয় দিন গত হইল।

যে দিবস কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথকে পত্র লিখিবার ও অলঙ্কার হারাইবার জন্য হিরণ্ময়ীর হাতে ধরা পড়িয়াছিলেন, সে দিবস হইতে তিনি লজ্জিত ও ভীত হইয়াছিলেন। তাঁহার কল্পনা ধীরেন্দ্রনাথকে মিলাইয়া দিবার আশা দেখাইলেও, তিনি চিন্তিত হইয়াছিলেন। ধরা পড়িবার অব্যবহিত পূর্ব্বে চিত্ত যেরূপ পরিস্কৃত ছিল, কিন্তু ধরা পড়িবার পরক্ষণ হইতেই তাহা বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। মনে বড় লজ্জা, বড় ভয়, কারণ হিরণ্ময়ী রহস্যভেদ করিয়াছেন। তিনি পিতা মাতার অগোচরে এরূপ দুঃসাহসিক ও বিধিবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, হিরণ্ময়ী উহা জানিতে পারিয়াছেন। এখন পাছে তিনি বালিকাস্বভাবনিবন্ধন বাড়ীময় গোল করিয়া দেন, এই জন্য কিরণময়ীর বড় লজ্জা ও বড় ভয় হইয়াছে।

কি করিলে তিনি এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু সহসা কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। মনে মনে

কতই কৌশলের সৃষ্টি করিলেন—কতই চূর্ণ করিলেন—আবার সেই চূর্ণাংশ মিশাইয়া কতই নূতন করিয়া গড়িলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইয়া উঠিল না। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিলেন—হিরণ্ময়ীর মুখবন্ধ। তা' ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। এইরূপ ঠিক করিয়া তাহারই চেষ্টায় রহিলেন। তিনি সকল কার্য্য বিস্মৃত হইয়া কেবল হিরণ্ময়ীর মুখবন্ধের জন্যই ব্যতিব্যস্ত হইলেন। কিন্তু, তাহাও বলি, তিনি সকল কার্য্য ভুলিয়াও আর এই ঘোর সঙ্কটে পড়িয়াও ধীরেন্দ্রনাথকে ভুলিতে পারেন নাই। যদিও আজ কাল তিনি লজ্জা ও ভয়ে ধীরেন্দ্রনাথকে দেখা দেন না, কিন্তু মনে মনে সর্ব্বদাই চিন্তা করিয়া থাকেন। দেখা দিবার বা দেখা করিবার অন্য কিছু বাধা বা কারণ নাই, কেবল হিরণ্ময়ীরই ভয়। পাছে তিনি দেখিলে আরও সন্দেহ করেন, এই জন্যই কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না।

কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যেরূপ সাক্ষাৎ করেন না,সেইরূপ হিরণ্ময়ীর নিকটেও সর্ব্বদা থাকেন না। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য। এইরূপ করিতে করিতে চারি পাঁচ দিন গত হইয়া গেল।

এ দিকে হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সকল অভিমান ও ক্রোধ ভুলিয়া গেলেন—পূর্ব্বের ন্যায় হইলেন। এইরূপ হইয়া লোকে আবার যাহা করে, তিনিও তাহাই করিতে লাগিলেন।

এক দিন তিনি একাকিনী সেই উদ্যানের মধ্যে গিয়া আপন মনে পুষ্পচয়ন, মালাগুম্ফন,গুচ্ছবন্ধন করিতে লাগিলেন। কেন যে এরূপ করিতে লাগিলেন, তাহা বলিতে পারি না। তবে অনুমানে এই বোধ হয় যে, ধীরেন্দ্রনাথকে উপহার দিবার জন্য। পূর্ব্বে তিনি প্রায় এইরূপ পুষ্প-উপহার দিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে সুখী করিতেন, কিন্তু মধ্যে রাগ করিয়া কএক দিনের মধ্যে একটি দিনও আর সেই স্বর্গীয় উপহার দেন নাই। অদ্যই বোধ করি, তাহার পুনরারম্ভ। হিরণ্ময়ী ক্রমে ক্রমে মালাগুম্ফনাদি সমাপন পূর্ব্বক এক একটি সোপান অতিক্রম করিয়া পুষ্করিণীতে নামিলেন। নামিয়া সলিল-চুম্বিত সোপানের উপর উপবেশন করিলেন। উপবিষ্ট হইয়া অলক্তরঞ্জিত পা দুখানি জলমধ্যে ডুবাইয়া তল-সোপান স্পর্শ করিয়া রহিলেন। পুষ্করিণীর

জল অতিশয় পরিষ্কার। কটিপ্রমাণ জলের ভিতর কি পড়িয়া আছে, তাহা অনায়াসে লক্ষিত হয়। তাঁহার রাঙা পা দুখানি জলমধ্যে মগ্ন হইয়াও আকার লুকাইতে পারিল না। সেই গুল্‌ফ—সেই পদূর্দ্ধভাগ—সেই অঙ্গুলি—সেই নখ এবং সেই রাঙা টুক্‌টুকে অলক্তরেখা স্বচ্ছ সলিল ভেদ করিয়া তাঁহার নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। তবে বিস্ময়ের মধ্যে এই যে, জলের ভিতর থাকিয়া পা দুখানি যেন কিছু চেপ্টা দেখাইতে লাগিল। তিনি তদ্দর্শনে এক এক বার জলের মধ্যেই ইতস্তত করিয়া চরণ চালনা করিতে লাগিলেন, চরণ দুইটিও মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে তিনি এক এক বার কুন্দবিনিন্দিত সুন্দর দন্ত বিকাস করিয়া হাসিতে লাগিলেন। হাসিয়া আবার পা দুখানি কিয়ৎক্ষণ স্থির রাখিয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। সেইখানকার জলও স্থির হইয়া রহিল। এমন সময় একটি মীনশাবক আস্তে আস্তে তাঁহার জলমগ্ন পদের এক হস্ত দূরে আসিয়া স্থির হইয়া রহিল। ভাসিয়া থাকিবার জন্য কেবল ধীরে ধীরে পাখ্‌না নাড়িতে লাগিল। কোনমতে সরিল না,কেবল অলক্তরঞ্জিত পদের দিকে নিশ্চল চক্ষে চাহিয়া রহিল। হিরণ্ময়ী সেটিকে দেখিয়া আরও সাবধান হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। কেবল এক এক বার তাহার দিকে আর এক এক বার জলমগ্ন পা দুখানির দিকে দৃষ্টিপরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ আশা, ততক্ষণ দেখা হইল। আশাও পূরিল আর পা দুখানিও নড়িল। মীনশাবক "ধর্‌লে রে ধর্‌লে রে" বলিয়া দৌড় দিল। ঘাট ছাড়াইয়া উহার বাম পার্শ্বস্থ তীরে জলমগ্ন শৈবালদলের ভিতর লুকাইল।

মীনশাবক পলাইল—হিরণ্ময়ীরও আর একটি কার্য্য আরম্ভ হইল। তিনি একখানি সদ্যশ্ছিন্ন কদলী পত্রে করিয়া,চয়িত পুষ্প, পুষ্পের হার ও পুষ্প-গুচ্ছ সাজাইয়া আনিয়াছিলেন। সেই পত্র খানি অগ্রে ধুইয়া সোপানের উপর রাখিলেন। অনন্তর তাহার উপর পুষ্প প্রভৃতি একটির পর একটি সাজাইয়া অঞ্জলি পূরিয়া সেই গুলিতে জল ছিটাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার অমনোযোগিতায় তদীয় শুষ্ক অঞ্চলের শিরোভাগ ভিজিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি করিয়া উহা যেমন তুলিয়া লইবেন, অমনি দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সবলে লাগিয়া এক ছড়া মালা ছিঁড়িয়া গেল। তিনি তদ্দর্শনে কিঞ্চিৎ

দুঃখিত ও বিরক্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া কএকটি ফুল ফেলিয়া দিয়া আবার মালাছড়াটির সূত্র বন্ধন করিলেন। মালাছড়াটি কিছু ছোট হইল— তা হউক।

অনন্তর তিনি আস্তে আস্তে জলসিক্ত পুষ্পমালা প্রভৃতি কদলীপত্রে বন্ধন করিয়া মুখপ্রক্ষালন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। জল স্থির হইল। তিনি তাহাতে শশাঙ্কসদৃশ মুখখানি দেখিতে লাগিলেন। মুখ দেখিবার ভঙ্গিই বা কত। কখন জিহ্বা, কখন দন্ত, কখন চক্ষু, কখন কপাললম্বিত কেশগুচ্ছ, কখন ওষ্ঠাধর এবং কখন নাসিকা দেখিতে লাগিলেন। মন ভরিয়া জলদর্পণে মুখ দেখা সাঙ্গ হইল। ফুলের পাত লইয়া আবার এক দুই করিয়া জলসোপান অবধি সর্ব্বোর্দ্ধ সোপান পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত এগারটি সোপান অতিক্রম করিলেন। অবরোহণের সময় কষ্ট হয় নাই, কিন্তু আরোহণের সময় কতকটা হইল। পাঠক মহাশয় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিষয় অবগত থাকিলে এই কষ্টের কারণ বুঝিতে পারিবেন। সেই পুষ্করিণীর চারি দিকে চারিটি ঘাট ছিল। হিরণ্ময়ী দক্ষিণ দিকের ঘাটে এই পুষ্পসিক্তকরণ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

এক্ষণে অপরাহ্ণ। হিরণ্ময়ী উপরে উঠিয়া চাতালের পশ্চিম পার্শ্বস্থ রোয়াকের উপর বসিয়া দক্ষিণ দিকে কদলীদলাবদ্ধ পুষ্পগুলি রক্ষা করিলেন। অপরাহ্ণ উপনীত হওয়াতে সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে সরিয়া বসিলেন। তাঁহার উত্তপ্ত কর শীতল হইয়া আসিল এবং তিনি শ্বেতপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া রক্তপরিচ্ছদ ধারণ করিলেন। তাঁহার লোহিত কিরণ-রেখা উদ্যানের চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। উদ্যানের বৃক্ষ লতা পুষ্প পত্র তৃণ সমস্তই রক্তাভায় ঈষৎ রঞ্জিত হইল। হিরণ্ময়ী যে রোয়াকের উপর বসিয়াছিলেন, তাহার পশ্চাদ্ভাগে একটি বকুল বৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষের শাখাপ্রশাখাদি এত বড় যে, সে গুলিতে রোয়াক ছাইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ দুইটা শাখা রোয়াক ডিঙ্গাইয়া চাতালের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। সেই বকুলবৃক্ষের পক্কপত্র ও শিথিলবৃন্ত সুগন্ধ প্রস্ফুটিত কুসুমাবলি বাতাসে আঘাতিত হইয়া ঝুর ঝুর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। জলে, সোপানে, চাতালে ও চাতালের বহিঃস্থ ভূখণ্ডে থাকিয়া থাকিয়া অনেক পত্র ও পুষ্প ঝরিয়া পড়িতেছিল।

পরিশ্রমী সমীরণ অনুগ্রহ করিয়া সেই বকুলবৃক্ষের পুষ্প সৌরভ লইয়া সরোবর-তটকে আমোদিত করিতেছিল।

হিরণ্ময়ী বকুলবৃক্ষের ছায়াবৃত রোয়াকে কিয়ৎক্ষণ উপবিষ্ট থাকিয়া চাতালে নামিলেন। একটি একটি করিয়া অনেকগুলি ভূপতিত বকুলফুল কুড়াইয়া অঞ্চলে বাঁধিলেন। এক এক বার সেই কুসুমাবদ্ধ পুঁটলি নাসিকাগ্রে ধরিয়া ঘ্রাণ লইতে লাগিলেন। এত ফুল কুড়াইয়াও তাঁহার আশা মিটিল না। তিনি আবার কুড়াইতে বসিলেন। দক্ষিণ হস্তে কুড়াইয়া বামহস্তে রাখিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে বামহস্তের আকুঞ্চিত তলভাগ ফুলে পূরিয়া আসিল। সেই ফুলগুলি রোয়াকের উপর রক্ষা করিয়া চাতালের বহির্ভাগে গিয়া আবার ফুল কুড়াইতে লাগিলেন। কুড়াইতে কুড়াইতে একখণ্ড খড়ি দেখিতে পাইলেন। সেই খড়িখানি তুলিয়া লইয়া পুষ্পসংগ্রহ বন্ধ করিলেন। পুনর্ব্বার চাতালের উপর আসিয়া পা ঝুলাইয়া বসিলেন।

কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর তাঁহার মনে একটি ভাবের আবির্ভাব হইল। উহা কি? না, লিখিবার ইচ্ছা। তিনি সেই খড়িখণ্ডে অন্য কিছু লিখিবার পাইলেন না। পাইলেন ধীরেন্দ্রনাথের নাম। ছোট বড় অক্ষরে রোয়াকের উপর লিখিতে লাগিলেন 'ধীর—ধীরেন্—ধীরেন্দ্র—ধীরেন্দ্রনাথ'। এইরূপ লিখিয়া, বৃক্ষ লতা মৎস্য পক্ষী প্রভৃতির কএকটি চিত্র অঙ্কন করিলেন। তথাকার স্থান ফুরাইয়া গেল। হিরণ্ময়ী সরিয়া বসিলেন। সরিয়া সেখানে লিখিলেন 'ধীরেন্দ্রনাথ আমার—ধীরেন্দ্রনাথের আমি হিরণ্ময়ী।' এইরূপে আরও কত কি লিখিয়া লেখা সাঙ্গ করিলেন। অনবরত প্রস্তরের উপর খটিকাখণ্ড ঘর্ষিত হইয়া ক্ষুদ্র হইয়া গেল। হিরণ্ময়ী সেই অবশিষ্ট খণ্ডটুকু ছুড়িয়া পুষ্করিণীর জলে ফেলিয়া দিলেন। টুব্ করিয়া একটি সুমিষ্ট শব্দ হইল।

অনন্তর হিরণ্ময়ী রোয়াকের উপর বসিয়া বসিয়াই উদ্যানের চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলেন। যতদূর তাঁহার দৃষ্টি চলিল, তিনি ততদূরই বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। রোয়াক হইতে কতকটা দূরে রজনীগন্ধের কএকটি কোরক সদ্য প্রস্ফুটিত হইয়াছে দেখিতে পাইলেন। কুসুমলোলুপা হিরণ্ময়ী আর থাকিতে পারিলেন না—সেগুলিকে বৃন্তবিচ্ছিন্ন করিবার জন্য

তাড়াতাড়ি সেই দিকে চলিলেন। যাইবার সময় পথের দুই পার্শ্বে আরও কএক প্রকার ফোটাফুল ছিঁড়িয়া লইলেন। দেখিতে দেখিতে লক্ষ্য স্থানে উপনীত হইলেন। প্রথমতঃ পুষ্প কএকটি না ছিঁড়িয়া, নাসিকা সন্নত করিয়া ঘ্রাণ লইলেন। ঘ্রাণ লইয়া ছিন্ন করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, কিছু দূরে কিরণময়ী আসিতেছেন। তিনি তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আগমন কাল পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিলেন।

অনন্তর কিরণময়ী যেমন কাছাকাছি হইলেন, অমনি হিরণ্ময়ী "বড় দিদি! এই রজনীগন্ধ ফুল ছিঁড়িব?" বলিয়া এক প্রকার মধুর হাসি হাসিলেন। কিরণময়ীও হাসির বিনিময়ে হাসি দিয়া বলিলেন, "দেখিও যেন কুঁড়িশুদ্ধ ভাঙ্গিও না—আস্তে আস্তে ফোটা ফুলগুলি তুলিয়া লও।" কিরণময়ী হাসিয়া এই কথা বলিলেন বটে, কিন্তু এই হাসি মনের নহে—মুখের। হিরণ্ময়ী হাসিলেন—তিনিও হাসিলেন। এরূপ হাসিকে দাঁতের হাসি' বলে। মনের ভিতর রোদনের প্রস্রবণ খুলিয়া গিয়াছে কিন্তু পরের জন্য তাহাকে চাপা দিয়াও হাসিতে হয়। কিন্তু এরূপ হাস্যের জীবনীশক্তি নাই। কিরণময়ীও এইরূপ নির্জ্জীব হাসি হাসিলেন। কিন্তু হিরণ্ময়ী তাহা তলাইয়া বুঝিতে পারিলেন না।

অনন্তর হিরণ্ময়ী অগ্রজা ভগিনীর পরামর্শানুসারে আস্তে আস্তে প্রস্ফুটিত কুসুম কএকটি ছিঁড়িয়া লইলেন। সর্ব্বশুদ্ধ চারিটি ফুল—তন্মধ্য হইতে দুইটি কিরণময়ীকে দিলেন, বাকী দুইটি আপনি লইলেন। কিরণময়ী সাদরে কনিষ্ঠাভগিনীপ্রদত্ত পুষ্পোপহার গ্রহণ করিলেন। গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "হ্যা দেখ, হিরণ! এখানে আসিবার সময় ঐ ওখানে একখানা ভূপতিত ইষ্টকখণ্ডে আমার বাঁ পায়ে হোঁচট্ লাগিয়াছে—বড় যন্ত্রণা হইতেছে। আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না। চল, পুষ্করিণীর জলে পা ডুবাইয়া বসিয়া থাকি।" এই কএকটি কথা বলিবার সময় কিরণময়ীর মুখমণ্ডলে কষ্টচিহ্ন প্রকাশিত হইল। বাস্তবিক তাঁহার বাম পদে আঘাত লাগিয়াছিল।

হিরণ্ময়ী কিরণময়ীর কথা শুনিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। অবিলম্বে তাঁহার সহিত পুষ্করিণীর পশ্চিম দিকের ঘাটে গেলেন। উভয়ে

এক সঙ্গে সোপানাবলি অতিক্রম করিয়া জলের নিকট উপনীত হইলেন। কিরণময়ী সোপানের উপর চাপ্টালি হইয়া বসিয়া, দক্ষিণ পদ বাম উরুর উপর রক্ষা করিয়া, বাম পদের অগ্রভাগ জলে ডুবাইয়া দিলেন। হিরণ্ময়ী তাঁহার বাম দিকে উবু হইয়া বসিয়া জলমধ্যে দক্ষিণ হস্ত প্রবেশ করাইয়া, ধীরে ধীরে আঘাতিত স্থল স্পর্শ করিতে লাগিলেন। কিরণময়ী সেই কোমলস্পর্শনে আরাম লাভ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল এইরূপে অতিবাহিত হইয়া গেল। অনন্তর দুইটি জীবন্ত প্রতিমা তথা হইতে উপরে উঠিলেন।

কিরণময়ী অগ্রে আর হিরণ্ময়ী পশ্চাতে থাকিয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া কিরণময়ী বলিলেন, "হিরণ! দক্ষিণ ঘাটে বকুলফুল কুড়াই গিয়া চল।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "বড় দিদি! আমি এই কতক্ষণ সেখানে অনেক বকুলফুল কুড়াইয়া রোয়াকের উপর রাখিয়াছি। চল, সেইগুলির অর্দ্ধেক তোমাকে দিব। সেই ফুলগুলিতে সর্ব্বশুদ্ধ চারি ছড়া মালা হইবে।" কিরণময়ী তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন। অনন্তর উভয়ে দক্ষিণ ঘাটে উপনীত হইলেন।

কিরণময়ী উপনীত হইয়াই দেখিলেন, রোয়াকের একস্থানে কতকগুলি বকুলফুল—একস্থানে ফুলমোড়া কলাপাত আর যেখানে সেখানে তরু লতা মীন পক্ষীর চিত্র মিশ্রিত ধীরেন্দ্রনাথের নাম। অন্যগুলি দেখিয়া তাঁহার মনে একরূপ ভাবোদয় হইল, কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথের নামাবলি দেখিয়া আর একপ্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হইল। এ ভাব বড় ভয়ানক ভাব—অনেক দিনের সঞ্চিত আশা পূরণের ভাব—হিরণ্ময়ীর মুখবন্ধের ভাব। ভাবি-অনভিজ্ঞা হিরণ্ময়ী না বুঝিয়া আপনা আপনি ফাঁদে পড়িবার পন্থা প্রস্তুত করিলেন। তিনি এক ভাবিয়া কিরণময়ীকে বকুলফুল দিতে আনিলেন, কিন্তু আর একরূপ ঘটিবার সূত্রপাত হইল। এবং কিরণময়ী এক ভাবিয়া হিরণ্ময়ীর সঞ্চিত বকুলফুল লইতে আসিলেন, কিন্তু আর একরূপ হইয়া দাঁড়াইল। মানবভাগ্যের এক কার্য্যের পরিণাম অনেক সময়ে এইরূপ অন্য কার্য্যের পরিণামে দাঁড়ায়।

এই কার্য্যটির বা ঘটনাটির পরিণাম দাঁড়াইল,—হিরণ্ময়ীর বিপৎপাত আর কিরণময়ীর বিপদনাশ। হিরণ্ময়ী ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু কিরণময়ী পারিলেন।

হিরণ্ময়ী রোয়াকের নিকট দাঁড়াইয়া সঞ্চিত বকুলফুলগুলি দুই ভাগ করিলেন, কিন্তু এক ভাগে বেশী ও অপর ভাগে কম ফুল পড়িল। তিনি তদ্দর্শনে বেশীর ভাগ হইতে কতকগুলি ফুল লইয়া কমের ভাগে দিয়া সমান করিলেন। হিরণ্ময়ী যখন এইরূপ করিতেছিলেন, তখন কিরণময়ী তাহা দেখেন নাই। তিনি দেখিতেছিলেন, খটিকাসঞ্জাত চিত্র ও লিখন এবং মনে মনে পড়িতেছিলেন, "ধীর—ধীরেন্—ধীরেন্দ্র—ধীরেন্দ্রনাথ"। তাহার পর আর এক ধারে পড়িলেন, 'ধীরেন্দ্রনাথ আমার—ধীরেন্দ্রনাথের আমি হিরণ্ময়ী।' শেষ পংক্তি পড়িয়া কিরণময়ী চমৎকৃত হইলেন, ভাবিলেন, "আর যায় কোথা ?"

এ দিকে হিরণ্ময়ী সহাস্য মুখে বিভক্ত বকুল ফুলের এক ভাগ কিরণময়ীকে দিলেন। তিনিও তাহা আদর করিয়া গ্রহণ করিলেন। তার পর হিরণ্ময়ী বলিলেন, "বড় দিদি! তুমি এ ফুলে মালা গাঁথিবে, না অমনি রাখিবে ?"

কিরণময়ী উত্তর করিলেন, "তুমি যাহা করিবে, আমিও তাই করিব।"

হিরণ্ময়ী।—"আমি ঐ অশোক তলায় সূঁচ সুতা রাখিয়া আসিয়াছি। চল, দিদি! ঐ খানে বসিয়া দুই জনে মালা গাঁথিগে। আর দেখ, তোমার পায়ে ব্যথা হইয়াছে, সে জন্য যদি তোমার মালা গাঁথিতে কষ্ট হয়, তা' হ'লে তুমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিও, আমি তোমারও মালা গাঁথিয়া দিব, কেমন ?"

কিরণময়ী এই কথাগুলি শুনিলেন বটে, কিন্তু অমনোযোগের সহিত। এই অমনোযোগিতার কারণ ধীরেন্দ্রনামাবলী। তিনি হিরণ্ময়ীর করে ধীরেন্দ্রনাথের নাম নানা আকারে লিখিত দেখিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন, সুতরাং হিরণ্ময়ীর সমস্ত কথা ভাল করিয়া শুনিতে পাইলেন না। অথচ কথার উত্তর না দেওয়াও ভাল নয় বলিয়া উত্তর দিলেন, "সূতা না থাকে, তবে কদলীত্বকে গাঁথিলেও হইবে। একটু অপেক্ষা কর, যাইতেছি।" এই

বলিয়া মনে মনে আর একবার পড়িলেন, 'ধীরেন্দ্রনাথ আমার—ধীরেন্দ্রনাথের আমি হিরণ্ময়ী।' বুঝিলেন হিরণ্ময়ীও ধীরেন্দ্রনাথের জন্য পাগলিনী। শুধু তিনিই নহেন।

কাজের কথার বাজে উত্তর পাইয়া হিরণ্ময়ী গোলযোগে পড়িলেন। ভাবিলেন, "বড় দিদি কেন এরূপ উল্টা কথা কহিলেন? ইনি কি ভাবিতেছেন?" এই ভাবিয়া তাঁহার নয়নের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, বড় দিদির দৃষ্টিরেখা তাঁহার লিখিত ধীরেন্দ্রনাথের নামাবলীর উপর ইতস্ততঃ ফিরিতেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি মনে মনে চমকাইয়া উঠিলেন। বুঝিতে পারিলেন, নিজের বিপদ নিজে ঘটাইয়াছেন—বড় দিদি জানিতে পারিয়াছেন। আর কালবিলম্ব না করিয়া কিরণময়ীর দৃষ্টি অবরোধ করিবার জন্য তাঁহার পার্শ্বদেশ হইতে সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়াই বলিতে লাগিলেন, "বড় দিদি! সূতা আছে; চল না, শীঘ্র করিয়া মালা গাঁথিগে। আর যে বেলা নাই।" এই কথা ব্যতীত তিনি বাধা দিবার অন্য উপায় পাইলেন না। কিরণময়ীর সম্মুখে লেখা মুছিয়া ফেলিলে আরও বিপদ, সুতরাং চক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাধা দেওয়াই উপযুক্ত মনে করিলেন। কিন্তু সরলা বালিকা বুঝিতে পারিলেন না যে, কিরণময়ী গ্রীবা বক্র করিয়া দেখিতে জানেন। হিরণ্ময়ী আর একটি ফিকির খাটাইয়া বলিলেন, "বড় দিদি! ঐ পূর্ব্ব দিকের পাঁচিলের কাছে আম গাছে আম ধরিয়াছে, ওর নাম কি আম বড় দিদি? চল না, আমাকে গোটা দুই তিন পাড়িয়া দিবে—চল না, বড় দিদি!" কিন্তু এ ফিকিরও খাটিল না। কেমন করিয়া খাটিবে?—কিরণময়ী যে সব বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহার যাহা করিবার ইচ্ছা, এত দিন পরে তাহার গোড়া পাইলেন, তবে কি তিনি এখন আর মালা গাঁথিতে যাইবেন, না—আম পাড়িতে যাইবেন?

কিরণময়ী হিরণ্ময়ীর কথার উত্তর না দিয়া প্রশ্ন করিলেন, "হিরণ্! এ সব কাহার হাতের লেখা?" এই বলিয়া তাঁহার চিবুকে কর স্পর্শ করিলেন। এই প্রশ্ন করিবার সময় কিরণময়ী গ্রীবা সঞ্চালন ও চক্ষুর্ভঙ্গি করিয়াছিলেন। প্রশ্ন করিবার সময় প্রায় সকলেই এইরূপ করিয়া থাকে।

হিরণ্ময়ী কি উত্তর দিবেন, ঠিক্ করিতে পারিলেন না। ক্ষণেক কাল ভাবিয়া বলিলেন, "কেমন করিয়া জানিব?"

কিরণ।—কেমন করিয়া জানিবে কি? আমি কি তোমার হাতের লেখা চিনি না, হিরণ? এ কি,—'ধীরেন্দ্রনাথ আমার—ধীরেন্দ্রনাথের আমি হিরণ্ময়ী'? ইহা কে লিখিল, হিরণ?"

হিরণ্ময়ী আম্‌তা আম্‌তা করিয়া অনন্যোপায় হইয়া স্বীকার করিলেন। বলিলেন, "আমিই লিখিয়াছি, বড় দিদি!" এই কথা কএকটি আস্তে আস্তে বলিলেন। দোষী ব্যক্তি ফাঁদে পড়িয়া দোষ স্বীকার করিবার সময় যে রূপ ভাব প্রকাশ করে এবং যেরূপ ভাবে বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে, হিরণ্ময়ীও ঠিক্ তাহাই করিলেন। এই বাক্যগুলি উচ্চারণ করিতে তাঁহার মনে এক প্রকার কষ্ট হইল।

কিরণময়ী বলিলেন, "কেন লিখিয়াছ?"

হিরণ্ময়ী কিরণময়ীর পদাঙ্গুষ্ঠের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "হাত পাকাইবার জন্য।"

কিরণ।—"কালী নাম দুর্গা নাম প্রভৃতি ছাড়িয়া এই কি তোমার হাত পাকাইবার উপকরণ?"

হিরণ।—"যখন যা' মনে আসে।"

কিরণ।—"আচ্ছা, দিদি! তা' যেন স্বীকার করিলাম। কিন্তু 'ধীরেন্দ্রনাথ আমার—ধীরেন্দ্রনাথের আমি হিরণ্ময়ী' এই পংক্তি লেখাতে কে তোমার হাত পাকাইবার কথায় বিশ্বাস করিবে? যাই হউক, হিরণ! আমি সব বুঝিয়াছি।"

হিরণ্ময়ী মহাসঙ্কটে পড়িলেন। এই কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তিনি কি ছিলেন আর এক্ষণেই বা কি হইলেন! বড় দিদির উপকার করিতে আসিয়া নিজের অনভিজ্ঞতায় নিজের অপকার করিয়া বসিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "কেন আমি এরূপ লিখিলাম? লিখিলাম ত কেন মুছিয়া ফেলিলাম না? বড় দিদি ত এখন জানিতে পারিলেন। কি মনে করিতেছেন? আমি যে ধীরেনকে খুব ভালবাসি, তা এ লেখায় এক প্রকার ধরা পড়িল। আর ত এড়াইবার যো নাই। বড় দিদি পূর্ব্বে কিছুই জানিতে পারেন নাই,—আজ আমার দোষেই সমস্ত জানিতে পারিলেন। আবার বলিতেছেন,—

'সব বুঝিয়াছি'। এখন কি করি?" এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিরণময়ী তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া সহাস্য মুখে বলিলেন, "হিরণ! ধীরেন্দ্রাথের উপর তোমার এত টান কেন? তুমি কি তাঁহাকে বিবাহ করিবে?"

"সে কি, দিদি! কে তোমাকে ও কথা বলিল? কেন তুমি এমন কথা বলিতেছ?" মনের ভাব গোপন করিয়া, যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে হিরণ্ময়ী এই কএকটি কথা উচ্চারণ করিলেন।

কিরণ।—তা' হ'লেই বা;—আমি আজ এখন মাকে এ কথা বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যাহাতে তোমার শুভ বিবাহ হয়, তাই করিয়া দিবার চেষ্টা করিব। কেন তুমি আমাকে এত দিন এ কথা বল নাই?"

হিরণ্ময়ী ভীত হইয়া বলিলেন, "বড় দিদি! তুমি আপনা আপনি বিবাহের কথা পাড়িতেছ। আমি কিছুই জানি না। নাম লিখিলেই কি বিবাহ করিতে হয়? উত্তরপাড়ার হৈমবতী কত লোকের যে নাম লেখে, তা বলিয়া কি সে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে? আমিও যে'কত লোকের নাম লিখি।"

কিরণময়ী হাসিয়া বলিলেন, "সে সকল নাম লিখিবার ধরণ অন্যরূপ, কিন্তু, 'ধীরেন্দ্রনাথ আমার—ধীরেন্দ্রনাথের আমি হিরণ্ময়ী' এরূপ লেখার ধরণ আর একরূপ।"

কথায় কথায় কিরণময়ী এই পংক্তিটি আবৃত্তি করাতে হিরণ্ময়ী ক্রমশই নিজ মত বজায় রাখিতে অকৃতকার্য্য হইলেন। যে কথাটি বলেন, সেইটিই ফাঁসিয়া যায় দেখিয়া তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

কিরণময়ী আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তবে আমি এখন যাই, মাকে তোমার হাত পাকাইবার কথা বলিগে।"

এই কথা শুনিবামাত্র হিরণ্ময়ী অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ও ভীত হইয়া কিরণময়ীর পা দুখানি জড়াইয়া ধরিলেন। বিনীতভাবে বলিলেন, "বড় দিদি! তোমার পায়ে পড়ি। তুমি আমাকে যা করিতে বলিবে, তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি,—আমি তাহাই করিব।"

কিরণময়ী বলিলেন, "শপথ করিয়া বলিতেছ, তাহাই করিবে?"

"হাঁ, বড় দিদি! তাহাই করিব—তোমার শপথ।"

"তুমি ধীরেন্দ্রনাথের গৃহে আমার যে পত্র ও পাদ-ভূষণ পাইয়াছিলে—যাহা আমাকে দেখাইয়া ভয় দেখাইয়াছিলে, সে কথা তুমি মাকে বাবাকে বা বাড়ীর অন্য কোন লোককে বলিবে না বল?"

"তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি, প্রাণান্তেও বলিব না।"

"কালীগঙ্গার দিব্য?"

"কালীগঙ্গার দিব্য।"

"আমার দিব্য?"

"তোমার দিব্য।"

"কখন বলিবে না?"

"কখন বলিব না।"

"কখন বলিবে না?"

"কখন বলিব না।"

"কখন বলিবে না?"

"কখন বলিব না।"

এবার কিরণময়ী নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন, "হিরণ! তুমি কালীগঙ্গার দিব্য, আমার দিব্য আর ত্রিসত্য করিলে; দেখিও যেন ভুলিয়াও ইহার ব্যত্যয় করিও না।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "বড় দিদি! আমি শপথ করিয়া কখন লঙ্ঘন করি নাই—করিবও না, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও।

এ কথা শুনিয়া কিরণময়ী বলিলেন, "হিরণ! তুমিও নিশ্চয় জানিও যে, তুমি আমার এই সকল গুপ্ত কথা প্রকাশ করিলে আমিও তোমার এই সমস্ত কথা সকলকে বলিয়া দিব। কিন্তু ইহাও নিশ্চয় জানিও, তুমি না বলিলে আমিও বলিব না।"

হিরণ্ময়ী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "বড় দিদি আজ আমাকে খুব জব্দ করিয়াছেন। শুধু জব্দ নয়, লজ্জাও দিয়াছেন। যাই হউক, দুই জনের নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দুই জনেরই মনের কথা মনে চাপা থাকিল।"

কিরণময়ীও মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আজ আমি মহেন্দ্র ক্ষণে বাগানে পা বাড়াইয়াছিলাম।—কোন্ দিন হিরণ্ময়ী কাহার নিকট কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিত, আজ আমার সৌভাগ্যক্রমে তাহার মুখবন্ধ হইল। এখন নিশ্চিন্ত হইলাম।" তিনি এই ভাবিয়া হিরণ্ময়ীকে বলিলেন, "হিরণ! আমি পায়ে একটু চূণ হলুদ গরম করিয়া দি গিয়া—না হ'লে রাত্রিতে ব্যথা আরও বাড়িবে।" এই বলিয়া কিরণময়ী হিরণ্ময়ী-প্রদত্ত বকুলফুলগুলি লইয়া আপনার গৃহে চলিয়া গেলেন।

হিরণ্ময়ী আবার রোয়াকের উপর বসিয়া কিয়ৎকাল কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইল। তখন তিনি কদলীপত্র খুলিয়া খোলা ফুল, ফুলের মালা ও ফুলের তোড়া সমস্তই পুষ্করিণীর জলে ভাসাইয়া দিলেন। কি জন্য এত কষ্ট করিয়া সে গুলির সঞ্চয়ন ও গ্রন্থন করিয়াছিলেন, তাহা আর ভাবিলেন না—রাগ করিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন। ফুলগুলি ভাসিতে ভাসিতে কতক পার্শ্ববর্ত্তী তটে সংলগ্ন হইয়া গেল, কতক জলেই ভাসিতে লাগিল।

অনন্তর হিরণ্ময়ী মুখ ভার করিয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় তাঁহার দৃষ্টিরেখা অন্য কোন পদার্থের উপর একবারও আকৃষ্ট হইল না। তিনি কেবল অধোমুখ হইয়া মাটীর দিকে তাকাইতে তাকাইতে চলিয়া গেলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

মনের কথা মনেই রহিল।

হিরণ্ময়ী আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। কিরণময়ীর নিকট যেরূপে অপ্রস্তুত হইয়াছেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণের জন্য সকল ভুলিয়া গেলেন। যাঁহাকে কখন তিলার্দ্ধ কালের জন্যও ভুলেন নাই, এ হেন ধীরেন্দ্রনাথকেও কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত ভুলিয়া গেলেন।

এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার যে চিত্ত-ফলকে নানাবিধ মনোহর বর্ণপূর্ণ তুলিকাবলী আলিম্পিত হইতেছিল, এক্ষণে সেই চিত্ত-ফলকে এই এক অঘটন ঘটনার কালি পড়িয়া অসুন্দর করিয়া তুলিল। কিরূপে সুস্থির হইবেন— কিরূপে মনকে প্রবোধ দিবেন, আর কিরূপেই বা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবেন, তাহার কিছুই কূলকিনারা করিতে পারিলেন না। তাঁহার অন্তর্জগতে মহাবিপ্লব ঘটিল। তাহার ফলস্বরূপ বিষম বিষণ্ণতা আসিয়া তাঁহার সুপ্রসন্ন ও কবিকুলবর্ণনীয় মুখমণ্ডলকে আক্রমণ করিল।

এই অসুস্থকরী অবস্থায় হিরণ্ময়ীর কতক্ষণ কাটিয়া গেল। অনন্তর তিনি মনে মনে ভাবিলেন, আর কাহাকেও নয়, কেবল ধীরেন্দ্রনাথকে এ ঘটনা-বৃত্তান্ত একবার বলিবেন। কিন্তু শপথের ভয় মনে সমুদিত হইল। কাজেই বলিবার বাসনা বিসর্জ্জন দিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার আর একটি সন্দেহ উপস্থিত হইল। সে সন্দেহ কি ?—না, ধীরেন্দ্রনাথকেও এ কথা বলিলে তাঁহার ভবিষ্যতে বিপদ ঘটিবে। সে বিপদ আর কিছুই নয়—কেবল পাছে ধীরেন্দ্র নিজেও বিপদে পড়িবার ভয়ে তাঁহাকে চিরদিনের জন্য বিস্মৃত হইয়া যান। বাস্তবিক তিনি মনে করিতে পারেন যে, যেকালে হিরণ্ময়ীর সহিত তাঁহার এতদূর লুক্কায়িত ভালবাসা কিরণময়ী জানিতে পারিয়াছেন, সেকালে বাড়ীশুদ্ধ লোকে ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিবে, সুতরাং হিরণ্ময়ীর প্রতি তাঁহার এতাদৃশ ভালবাসা প্রদর্শন করা আর ভাল নহে। হিরণ্ময়ীও তাহাই মনে করিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে এই কষ্টকরী ঘটনার কথা বলি বলি করিয়াও বলিতে সাহস পাইলেন না। মনের মানুষকে মনের কথা বলিতে না পাইলে যে দুঃখ হয়, দুঃখিত হিরণ্ময়ীরও তাহাই হইল। এই দুঃখে তিনি আপনার ভাগ্যকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। এইরূপ করিয়া রাত্রি প্রভাত হইল।

পর দিন প্রভাতেও হিরণ্ময়ীর সেই চিন্তা। তিনি এক এক বার শয্যায় শুইয়া পড়িলেন, আবার উঠিয়া বসিলেন, আবার গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিয়া অলিন্দছাদলম্বিত স্তম্ভে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সম্মুখের দেওয়ালে একদৃষ্টে চাহিয়া কি যেন দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই দৃষ্ট স্থানে তুমি আমি কি দেখিব ? না—কেবল পরিষ্কার চূর্ণলেপন। কিন্তু

তিনি সেখানে কি দেখিতে লাগিলেন ?—না এই ঘটনাসঞ্জাত কষ্টোচ্ছ্বাস। তাঁহার দৃষ্টিতে তেমন শ্বেতবর্ণ দেওয়ালও যেন মসিম্রক্ষিত হইয়া গিয়াছে।

তিনি যে স্তম্ভটিতে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইটির মস্তক হইতে একটি কড়ি সম্মুখস্থ দেওয়ালের উপর পর্য্যন্ত লম্বমান্ থাকিয়া ছাদতার বহন করিতেছিল। সেই কড়িটির মধ্যস্থলে একটি লোহার কড়া সংলগ্ন ছিল। সেই কড়াতে একটি লৌহশিক ঝুলিতেছিল। আবার সেই শিকে একটি পিত্তলের দাঁড়—সেই দাঁড়ে একটি চন্দনা পক্ষী। পাখিটি হিরণ্ময়ীর। যখনি হিরণ্ময়ী সেখানে আসেন নাই, তখন চন্দনা চক্ষু দু'টি বুজিয়া, একটি পা গুটাইয়া নিঃশব্দে তাহার পূর্ব্বনিবাস ভাবিতেছিল। কিন্তু যখন হিরণ্ময়ী তথায় উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার পদশব্দে তাহার চক্ষু দু'টি খুলিয়া গেল। সে একবার ঘাড় বাঁকাইয়া তাড়াতাড়ি নীচে চাহিয়া দেখিল। দেখিল জগদীশপ্রসাদের অন্যতম পোষ্য হাঁড়িভাঙ্গা হুলা বিড়াল নহে, তাহার পালিকা মাতা হিরণ্ময়ী। হিরণ্ময়ী তাহাকে বড় ভালবাসিতেন, সুতরাং সেও হিরণ্ময়ীকে বড় চিনিত। যখন হিরণ্ময়ী প্রথমতঃ সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন সে পাদবদ্ধ শৃঙ্খল টানিতে টানিতে এবং পক্কবিম্ববিনিন্দিত চঞ্চুতে দাঁড়ের শিক কামড়াইতে কামড়াইতে উপরে গিয়া বসিল। সেখান হইতে দুই চারি বার ঘাড় নাড়িল, আবার পাদমুষ্টি শিথিল করিয়া নীচে নামিল। নামিবার সময় দাঁড়সংলগ্ন একদিকের বাটীর ফাঁকে তাহার পাদবদ্ধ শৃঙ্খল জড়াইয়া গেল—টান পড়িল। সুতরাং সে চঞ্চুযুগলে উহা ছাড়াইয়া মধ্যস্থলে বসিল। সে এইরূপ করিতে লাগিল, কিন্তু হিরণ্ময়ী এ পর্য্যন্ত তাহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন না। সে তখন অভিমানভরে ঝুলিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা যে, সে অবশেষে এইরূপ করিয়াও হিরণ্ময়ীর আদর লাভ করিবে, কিন্তু উল্টা হইয়া দাঁড়াইল। হিরণ্ময়ী তাহাকে আদর করিলেন না—বরং অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক বিরক্ত স্বরে "চুপ কর্" বলিয়া ধমকাইলেন। চন্দনা কি করে, অগত্যা দাঁড়ে উঠিয়া বসিল। বসিয়া দুইবার "রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ" বলিয়া উঠিল। ঠিক্ এমন সময়ে উহার সুমধুর কণ্ঠে এইরূপ কথা ধ্বনিত হওয়াতে মনে হইল, যেন সে স্নেহকারিণীর নিকট বিনা দোষে ভৎর্সিত ও

অনাদৃত হইয়াই মনের দুঃখে "রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ" বলিয়া আত্মসান্ত্বনা করিল।

হিরণ্ময়ী কি ভাবিয়া তখন তাহাকে দাঁড় সমেত নামাইয়া পুনর্ব্বার নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। চন্দনা আহ্লাদে অষ্ট খণ্ড হইল। হিরণ্ময়ী তাঁহাকে যতগুলি বুলি শিখাইয়াছিলেন, সে এক একটি করিয়া কোনটি অর্দ্ধ ও কোনটি পূর্ণাংশে আওড়াইয়া দিল। হিরণ্ময়ী দুর্ভাবনা ভুলিবার জন্য তাহার গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন। চন্দনা তাঁহার কোমল করস্পর্শ-সুখে পরিতৃপ্ত হইয়া এক একবার চক্ষু নিমীলন ও এক একবার উন্মীলন করিতে লাগিল। এইরূপে কতক্ষণ কাটিয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে হিরণ্ময়ী দুর্ভাবনা ভুলিয়াছিলেন কি না, তাহা বলিতে পারি না।

অনন্তর তিনি চন্দনাকে যথাস্থানে রক্ষা করিয়া কিরণময়ীর কক্ষে গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন, কিরণময়ী তখন সেখানে অনুপস্থিত। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া হিরণ্ময়ী সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। বহির্গত হইয়া ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষে গেলেন। তিনিও তখন সেখানে ছিলেন না। হিরণ্ময়ী তাঁহার আগমন-অপেক্ষায় কতক্ষণ বসিয়া রহিলেন, কিন্তু বাসনা নিষ্ফল হইল। তখন তিনি ধীরেন্দ্রনাথের লিখিবার উপকরণ লইয়া লিখিলেন—'মনের কথা মনেই রহিল'। এই পংক্তিটি লিখিয়া ধীরেন্দ্রনাথের বসিবার চৌকিতে মস্যাধার চাপা দিয়া রাখিলেন। আর বেশীক্ষণ সেখানে থাকিলেন না—আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন।

পাঠক! তুমি মনে করিতে পার যে, হিরণ্ময়ী শপথ করিয়া ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষে এরূপ গর্হিত কার্য্য করিলেন কেন? কিন্তু ইহা ধীরেন্দ্রকে বলিবার জন্য নহে—মনের আবেগের জন্য। ইহা তাহার তাৎকালিক মনের এক প্রকার ভাব।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রিয়বস্তু বিসর্জ্জন।

হিরণ্ময়ী প্রাতঃকালে যখন ধীরেন্দ্রনাথের গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পান নাই, ধীরেন্দ্র তাহার অনেকক্ষণ পূর্ব্বে, এমন কি সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে উক্ত পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার সহিত হিরণ্ময়ীর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি যে স্নান করিতে গিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলে হয় ত হিরণ্ময়ীও সেখানে যাইতেন। কিন্তু জানিতে পারেন নাই বলিয়াই আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

এ দিকে ধীরেন্দ্রনাথ উদ্যানে গিয়া প্রথমত কিয়ৎকাল এদিক ওদিক করিয়া প্রভাত-বায়ু সেবন করিলেন। এই উদ্যানে সে দিন রাত্রিকালে তিনি কিরূপ গোলযোগে পড়িয়াছিলেন, তাহা ভাবিতে ভাবিতে এক একবার আপনা আপনি নীরবে হাসিলেন। কিন্তু হিরণ্ময়ী যদি আজিও বাঁকিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার এই হাসি যে কোথায় থাকিত, এমন স্থান খুঁজিয়া পাওয়াও কঠিন। সেই দিনের সেই অনর্থপাত পরতে পরতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আজ তাঁহাকে আরও যে কি করিত, তাহা কল্পনাতেও আসে না। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথের দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যে পরিণত হইয়াছে,—তিনি মুচ্‌কি হাসি হাসিলেন।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ পরিভ্রমণ করিয়া ধীরেন্দ্রনাথ পুষ্করিণীর দক্ষিণ ঘাটে পদার্পণ করিলেন। চারিটি ঘাটের মধ্যে এই ঘাটটিই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও পরিষ্কার। গোকুল মালীর সম্মার্জ্জনীর সুকোমল ঘর্ষণে ইহার সোপান গুলিতে শৈবাল স্থান পাইত না! স্ত্রীলোকেরা উত্তর ঘাটে এবং পুরুষেরা এই ঘাটে স্নান করিত। ধীরেন্দ্রনাথ কখন নন্দনকাননের রাধাকুণ্ডে কখন এই পুষ্করিণীতে স্নান করিতেন। স্নান জন্য পুষ্করিণীনির্ব্বাচন তাঁহার ইচ্ছাধীন। অদ্য তিনি এই পুষ্করিণীতেই স্নান করিতে আসিয়াছেন।

এক্ষণে সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশে লোহিতরাগে উদিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও তাঁহার রক্তরঞ্জিত কিরণ উদ্যানের মধ্যে বিশেষরূপে প্রবেশ করিতে পারে নাই। না পারিবার কারণ উচ্চ প্রাচীর। কিন্তু বাগানের ভিতর বেশ আলোক হইয়াছে। বৈশাখ মাস বলিয়া গত রাত্রিতে উদ্যানস্থ বৃক্ষলতা-গুলির ফলপুষ্প বিশেষরূপে শিশিরসিক্ত হয় নাই, কিন্তু সতেজ হইয়াছে। এখনও উদ্যানের সমুদয় স্থল শীতল। পাখীগুলি নীড় ছাড়িয়া উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। এক বৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষে বসিয়া সুমধুর শব্দ ছাড়িতেছে। মৃদুমন্দ সমীরণ শীতল হইয়া কুসুমসৌরভ উড়াইতেছে। মনোহর প্রভাত।

ঠিক এমন সময়ে ধীরেন্দ্রনাথ দক্ষিণ ঘাটে উপনীত হইলেন। উপনীত হইয়াই বাম দিকের রোয়াকের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ রোয়াকের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, যেখানে সেখানে খড়িতে লেখা আছে 'ধীব—ধীরেন্—ধীরেন্দ্র—ধীরেন্দ্রনাথ'; তাহারই মধ্যে একস্থলে 'ধীরেন্দ্রনাথ আমার—ধীরেন্দ্রনাথের আমি হিরণ্ময়ী'। ধীরেন্দ্রনাথ শেষের পঁক্তিটি দেখিয়া প্রথমতঃ বিস্মিত, পরে আহ্লাদিত হইলেন। তিনি হিরণ্ময়ীর হস্তাক্ষর চিনিতেন, তাহাতে আবার নীচে লেখা আছে 'হিরণ্ময়ী। কি এক অভূতপূর্ব্ব ভাব আসিয়া তাঁহার মর্ম্মস্থানের অন্তস্তলে প্রবেশ করিল—বিদ্যু-দ্বেগে প্রবেশ করিল। ধীরেন্দ্রনাথ বিভোর! ধীরেন্দ্রনাথ মোহিত! তাঁহার মনে প্রতিনিমেষপাতে কত কি আবির্ভূত, তিরোহিত ও পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইতে লাগিল। লেখাগুলি পুনর্ব্বার আদ্যোপান্ত পড়িলেন। মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিলেন, 'এটি মাছ—এটি গাছ—এটি পাতা—এটি পাখী আর এটি হিরণ্ময়ী।

এইরূপে কিয়ৎকাল কাটিয়া গেল। অনন্তর ধীরেন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি প্রতি পদেই আমার প্রতি হিরণ্ময়ীর আন্তরিক অপূর্ব্ব ভালবাসার পরিচয় পাইতেছি। ভালবাসার পন্থা অসংখ্য—ভাল-বাসার দৃষ্টান্তও অসংখ্য। হিরণ্ময়ী দিন দিন আমার প্রতি এই দুইটির কত-রূপ কার্য্য দেখাইতেছেন। বাস্তবিক হিরণ্ময়ীর কোমল ও সরল হৃদয় আমার দিকেই অনুক্ষণ আনত রহিয়াছে। আহা, এ হৃদয়ের মূল্য নাই—

তুলনা নাই। বিধাতা যে সকল উপকরণে হিরণের স্বর্গীয় হৃদয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সে সকল উপকরণ কি পৃথিবীতে আছে? না—তা' থাকিলে অন্য অন্য হৃদয়ও কেন এত কোমল—এত সরল—এত প্রেমপূর্ণ হয় নাই। আহা, কি সুন্দর লিখন,—'ধীরেন্দ্রনাথ আমার—ধীরেন্দ্রনাথের আমি হিরণ্ময়ী'। এই প্রস্তরের উপর এই খটিকালিখন খুদিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে।"

ধীরেন্দ্রনাথ এইরূপ কত কি ভাবিয়া অনিমেষ নয়নে সেই পংক্তির উপর কতক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তিনি যে স্নান করিতে আসিয়াছেন, তাহা তখন ভুলিয়া গেলেন। ক্রমে ক্রমে আত্মবিস্মৃত হইলেন। সেই অপূর্ব্ব পংক্তিটি ভিন্ন তাঁহার চক্ষে জগতের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কিয়ৎকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই যেন নব নব রসাস্বাদবিশিষ্ট অমৃত-লহরী তন্মধ্য হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহার তৃষাতুর প্রাণ মন এবং হৃদয়কে জুড়াইতে লাগিল,—কিন্তু তথাপি পরিতৃপ্তির চরম সীমা দেখিতে পাইলেন না। হিরণ্ময়ীর সম্মুখে থাকিয়া সেই পংক্তি দর্শনে যত না সুখী ও বিমোহিত হইতেন, তাঁহার অসাক্ষাতে তদপেক্ষা শতগুণে সুখী হইলেন। সেই সুখময়ী পংক্তি তাঁহার হৃদয়ের গূঢ়তম বিভাগস্থ লুক্কায়িত ভাবসমূহকে প্রস্ফুটিত করিয়া দিল। ধীরেন্দ্রনাথ অন্তশ্চক্ষে দেখিলেন,তাঁহারই হিরণ্ময়ী!

ধীরেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত যত লেখা দেখিয়াছেন, তাঁহার চক্ষে ইহার সমকক্ষ একটিও হয় নাই। তিনি কালিদাসের শকুন্তলা, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, ঋতুসংহার, বিক্রমোর্ব্বশী, ভবভূতির বীরচরিত, উত্তররামচরিত, মাঘের শিশুপালবধ, শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত, ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয় এবং অন্যান্য কবিদিগের কাব্যকলাপের অনেক রত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে এই রত্নের নিকট তাহাদের মধ্যে একটিও প্রাধান্য লাভ করিতে পারিল না। সে সমুদায় রত্ন পরকীয় কিন্তু এ রত্নটি স্বকীয়। এই জন্যই এ রত্নের এত আদর। পরের রত্ন কে কোথা মন দিয়া আদর করে?

কেবল চক্ষে দেখিয়া আশা মিটিল না বলিয়া, ধীরেন্দ্রনাথ পংক্তিটির উপর বুক চাপিয়া শুইয়া পড়িলেন। কেন শুইলেন?—বুক জুড়াইবার জন্য। বুক জুড়াইল। কিয়ৎক্ষণ পরে উঠিয়া বসিলেন, দেখিলেন, বুকে উল্টা অক্ষরে 'আমার—ধীরেন্দ্রনাথের' অংশটুকু উঠিয়াছে। ধীরেন্দ্রনাথ উহা

দেখিয়া একটু হাসিলেন। হাসিয়া উহার শেষভাগে কথার যোগ করিলেন 'বুক' অর্থাৎ 'আমার—ধীরেন্দ্রনাথের বুক'। যদি খড়ি পাইতেন, তবে লিখিতেন, কিন্তু তদভাবে কেবল প্রণয়পূর্ণ বচনেই ইহা সম্পন্ন করিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ একবার রোয়াকের লেখা আর একবার নিজ বক্ষের লেখা দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ দেখিলেন।

ক্রমে ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিল, আর তিনি নয়ন ভরিয়া দেখিতে পাইবার আশাকে অন্তঃকরণে স্থান দিতে পারিলেন না। অগত্যা গাত্রোত্থান করিয়া দুই এক সোপান অবতরণ করিলেন। কিন্তু কি ভাবিয়া আবার তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বস্থানে আসিলেন। আসিয়া মনে মনে বলিলেন, "হিরণ্ময়ি! তুমি সরলা, ভবিষ্যতের কিছুই বুঝিতে পার না; তাই তুমি তোমার মনের কথা এখানে লিখিয়া মুছিয়া ফেলিতে ভুলিয়া গিয়াছ। কেহ ইহা দেখিলে কি মনে করিবে, তাহা তুমি লিখিবার সময় জানিতে পার নাই বলিয়াই মুছিতে ভুলিয়া গিয়াছ। এরূপ প্রকাশ্য স্থলে এরূপ গূঢ়তম কথা বজায় রাখিয়া যাওয়া সরলা বালিকা ভিন্ন অপর কাহারই সাজে না, এই জন্যই ইহা মুছিয়া ফেল নাই। তা' ভালই করিয়াছ। মুছিয়া ফেলিলে তোমার ধীরেন্দ্রনাথ কি আর দেখিতে পাইত 'ধীরেন্দ্রনাথ আমার—ধীরেন্দ্রনাথের আমি হিরণ্ময়ী'। অপরের পক্ষে—অপরের চক্ষে তোমার এই পংক্তি বিষবর্ষণ করিবে, কিন্তু আমার পক্ষে—আমার চক্ষে কি করিবে?—কি করিবে কেন? —কি করিতেছে? না—অমৃতবর্ষণ। এ অমৃতবর্ষণ আমার পক্ষে জীবন-সঞ্জীবন।" এই বলিয়া আবার বলিলেন, "আমায় দায়ে পড়িয়া—ভবিষ্যৎ ভাবিয়া—পরের ভয়ে করিতে হইল

প্রিয় বস্তু বিসর্জ্জন।"

এই বলিয়া তিনি অনিচ্ছায় রোয়াকের চিত্র ও হিরণ্ময়ীর নাম সমেত স্বীয় নামাবলি মুছিয়া ফেলিলেন—প্রথমে হস্তে—শেষে গাত্রমার্জ্জনীতে মুছিয়া ফেলিলেন। পুষ্করিণীর জলে গিয়া গাত্রমার্জ্জনী ডুবাইয়া জল আনিলেন। সেই জল দিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিলেন। একটুও চিহ্ন রহিল না। খড়িধৌত জল ধারাকারে রোয়াক হইতে গড়াইয়া চাতালে পড়িল।

আবার চাতাল হইতে গড়াইয়া এক একটি সোপান অতিক্রম করিয়া পুষ্করিণীর জল পুষ্করিণীতেই পড়িল।

ধীরেন্দ্রনাথ যে ভয়ে প্রিয় বস্তু বিসর্জ্জন দিলেন, সে ভয়ের আর বাকী কি আছে? গত কল্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহা ঘটিয়া গিয়াছে। ধীরেন্দ্রনাথ তাহা কেমন করিয়া জানিবেন? তিনি যাহা জানিতে পারিলেন, তাহাই করিলেন।

অনন্তর ধীরেন্দ্রনাথ পুষ্করিণীর শীতল জলে স্নান করিয়া স্বকক্ষে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময়েও গামোছা নিঙ্‌ড়াইয়া সেই স্থানে জল ঢালিয়া গেলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

'যাহারে ডরাও তুমি, সেই দেবী আমি।'

ধীরেন্দ্রনাথ আপন কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। এক জন ভৃত্য আসিয়া তাঁহার পদপ্রক্ষালন করিয়া দিল, হস্তে একখানি শুষ্ক বস্ত্র অর্পণ করিল। ধীরেন্দ্রনাথ আপনি উহা পরিধান করিলেন। অনন্তর আহ্নিক পূজা সমাপ্ত হইল। সমাপ্ত হইলে, সেই ভৃত্য একখানি রূপার রেকাবী সাজাইয়া কএক প্রকার ফল ও মিষ্টান্ন আনিয়া দিল। ধীরেন্দ্রনাথ তন্মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ভৃত্য একটি রূপার ঘটি ভরিয়া জল ও একটি ক্ষুদ্র রেকাবী করিয়া তুইটি তাম্বুল আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রক্ষা করিল। অনন্তর সে ধীরেন্দ্রনাথের পরিত্যক্ত সিক্তবস্ত্র লইয়া ছাদের উপর চলিয়া গেল।

কক্ষের বহির্ভাগে ধীরেন্দ্রনাথের সিক্তবস্ত্র পরিত্যাগ, শুষ্কবস্ত্র পরিধান ও জলযোগ সমাহিত হইল। তাহার পর তিনি বহির্ভাগ হইতে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। একখাঁনি দর্পণ ও একখানি কঙ্কতিকা লইয়া কেশ পরিষ্কার করিলেন। গাত্রমার্জ্জনীতে হাত মুছিলেন। তাহার পর তিনি

কি লিখিবেন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে যেমন মস্যাধার ও লেখনী লইতে গেলেন, অমনি তাঁহার চক্ষে পড়িল 'মনের কথা মনেই রহিল।'

মস্যাধার সরাইয়া এই লিখনলিখিত পত্রখণ্ড হস্তে উঠাইয়া লইলেন। আর এক বার পড়িলেন—আবার পড়িলেন। হস্তাক্ষর চিনি চিনি করিয়া চিনিবার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধান হইল। অনুসন্ধানের ফল—হিরণ্ময়ীর হস্তাক্ষর—হিরণ্ময়ীরই 'মনের কথা মনেই রহিল।' ধীরেন্দ্রনাথ ভাবিতে লাগিলেন। কি ভাবিতে লাগিলেন?—কত কি। কত কি কি? না—একবার—'হিরণ্ময়ীর হস্তাক্ষর বেস—সুন্দর ছাঁদ'—আবার 'হিরণ্ময়ী কেন এরূপ লিখিলেন?' তাহার পর,—'হিরণ্ময়ীর কি এমন মনের কথা?' আবার—'মনের কথা মনেই রহিল?' এইরূপ কত কি।

এই কত কি ভাবনার শেষ ফল দাঁড়াইল এই;—"হিরণ্ময়ী আমাকে কি বলিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু দেখিতে পান নাই বলিয়াই ইহা লিখিয়া গিয়াছেন।" ধীরেন্দ্রনাথের মন এই কথাগুলি বলিল। ইহাই ধীরেন্দ্রনাথের চরম চিন্তা। তিনি হিরণ্ময়ীর নিকট ইহার প্রকৃত মর্ম্ম জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। তাঁহার দর্শন-অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিয়া অলিন্দের চারি ধার দেখিতে লাগিলেন,—হিরণ্ময়ীর দর্শন পাইলেন না। বাহিরে যাইবার সময় এই লিখিত পত্রখানি তাঁহার হস্তে ছিল।

ধীরেন্দ্রনাথ কিয়ৎকাল অলিন্দে দাঁড়াইয়া, হিরণ্ময়ীর কক্ষের দিকে গমন করিলেন। কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, হিরণ্ময়ী সেখানে নাই। তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে ফিরিলেন। পুনর্ব্বার আপনার কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া সেই লেখাটি পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে বহির্ভাগে চরণভূষণের ন্যায় কিসের শব্দ হইল। উহা ধীরেন্দ্রনাথের কর্ণে প্রবেশ করিল। শয়নাবস্থাতেই গৃহদ্বারের দিকে গ্রীবা বাঁকাইয়া চাহিয়া রহিলেন। এরূপ করিয়া থাকিবার ভাব এই, কে সেই স্থান দিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিবেন।

দেখিতে দেখিতে কিরণময়ী তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিয়া একটু হাসিলেন—তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহা পরিশোধ করিলেন। এখানে এরূপ হাস্যের অর্থ অভ্যর্থনা। যতপ্রকার অভ্যর্থনা

আছে, তাহার মধ্যে ইহা উচ্চশ্রেণীর একটি। পাঠক মহাশয়কে বলা বাহুল্য যে, কিরণময়ীকে দেখিয়াই ধীরেন্দ্রনাথ 'মনের কথা মনেই রহিল'কে 'মনের কথা হাতেই রহিল' করিলেন অর্থাৎ মুষ্টিমধ্যে চাপিয়া রাখিলেন। কেন না কিরণময়ী আসিয়াছেন—পাছে দেখিতে পান।

ধীরেন্দ্রনাথ কিরণময়ীকে যথাস্থানে বসিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি বসিলেন না—দাঁড়াইয়াই রহিলেন। দাঁড়াইবার ভাবটি মনোহর;—বাম পদের উপর দক্ষিণ পদের অগ্রভাগ স্থাপিত—কটিদেশ ঈষৎ বক্র—কটি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দেহাংশ বাম দিকে হেলিত—বাম হস্তের সুন্দর অঙ্গুলিগুলি কটি বেষ্টন করিয়া স্থিত—দক্ষিণ হস্তে অঞ্চলের অগ্রভাগ ধৃত—শিরঃস্থ বস্ত্রবেষ্টনের সম্মুখ দিয়া অলকাবলী সুচারু ললাটপট্টে পতিত;—এইরূপ ভাবের শোভাময়ী প্রতিমা ধীরেন্দ্রনাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ এই মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া সুখী হইলেন, আবার বসিতে বলিলেন, কিন্তু কথা থাকিল না।

কিরণময়ী এইরূপে দাঁড়াইয়াই ধীরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "ধীরেন্! তোমার অদৃষ্ট বড় মন্দ!" এই কথাগুলি পরিহাসে পূরিত।

ধীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "কিসে মন্দ, কিরণ?"

"বলিব কি? না—বলিব না।"

"যদি আমার কাছে বলা অসঙ্গত বিবেচনা কর, বলিও না।"

"অসঙ্গত নয়; বলিতে লজ্জা করে।"

"সুতরাং তাও একপ্রকার অসঙ্গত।"

"না—অসঙ্গত নয়,—তবে বলি।" এই বলিয়া কিরণময়ী আপনা আপনি হাসিতে লাগিলেন। এবার হাসি কিছু বাড়াবাড়ি রকমের।

ধীরেন্দ্রনাথও হাসিলেন। কেন হাসিলেন?—কিরণময়ীর ব্যাপার দেখিয়া। কিরণময়ী কেন যে তাঁহার অদৃষ্ট মন্দ বলিলেন, তিনি তখন তাহা ভুলিয়া গেলেন; কেবল হাসিতে লাগিলেন। কিরণময়ীর হাসিতে শব্দ শ্রুত হইল, কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথের নীরব হাসি, অথচ বিকাশ ছিল। এইরূপ দুই জাতীয় হাসি কক্ষশোভা বৃদ্ধি করিল। তাহার পর কিরণময়ী হাসি-ভাঙ্গা কথায় বলিতে লাগিলেন,

"ধীরেন্! তোমার অদৃষ্ট মন্দ এই জন্যে,—কেন তুমি কাল বিকালে পুষ্করিণীর ঘাটে যাও নাই?"

"গেলে কি হইত?"

"তোমার প্রতি তোমার হিরণ্ময়ীর কত ভালবাসা দেখিতে পাইতে।" এই বলিয়া আবার হাসিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার প্রতি হিরণ্ময়ীর ভালবাসা!" এই কএকটি কথা বিস্ময়সহকারে তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইল।

কিরণময়ী পরিহাসচ্ছলে বলিলেন, "আমরি, কিছুই যেন জান না! লুকাইলে কি হইবে? স্পষ্ট করিয়া বলিলেই ত চুকিয়া যায়।"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কি স্পষ্ট করিয়া বলিব, কিরণ?"

"যে কথা অস্পষ্ট করিয়া বলিলে।"

"কি সে কথা?"

"তোমার প্রতি হিরণ্ময়ীর ভালবাসা।"

"কে তোমায় এ কথা বলিল?"

"যে তোমায় ভালবাসে, সেই বলিল।"

"কে সে?"

"এতক্ষণ ধরিয়া যাহার কথা বলিলাম।"

"হিরণ্ময়ী?"

"হাঁ—হাঁ।"

"এ তোমার ভুল—নিশ্চয় ভুল।"

"তবে সে কেন কাল পুষ্করিণীর ঘাটের রোয়াকে তোমার নামের জপমালা সাজাইয়াছিল। রোয়াকে যে একটিও তিল থাকিবার স্থান ছিল না—নাম লিখিতে এক তাল খড়ি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। আমি সব দেখিয়াছি—সব জানিয়াছি। তুমি না না করিলে কি হইবে?—হিরণ্ময়ী আপনিই ধরা দিয়াছে। উঃ, ভিতরে ভিতরে এত! তুমি আবার ভাঁড়াইতে বসিলে!" এবার কিরণময়ীর মুখমণ্ডলে ক্রোধচিহ্ন দেখা দিল।

এই কথাগুলি শুনিয়া ধীরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ

আবার আত্মসংবরণ করিলেন?—পাছে কিরণময়ী বুঝিতে পারেন, সেই ভয়ে। কিন্তু তথাপি তাঁহার মুখমণ্ডলের ভাবান্তর পরিলক্ষিত হইল। তিনি নিরুপায় হইলেন—অস্থির হইলেন। সুতরাং কি করেন, মনোভাবকে ছদ্মবেশে সাজাইয়া বলিলেন,

"হ্যা দেখ, কিরণ! যদি হিরণ্ময়ী এরূপ কোন কিছু লিখিয়া থাকেন, যাহাতে তোমার মনে সন্দেহ আসিয়া বাস করিতে পারে, তুমি নিশ্চয় জানিও, তা' কিছুই নয়। হিরণ্ময়ী বালিকা, কি লিখিতে কি লিখিয়াছে।"

কিরণময়ী তীব্র পরিহাসের সহিত বলিলেন, "সে বালিকা, আর তুমি বালক! কেহই কিছু জান না;—না?"

ধীরেন্দ্রনাথ বিষণ্ণ হইলেন। নিরুপায় হইয়া বলিলেন, "তা তুমি যাহাই মনে কর—আমি আর কি বলিব? নিজে না বুঝিলে কে বুঝাইবে?" এই বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "যা, সব গোল হইয়া গিয়াছে। সব ধরা পড়িয়াছে। ধরা ব'লে ধরা,—কিরণময়ীরই হাতে। আজ কিরণময়ী আমার সম্মুখে

'যাহারে ডরাও তুমি, সেই দেবী আমি।'"

এমন সময় হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সেই দিকে আসিলেন। ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষদ্বারে আসিয়া যেমন প্রবেশ করিবেন, অমনি কিরণময়ীকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। নিমেষকাল থমকিয়া বরাবর সমান চলিয়া গেলেন। এরূপ করিয়া চলিয়া যাইবার অর্থ এই যে, যদি কিরণময়ী তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন, তবে কিছু দোষের কথা মনে করিতে পারিবেন না। কেন না, তিনি যেন ধীরেন্দ্রনাথের নিকট যাইবার জন্য সে দিকে যান নাই, কোন কার্য্যের জন্য এক দিক হইতে আর এক দিকে চলিয়া গেলেন। কিন্তু তথাপি হিরণ্ময়ীর মনের ভিতর ভয় ও চিন্তা আসিয়া বিবাদ করিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী আবার মনে করিলেন, বড় দিদি হয় ত তাঁহাকে একেবারেই দেখিতে পান নাই, কিন্তু বড় দিদি কটাক্ষপাতে সে কাজ সারিয়া লইয়াছেন। ধীরেন্দ্রনাথও হিরণ্ময়ীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। কিরণময়ী আর সে কক্ষে অধিকক্ষণ থাকিলেন না—আপনার

কক্ষে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় কেবল বলিয়া গেলেন, "ধীরেন্! আর বাও কোথা ?"

এই কএকটি কথায় ধীরেন্দ্রনাথের কর্ণে যেন শূল ফুটিল। তিনি একাকী শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের ফর্দ্দ।

এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল। ধীরেন্দ্রনাথ কিরণময়ীব এই সকল ব্যাপার হিরণ্ময়ীকে বলিলেন না। হিরণ্ময়ীও শপথের ভয়ে ধীরেন্দ্রনাথকে কিছু বলেন নাই। কিন্তু শপথ করিয়া কিবণময়ী আর কাহাকেও নয়, কেবল ধীরেন্দ্রনাথকে হিরণ্ময়ীর এই ব্যাপর বলিলেন। তিনি জানিতেন যে, ধীরেন্দ্রনাথকে ইহা না বলিলে অসুবিধা বই সুবিধা নাই। ধীরেন্দ্রনাথ এই ব্যাপার জানিলে হিরণ্ময়ীকে আর তেমন করিয়া ভাল বাসিবেন না—মনে ভয় থাকিবে। তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে মঙ্গলের বিষয়। এই জন্যই তিনি তাঁহার নিকট এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন।

এই এক সপ্তাহের মধ্যে এই তিন জনে আর কি কি ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা জানি না।

সপ্তাহের শেষ রজনী প্রভাত হইল। জগদীশপ্রসাদ প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া বৈঠকখানায় আসিলেন। যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। তিনি কখন্ কি আদেশ করেন, সেই জন্য এক জন বার্ত্তাবহ দ্বারবান্ বৈঠকখানার দ্বারবহির্ভাগে একটি স্তম্ভে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে এরূপ ভাবে দাঁড়াইল যে, জগদীশপ্রসাদ তাহাকে দেখিতে পাইলেন না—সেও তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। কিন্তু প্রশ্নোত্তর আদানপ্রদানের পথরুদ্ধ থাকিল না। সেই বার্ত্তাবহ দ্বারবানের হাতে কোন কাজ ছিল না; কিন্তু মানুষ একেবারে নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে পারে না,—যে কোনরূপেই হউক,

তাহাকে একটি না একটি কার্য্য লইয়া থাকিতে হইবে। সে কার্য্যের পরিণামে কোন ফল উৎপন্ন হউক বা না হউক, কিন্তু উহা সম্পন্ন করা চাই। দ্বারবান্ একাকী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া অলিন্দের উপরিস্থ ছাদের কড়ি বরগা গণিয়া ফেলিল। রাম দুই করিয়া এদিক ওদিকের সমুদয় কড়ি বরগা গণনা করিল, কিন্তু গণনা ঠিক্ হইল না—ভুল হইয়া গেল। তাহার মতে যাহা হইল, তাহাই ঠিক্ গণনা। গণনার সময় সে এক একটি সংখ্যায় এক একটি ঘাড়নাড়া দিয়াছিল। কড়ি বরগার গণনা শেষ হইলে বৈঠকখানার দ্বার গণনা আরম্ভ করিল। এ গণনা ঘাড় নাড়িয়া নয়—অঙ্গুলি নাড়িয়া। রাম দুই করিয়া যেমন চারিটি মাত্র দ্বার গণনা হইয়াছে, এমন সময়ে ভিতর হইতে জগদীশপ্রসাদ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কে ওখানে ?"

"আজ্ঞে করুন্।" বার্ত্তাবহ দ্বারবান্ নিস্ফল গণনা-কার্য্য ছাড়িয়া এই উত্তর দিয়া দ্বারের সম্মুখে আসিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইল। জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "দেওয়ান্‌কে এখানে ডাকিয়া আন।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া বার্ত্তাবহ প্রস্থান করিল।

জগদীশপ্রসাদের দপ্তরখানা বহির্বাটীর সর্ব্বনিম্নতলে। দপ্তরখানার বন্দোবস্ত বড় সুন্দর। অধুনাতন কোন কোন জমীদারের দোষে বা অবহেলায় দপ্তরখানার যেরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে, তাঁহার দপ্তরখানায় তাহা ছিল না। শুদ্ধ ইহা তাঁহার এবং তাঁহার দেওয়ানের গুণে বলিতে হইবে। তাঁহার দপ্তরখানায় প্রধানত দুইটি বিভাগ ছিল। একটি বিভাগে জমীদারী সংক্রান্ত কার্য্য ও অপরটিতে সাংসারিক কার্য্যের হিসাব পত্র লিখিত হইত। কার্য্য অনেক, এই জন্য প্রায় চল্লিশ জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। এক এক জনের হস্তে এক এক প্রকার কার্য্য। কার্য্যদক্ষতা অনুসারে কাহার দশ, কাহার পনর, কাহার কুড়ি, কাহার ত্রিশ, কাহার চল্লিশ, কাহার বা পঞ্চাশ ষাট্ টাকা বেতন। তবে কিনা বেশী মাহিয়ানার লোক পাঁচ ছয় জন, এবং দশ পনের কুড়িরই বেশী। দেওয়ানের বেতন চারি শত টাকা।

দেওয়ান্ মহাশয় বড় উপযুক্ত লোক, নাম হরিহর। তাঁহার বয়ঃক্রম অন্যূন পঞ্চাশ বৎসর। দেহ খানি স্থূল, উদরের অন্তঃস্ফীতি (ভুঁড়ি) কিছু গুরুতর। বক্ষে ও পৃষ্ঠে লোমাবলি প্রত্যহ স্নানের সময়ে যথোপযুক্ত তৈলজল

পাইয়া অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেওয়ানজী কতকটা খর্ব্বাকারের লোক, সেই জন্য তাঁহার দেহস্থৌল্য তাঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে বিসদৃশ করিয়া তুলিয়াছে। তিনি দাড়ী রাখিতে নারাজ, কিন্তু গোঁফের উপর খুব যত্ন। গোঁফ যোড়াটি ঝামুরে—কাঁচা পাকায় মিশান। তাঁহার মস্তকে অনুচ্চ কেশরাজি, তাহাও কাঁচা পাকায় মিশান। সেই কেশাবলির যথাস্থানে পাঁচ ছয় অঙ্গুলি দীর্ঘ শিখা। তিনি প্রত্যহ আহ্নিক পূজার পর উহার অগ্রভাগে কোন দিন একটি তুলসীপত্র, কোন দিন একটি ক্ষুদ্র পুষ্প বাঁধিয়া রাখেন। নাসিকায় গোপীমৃত্তিকার বড় অঙ্গের তিলক কাটেন। তাঁহার দেহবর্ণ খুব গৌরও নয়, খুব কৃষ্ণও নয়—মাঝামাঝি, কিন্তু তাহাতে কতটা লাবণ্য আছে। জলদোষেই হউক বা বয়সেই হউক, তাঁহার দুই দিকের কসের দুই তিনটি দন্ত চিরকালের জন্য বিদায় লইয়াছে। তিনি সেই তিনটির বিদায়-বিরহে এক এক সময়ে আক্ষেপ করেন, বিশেষত কঠিন খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া। তিনি দন্তচ্যুত হওয়াতে কতকটা শিথিলভাষী হইয়াছেন।

দপ্তরখানার মধ্যস্থলের দেওয়ালের দিকে একখানি স্বতন্ত্র আসনে একটি বৃহৎ তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া তিনি বসিয়া আছেন—অল্পক্ষণ হইল আসিয়া বসিয়া আছেন। এক জন সরকার তাঁহার সম্মুখে বসিয়া জমীদারীসংক্রান্ত কিসের কাগজ পত্র পড়িতেছে। সেই সরকারের দক্ষিণ দিকে বড় বড় চারি পাঁচখানা খাতা। তখনকার খাতা ঠিক এখনকার মত ছিল না। সরকারের দক্ষিণ কর্ণে একটি কলম। সেই কলমের মুখের কালি তখনও কাঁচা ছিল। বোধ হয়, এই কতক্ষণ খাতায় হিসাবের কাটাকাটি করিয়া থাকিবে।

অপরাপর কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কেহ লিখিতেছে, কেহ টাকার ঠিক দিতেছে, কেহ জমীদারীসংক্রান্ত একখানি বড় তালিকায় সূক্ষ্ম হিসাব রাখিবার জন্য লতা লিখিতেছে, কেহ কলম কাটিতেছে, কেহ এক পালা লেখা শেষ করিয়া কলম মুছিতেছে, কেহ কাঁচা লেখার উপর চূণের পুটলির থোপ দিতেছে, কেহ হিসাব পরিষ্কার করিতে গিয়া বিষম গোলযোগে পড়িয়া কপাল কুঞ্চিত ও মুখ বিকৃত করিয়া একপ্রকার সং সাজিয়াছে। আবার তাহারই মধ্যে এক এক জন মহাপুরুষ দেওয়ানজীর দৃষ্টিপথকে চাপা দিয়া

মানুষ, ময়ূর ও রাশিচক্র আঁকিয়া আপনিই চিত্রকার্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখিতেছে। এইরূপে দপ্তরখানার কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু কোন গোল-যোগ নাই—প্রয়োজনীয় দুই একটি কথা ব্যতীত নীরবে কার্য্য চলিতেছে। জগদীশপ্রসাদের সময় বঙ্গদেশে তুলট কাগজেরই বিশেষ প্রচলন ছিল। কি পুঁথি, কি পত্র আর কি খাতা লেখা, প্রায় সকল কার্য্যই এই কাগজে সম্পন্ন হইত।

এই ভরপূর দপ্তরখানায় বার্ত্তাবহ দ্বারবান্ উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া দেওয়ানজী বলিলেন, "সংবাদ কি ?"

"কর্ত্তা মহাশয় আপনাকে ডাক্ছেন।"

"এক্ষণে কোথায় তিনি ?"

"বৈঠকখানায়।"

"একাকী আছেন ?"

"আজ্ঞে॥"

"চল যাইতেছি।" এই বলিয়া হরিহর দেওয়ান গদি হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি অগ্রে অগ্রে চলিলেন, দ্বারবান্ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

কতক্ষণের জন্য দপ্তরখানা হরিহরবিরহিত হইল। আমলাদিগের মুখ ফুটিল। এক এক জনের এক এক পেট কথার যেন স্রোত বহিতে লাগিল; —ক্রমে মহাসাগরের গর্জ্জন! কে কোথা কি ঘটনা দেখিয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। কেহ তাহা শুনিতে লাগিল। কেহ পরিহাসচ্ছলে কাহাকে কুটুম্বিতাসূচক দুই চারিটা মধুমাখা বোল শুনাইয়া দিল, শ্রোতা তৎক্ষণাৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইয়া তাহার উত্তর দিল,—চারি দিকে হাসির ধূম পড়িয়া গেল। বড় বেতনের কর্ম্মচারীরা যে দিকে বসিয়া কার্য্য করিতেছিল, সে দিকে এরূপ ব্যাপার বড় একটা হইল না। সকল আমলাই যে, হরিহরহীন হইয়া এরূপে প্রভুভক্তির পরিচয় দিতে লাগিল, তাহা নহে। কেহ কেহ পূর্ব্বের ন্যায় আপনার কার্য্যও করিতে লাগিল।

এ দিকে হরিহর দেওয়ান মহাশয় বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। জগদীশপ্রসাদকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য ডাকিয়াছেন, মহাশয় ?"

জগদীশপ্রসাদ তাঁহাকে বসিতে বলিয়া বলিলেন, "একখানা ফর্দ্দ করিতে হইবে।"

দেওয়ানজী ধীরে ধীরে উপবেশন করিলেন। পাঠক মহাশয়কে বলিয়া রাখা উচিত যে, হরিহর দেওয়ানজীর বচনপ্রয়োগ সময়ে একটি বাচিক-মুদ্রাদোষ ঘটিয়া থাকে। তিনি কথা কহিবার সময়ে মধ্যে মধ্যে 'ওর নাম কি' শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি উপবিষ্ট হইয়া জগদীশপ্রসাদকে বলিলেন, "ওর নাম কি, কিসের ফর্দ্দ ?"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "ধীরেন্দ্রনাথ ও কিরণময়ীর বিবাহের ফর্দ্দ।"

হরিহর এক খণ্ড কাগজ লইয়া বলিলেন, "তবে, ওর নাম কি, আজ্ঞা করুন।"

জগদীশপ্রসাদ ক্রমে ক্রমে বলিতে লাগিলেন এবং হরিহর একটি একটি করিয়া ফর্দ্দে টুকিতে লাগিলেন।

ফর্দ্দ লেখা শেষ হইল। জগদীশপ্রসাদের পুত্র নাই অথচ তিনি এক জন বিশেষরূপ সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি, সুতরাং কন্যার বিবাহেই পুত্রের বিবাহের ন্যায় বিবাহ-ব্যয়ের ফর্দ্দ প্রস্তুত হইল। বিস্তর টাকার ফর্দ্দ।

ফর্দ্দ লেখা শেষ হইলে, দেওয়ানজী বলিলেন, "তবে, ওর নম কি, চিন্তামণি স্বর্ণকারকে আপনার ফর্দ্দানুযায়ী অলঙ্কার সমুদয় তৈয়ার করিবার জন্য ডাকাইয়া পাঠাই, আর, ওর নাম কি, রাধামোহন কাপড়ওয়ালাকেও ডাকাইয়া, ওর নাম কি, এই সকল কাপড় সরবরাহ করিবার কথা বলিয়া দি। আর, ওর নাম কি, বাকী যে সকল জিনিষের প্রয়োজন, তা', ওর নাম কি, ইহার পর হইলেও হইবে। ওর নাম কি, আজ হইল জ্যৈষ্ঠ মাসের পাঁচই, আর, ওর নাম কি, আষাঢ় মাসের সতেরই আপনি বিবাহের দিন ঠিক্ করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে, ওর নাম কি, সমস্তই প্রস্তুত হইয়া যাইবে।"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "তা হইলেই হইল। অধিক আর বলিব কি, যেন এটি হইল না, সেটি হইল না বলিয়া আমাকে দুঃখিত হইতে না হয়।"

হরিহর বলিলেন, "আজ্ঞে, তা হইতে হইবে না। ওর নাম কি, সময় অনেক আছে। এই সকল প্রস্তুত হইয়া, ওর নাম কি,আরও দিন থাকিবে। তবে, ওর নাম কি, এক্ষণে আমি দপ্তরখানায় যাইতে পারি ?"

জগদীশপ্রসাদ কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা।"

দেওয়ানজী ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বৈঠকখানা ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় এক এক বার ফর্দ্দখানা দেখিতে লাগিলেন। একবার তাঁহার মুখ হইতে এই কথাটি নির্গত হইল, "উঃ, অনেক টাকা।"

জগদীশপ্রসাদও বৈঠকখানা হইতে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

ঠাকুরবাড়ী।

জাহ্নবী দেবী প্রত্যহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানাদি প্রাতঃক্রিয়া সমাধা করিয়া থাকেন। অদ্য সেইরূপ করিয়া ঠাকুরবাড়ীতে গিয়া নিজ হস্তে ঠাকুরপূজার আয়োজন করিয়া দিতেছেন। দুই জন দাসী নিকটে থাকিয়া তাঁহার আদেশানুসারে কত কি যোগাড় করিয়া দিতেছে। জাহ্নবী দেবী একখানি নিরামিষ বঁটি পাতিয়া নিজেই শশা, কলা, আম্র, জামরুল, লিচু, ইক্ষু, কেশুর, পেয়ারা প্রভৃতি নানাবিধ ফল মূল ছাড়াইয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া এক একখানি রৌপ্যপাত্রে সাজাইয়া রাখিতেছেন। কখন বা বিচিত্র কর্ত্তনকর্ত্তিত কদলীপত্রে ছানা, মাখন, মিশ্রী প্রভৃতি বাহার করিয়া সাজাইতেছেন। দুই জন দাসীর মধ্যে এক জন আতপ তণ্ডুল ধৌত করিয়া রূপার থালায় তুলিতেছে, অপর জন মটর, ছোলা, বরবটী, মুগ প্রভৃতি সিক্ত কলাইগুলি এক একখানি মাটীর খুরিতে সাজাইতেছে। দেখিতে দেখিতে কএকখানি নৈবেদ্যের থালা প্রস্তুত হইল। পার্শ্বে নারিকেল-নাড়ু এবং উপরে গাছমোণ্ডা বসান হইল।

এমন সময়ে মধু মালী নন্দনকানন হইতে বড় বড় দুইটা ঝুড়ী ভরিয়া নানাজাতীয় পুষ্প আনিল। সে যে স্থানে সেই দুইটা ঝুড়ী রক্ষা করিল, সেখানে বড় মনোহর সৌরভ-তরঙ্গ ছুটিয়া উঠিল। ঠাকুর ঠাকুরাণীর নাসারন্ধ্রে সেই সৌরভ প্রবেশের সর্ব্বপ্রথমে মধুর পরে সেই স্থানের লোক জনের নাসিকায় প্রবেশ করিল। মধু মালী সতর্ক হইয়া ধীরে ধীরে ঝুড়ী

হইতে মল্লিকা, মালতী, গন্ধরাজ, যুঁই, রজনীগন্ধ, কৃষ্ণকেলী, কৃষ্ণচূড়া, টগর, অশোক, বড় বড় প্রস্ফুটিত পদ্ম, বেল, বকুল, অপরাজিতা প্রভৃতি পুষ্প ও বাছাই করা তুলসীপত্র দুইখানা সুবিস্তৃত চক্রাকার তাম্রপাত্রে তুলিয়া দিয়া প্রথমে ৺ রাধাকৃষ্ণ, পরে জাহ্নবী দেবীকে প্রণাম করিল। একটা ঝুড়ীর ভিতর আর একটা ঝুড়ী রাখিয়া নন্দনকাননে পুনঃপ্রস্থান করিল। তাহার ঝুড়া দুইটা খালি হইল বটে, কিন্তু তথাপি চেঁচাড়ীর খাঁজে খাঁজে কএকটা ফুলের পাপড়ী আটকাইয়া রহিয়া গেল।

দুইটি দাসীকে লইয়া জগদীশপ্রিয়া পূজার আয়োজন সমাধা করিলেন। কোথায় কি বাকী রহিয়া গেল কি না, তাহা জানিবার জন্য নৈবেদ্যগুলির উপর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। এমন সময়ে জগদীশপ্রসাদ তথায় উপনীত হইলেন। জাহ্নবী দেবী স্বামীকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই একটি রূপার ক্ষুদ্র বাটীতে পুষ্করিণীর জল রাখিয়া দিয়াছিলেন, জগদীশপ্রসাদ নিকটে আগমন করাতে, সেই জল তাঁহার পাদস্পৃষ্ট করিয়া পান করিলেন।

জগদীশপ্রসাদ শ্রীশ্রী৺ রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ যুগলকে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিলেন। পূজারী ঠাকুর তাঁহাকে দেবমূর্ত্তির স্নানজল দিলেন। জগদীশপ্রসাদ দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া ভক্তিভরে পান করিলেন। দক্ষিণ হস্ত প্রথমতঃ মস্তকে মুছিয়া পরে ধুইলেন। তখন পূজারী ঠাকুর একটি দেবার্চ্চিত তুলসীপত্র জগদীশপ্রসাদের হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি তাহা শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ কর্ণের উপর গুঁজিয়া রাখিলেন।

এই সকল দেবভক্তিসূচক কার্য্য হইয়া গেলে, পূজারী ঠাকুর পূজায় বসিলেন। সেই পূজারীর নাম বাসুদেব শর্ম্মা, বয়স ষষ্টি বৎসর গত হইয়াছে। তাঁহার আবয়বিক গঠনপ্রণালী বয়ঃক্রমানুসারে কতকটা শিথিল হইয়াছে। আকার দীর্ঘ, বর্ণ সুন্দর, পট্টবস্ত্র পরিহিত, উত্তরীয়খানি যজ্ঞসূত্রাকারে বামস্কন্ধ হইতে বক্রভাবে লম্বিত হইয়া দক্ষিণ কটির উপর গ্রন্থিবদ্ধ। গলশোভিত যজ্ঞসূত্র গাছটি অতি পরিষ্কৃত। উহা উত্তরীয়ের কোন স্থানে আচ্ছাদিত হইয়াছে, কোন স্থানে হইতে দর্শন দিতেছে। তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীতে একটি শাদা সিধা রূপার অঙ্গুরী। সেই

অঙ্গুরীর একস্থানে একটি ক্ষুদ্র গোলাকার রূপার গুলি। তিনি কখন কখন যজ্ঞসূত্রেও সেই অঙ্গুরী বাঁধিয়া রাখেন। বার্দ্ধক্যবশতঃ তাঁহার ঔদরিক ত্রিবলীরেখা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাসুদেব শর্ম্মার নাসিকা ও চিবুক কিছু দীর্ঘ, কিন্তু চক্ষু দুইটি আবার কিছু ক্ষুদ্র। তাঁহার অষ্টাঙ্গে চন্দন, কপালে দীর্ঘ ফোঁটা।

পূজারী মহাশয় পূজায় বসিলেন। যথাবিধি পূজা শেষ হইল। প্রথম হইতে এখন পর্য্যন্ত ধূপ ধূনার সুগন্ধে ঠাকুর ঘর আমোদিত হইয়া রহিল। পূজার পর আরতি হইয়া গেল। জগদীশপ্রসাদ, জাহ্নবীদেবী ও অন্যান্য সকলে গলবস্ত্র হইয়া ঠাকুরপ্রণাম করিলেন। অনন্তর জগদীশ-প্রসাদ ও জাহ্নবীদেবী স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ওদিকে ঠাকুরের মাধ্যাহ্নিক ভোগের জন্য রন্ধন-শালায় রন্ধনকার্য্য আরম্ভ হইল। শক্তিমূর্ত্তি হইলে আমিষের সংস্রব থাকিত, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের পূজায় তাহা হইবার নহে, সকলই নিরামিষ। ৺ রাধাকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদে নন্দন কানন নানাবিধ তরকারি পাঠাইয়া দিয়াছে। কএকজন দাসী বড় বড় বঁটী লইয়া সেই সকল কুটিতে বসিয়া গেল। দাসীরা হাতে তরকারী এবং দাঁতে কথা কুটিতে লাগিল। কেহ বলিল, "আমর, মধুমালী আজ খালি পোকা বেগুণ গুলো দিয়ে গেছে। 'ছিল ঢেঁকী হ'ল তুল, কাটতে কাটতে নির্ম্মূল'। যেটা তুলি, সেটাই কাণা।" তাহার কথা শুনিয়া গোবিন্দ অধিকারী গোছের একজন দাসী অনুপ্রাসসম্বলিত কবিতা-চ্ছটা দেখাইয়া বলিল, "যেটা তুলি, সেটাই কাণা, মধু মালী বেটাই কাণা।" তাহার কবিত্বশক্তি দেখিয়া দাসী মহলে হাসি পড়িয়া গেল। কেহ আহ্লাদে আটখানা হইয়া, সেই কবিচূড়ামণিকে কাঁকুড়বিচির রাশি, কেহ কাঁচকলার বোঁটা, কেহ লাউয়ের খোলা পুরস্কার দিল। হাসির উপর আবার হাসির ধুম পড়িয়া গেল। এমন সময়ে একটি বিংশতিবর্ষীয়া দাসী হাসিতে হাসিতে অন্যমনস্ক হইয়া বঁটিতে আঙুল কাটিয়া ফেলিল। সে 'উহু' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, আর অমনি সকলে 'আহা' বলিয়া সান্ত্বনা করিল। এইরূপে কএকটা 'উহু' 'আহা' হইবার পর সেই কবিকেশরিণী কিঙ্করী বলিল, "রান্না ঘরে আজ দুজ্জুধনের হরিষে বিষেদ!" অঙ্গুলিকর্ত্তিতা দাসীর

কষ্টে সে মাগীর কিছুই কষ্ট হয় নাই। তাহার মধুর বাক্যে অঙ্গুলিকর্ত্তিতা যুবতী চটিয়া গেল। চটিয়া তাহার কি করিবে?—এক বকুনা জলে কর্ত্তিত অঙ্গুলি ডুবাইয়া রাখিল।

খাটমুণ্ডরে জন কএক জলবাহক ভৃত্য পিত্তলের বড় বড় ঘড়া ভরিয়া রসুই-ঘরে জল আনিতে লাগিল। পাচক ব্রাহ্মণেরা সারি সারি চুল্লী জ্বালিয়া পিত্তলের রন্ধনপাত্রগুলা চড়াইয়া দিল। রন্ধন কার্য্য আরম্ভ হইল। হাতা বেড়ীর সহিত রন্ধন পাত্রগুলার যুদ্ধ বাঁধিল। খটর খটর, ঠন্ ঠন্, ঠক্ ঠক্, ঝন্ ঝনাৎ শব্দে, ঘৃত মসলার গন্ধে এবং কাঁচা কাঠের ধূঁয়ায় রন্ধনশালাস্থ লোকদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় স্ব স্ব কার্য্য বুঝিয়া লইল। দেখিতে দেখিতে ৺ রাধাকৃষ্ণের অন্নভোগ প্রস্তুত হইল। যথা সময়ে ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া চুকিয়া গেল। অতিথিরা উদর পূরিয়া প্রসাদ পাইল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

আনন্দময়ী।

জগদীশপ্রসাদ প্রিয়তমা ভার্য্যা জাহ্নবী দেবীকে বিবাহের কথা সবিস্তার বলিলেন। জাহ্নবী-দেবী শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং আরও কএকটি অলঙ্কারের কথা স্বামীকে বলিলেন। জগদীশপ্রসাদ স্বীকার করিলেন।

দুই তিন দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। ধীরেন্দ্রনাথের সহিত কিরণময়ীর শুভবিবাহের কথা বাড়ীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই জানিতে পারিল। সকলেরই পরতে পরতে আনন্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নূতন দাস দাসীরা পুরাতন দাস দাসীদিগকে বলিতে লাগিল, "তোমরাই মানুষ, তোমাদেরই চাকরী করা সার্থক, কেন না, এই বিয়েতে আমাদের চেয়ে তোমাদেরই পাওনা থওনা বেশী। পুরাণর চেয়ে সকলেরই নূতন ভাল, কেবল চাকর চাকরাণীর বেলাই নয়।"

তাহাদের এই কথা—এই আনন্দে আক্ষেপের কথা শুনিয়া পুরাতন দাস দাসীদের মধ্য হইতে দুই একজন বলিল, "ভয় কি, তোমরাও কর্ত্তা-মহাশয়ের বড় মেয়ের ছেলের বিয়েতে বেশী বেশী পা'বে।"

আমলা মহলেও এই কথা উঠিল। তাহারাও বুঝিতে পারিল, পুরাণ আমলাদের ভাগ্যে ভাল ভাল শাল দোশালা আর নূতন আমলাদের পোড়া কপালে এক এক খানা বনাত—বড় জোর এক এক খানা চিড়িয়াবুটী শাল!

শেষে তাড়া হুড়া হইবে বলিয়া দিন থাকিতেই দেওয়ান্ মহাশয় জিনিষ পত্র খরিদ করিবার জন্য কএকজন বুদ্ধিমান্ আমলাকে নিযুক্ত করিলেন। যাহারা এই কার্য্যে নিযুক্ত হইল, তাহারা একাদশ বৃহস্পতির বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র; কেন না, তাহারা প্রভুকে ঠকাইল না, বরং দশ টাকার জিনিষ খরিদের স্থলে পনর টাকা আর দুই শত টাকার স্থলে দুই শত পঁচিশ বা ত্রিশ টাকা বিবাহের খাতায় খরচ লিখাইয়া দিল! এইরূপ এ দিকেও যত বেশী, ও দিকেও তত বেশী! ধন্য প্রভুভক্তি! এইরূপ সাধুপুরুষ প্রভুভক্তগণ "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ" স্বর্গভোগ করিয়া থাকে!

মহাসমারোহে বিবাহ হইবে, সুতরাং আয়োজনও তদনুসারে হইতে লাগিল। আরও দুই দিন কাটিয়া গেল।

পাঠক! বলিতে পারেন জগদীশপ্রসাদের বাটীর এত লোকের মধ্যে কাহার আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী?—কিরণময়ীর। কিরণময়ী এক্ষণে শুধু কিরণময়ী নহেন,—আনন্দময়ী।

কিরণময়ীর বহুদিনের অসীমযত্নপালিতা আশালতা এত দিন পর্য্যন্ত কেবল বাড়িতেই ছিল—ফলবতী হয় নাই। এক্ষণে তাঁহার পিতামাতার স্নেহ-বারি-সেচনে উহা ফলবতী হইতে চলিল। আজ কাল কিরণময়ীর আনন্দের সহিত, বোধ হয়, জগতের কোন উৎকৃষ্ট পদার্থেরই তুলনা হয় না। বিবাহ যে কি, কিরণময়ী এক্ষণে তাহা বুঝিয়াছেন, স্বামী যে কি, তাহাও জানিয়াছেন, সুতরাং তিনি—আনন্দময়ী।

যে পিতা মাতা পঞ্চম বা ষষ্ঠ বর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দেন, সে বিবাহ সে বালিকা বুঝে না, বুঝেন কেবল সেই পিতা মাতা। আমরা সেরূপ পিতা মাতার বুঝাকে পাপ বলিয়া বিশ্বাস করি। যে যে কার্য্য করে, সে

যদি তাহা না বুঝে, বা যাহাকে দিয়া যে কার্য্য করাণ হয়, তাহারও যদি সে কার্য্যের মর্ম্ম বুঝিতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে কার্য্য কিরূপ কার্য্য? আমাদের বিবেচনায় উহা অকার্য্য। যাহারা জানে না, তাহারা এরূপ কার্য্য করে না, তবে যদি না বুঝিয়াও করে, তাহা হইলে তাঁহারা দোষী নহে, কিন্তু যাহারা জানিয়া শুনিয়া এক জনকে দিয়া এরূপ কার্য্য করায়, তাহারা ভয়ঙ্কর লোক—সেরূপ পিতা মাতা পুত্র কন্যার মিত্র না হইয়া পরম শত্রু বলিয়া গণ্য। কেবল বিবাহ বলিয়া নয়, সকল কার্য্যেরই অগ্রে বুঝা, শেষে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিসঙ্গত। কিরণময়ীর বিবাহসম্বন্ধে তাঁহার মাতা কতকটা দোষী বলিয়া গণ্য হইতেছেন, কিন্তু তাঁহার পিতা দোষী নহেন। তিনি কন্যাকে বুঝিবার সময় পর্য্যন্ত অনূঢ়া রাখিয়া পরম মিত্রের কার্য্যই করিয়াছেন। কিরণময়ীর ইহাই বিবাহ করিবার অবস্থা। তিনি এই অবস্থায় বিবাহের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আজ—আনন্দময়ী।

অকৃত্রিম ভালবাসার ধীরেন্দ্রনাথ এত দিন পরে তাঁহার হৃদয়নাথ হইতে চলিলেন বলিয়াই আজ কিরণময়ী—আনন্দময়ী।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিষাদময়ী।

জগদীশপ্রসাদ ধীরেন্দ্রনাথের করে তাঁহার অগ্রজা কন্যা কিরণময়ীকে অর্পণ করিবেন, এ কথা হিরণ্ময়ীর কর্ণেও প্রবেশ করিতে বাকী থাকিল না। হিরণ্ময়ীর মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—আলোকে অন্ধকার হইল। তিনি অস্থির হইলেন, কিন্তু কি করিবেন, তাহার ঠিক করিতে পারিলেন না।—হিরণ্ময়ী বালিকা, তাই এত দিন আপনার মনে ঠিক দিয়া আসিয়াছিলেন, ধীরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে, কিন্তু এখন্ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ঠিকে ভুল হইল। তাঁহার পিতার ঠিক্ দেওয়াই ঠিক্

হইল। তিনি আরও বুঝিলেন যে, বিবাহ করা তাঁহার ইচ্ছাধীন নহে, পিতার ইচ্ছাধীন। হিরণ্ময়ী নিরাশার অনন্তসাগরে মগ্ন হইলেন।

যে দিন হইতে এই কথা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, সেই দিন হইতে তিনি ভগ্নমনোরথ হইলেন। সেই দিন হইতেই আর আপনার কক্ষের বাহিরে পূর্ব্বের ন্যায় যখন তখন বহির্গত হন না। সর্ব্বদাই কক্ষে থাকিয়া চিন্তা করেন, রোদন করেন, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার সেই চারু ওষ্ঠাধরে আর হাস্যরেখা নাই, মুখমণ্ডলে প্রসন্নতা নাই, শরীরে স্বাস্থ্য নাই এবং মনে সুখ নাই। সেই দিন হইতেই হিরণ্ময়ী—বিষাদময়ী।

অন্য কোন কারণে হিরণ্ময়ীর এরূপ মানসিক ও শারীরিক ভাব-বিপর্য্যয় ঘটিলে, তিনি তাঁহা পিতা মাতা বা অন্য কাহারও নিকট মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেন, কিন্তু এ কথা ত কাহা'কই বলিবার নহে। তবু এক জনকে বলিবার আছে;—তিনি ধীরেন্দ্রনাথ। কিন্তু তাঁহাকে বলিয়াই বা কি হইবে? যাঁহাকে বলিলে ইহার প্রতীকার হইতে পারে, তিনি পিতা, সুতরাং বলিবার নয়। মাতাকে বলিতে পারেন, কিন্তু পিতা আবার তাঁহার নিকট সব শুনিতে পাইবেন, সুতরাং তাঁহাকেও বলিবার নয়।—এই সকল কারণে হিরণ্ময়ী—বিষাদময়ী।

হিরণ্ময়ী পিতাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করেন। এক্ষণে পিতার ইচ্ছাতেই এই কার্য্য সমাধা হইবে—ধীরেন্দ্রনাথের সহিত অগ্রজা ভগ্নী কিরণময়ীর বিবাহ হইবে। সুতরাং তাঁহার অনেক দিনের আশা-লতা সমূলে শুকাইবে। শুকাইবে কেন?—শুকাইল। এই জন্য হিরণ্ময়ী—বিষাদময়ী।

হিরণ্ময়ী মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এত দিন ধরিয়া যাহা ভাবিয়া আসিতেছিলাম, আজ তাহা নিষ্ফল হইল।—আজ আমি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবীশূন্য হইলাম।—ধীরেন্দ্রনাথ আর আমার নহেন, তিনি এক্ষণে আমার অগ্রজা ভগিনীর। বড় দিদি সৌভাগ্যবতী—আমি দুর্ভাগ্যের কিঙ্করী। বুঝিলাম, এক্ষণ হইতে আজীবন আমাকে দুর্দ্দম্য দুর্ভাগ্যের সেবা করিতে হইবে—নয়নের জলে আর উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসে তাহার আরাধনা করিতে হইবে! হায়, বিধাতা আমাকে কাঁদাইবার জন্য—অগাধ দুঃখসাগরে

ডুবাইবার জন্য এই করিলেন! ধীরেন্—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না—কণ্ঠরোধ হইল—অক্ষিযুগল ছল ছল করিতে লাগিল—দেখিতে দেখিতে বিন্দু বিন্দু অশ্রুপতন হইতে লাগিল। হিরণ্ময়ী এক এক বার কি ভাবিতে লাগিলেন, আর তাঁহার প্রফুল্লকমলসদৃশ মুখমণ্ডল গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। কেহ কাছে নাই, থাকিলে এই বিষাদ-প্রতিমা দেখিয়া তাহাকেও কাঁদিতে হইত।

হিরণ্ময়ী অনেক ক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলেন—ভাবিলেন, কিন্তু কিছুতেই মন প্রবোধ মানিল না; বরং উত্তরোত্তর দুঃখোচ্ছ্বাস আরও বাড়িয়া উঠিল। চিন্তার উপর চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে এরূপ অবসন্ন করিল যে, তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না—পর্য্যঙ্কোপরে শুইয়া পড়িলেন। দরদরিত অশ্রুধারায় উপাধান ভিজিয়া গেল।

পাঠক, তুমি হয় ত বলিবে যে, হিরণ্ময়ী বিবাহের জন্য এত উতলা কেন? স্ত্রীলোক হইয়া এরূপ করা কি ভাল? তোমার এ প্রশ্নের উত্তর এই,—পুরুষের বেলা যদি এরূপ করিলে দোষ না হয়, তবে স্ত্রীলোকের বেলা কেন হইবে? বিবাহের ইচ্ছায়—বিবাহের সুখে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার। সেই ইচ্ছায় বা সুখে যাহার বাধা লাগে, তাহারই হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়, দশ দিক শূন্য হয় এবং জীবনধারণে অত্যন্ত কষ্ট হয়, এই জন্যই আজ হিরণ্ময়ী—বিষাদময়ী।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ধীরেন্দ্রনাথ।

কিরণময়ী আহ্লাদে ও হিরণ্ময়ী বিষাদে প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে আর একজন দুঃখের ভাগী উপস্থিত। ইনি ধীরেন্দ্রনাথ। জগদীশপ্রসাদের নির্ঘাত বাক্য ইহাঁকেও অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। ইহাঁর জন্য হিরণ্ময়ী যেরূপ উৎকণ্ঠিতা, ইনিও তাঁহার জন্য সেইরূপ উৎকণ্ঠিত।

এই দুই জনের হৃদয়, প্রাণ, মন সকলই সমবস্থ হইয়াছে। তবে প্রভেদ এই,—হিরণ্ময়ী কাঁদিয়া বক্ষ ভিজাইতেছেন, ইনি তাহা না করিয়া অকূল বিষাদসাগরের পরতে পরতে ডুবিতেছেন। কিন্তু দুই জনেরই চিন্তা ও দুঃখ এক ধাতুর।

ধীরেন্দ্রনাথের বড় আশা ছিল, হিরণ্ময়ীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে। তাহা যদি না হয়, তবে তিনি চিরকাল অবিবাহিত থাকিবেন। জগদীশ-প্রসাদ ধীরেন্দ্রনাথকে তাঁহার কোন কন্যা প্রদান করিবেন কি না, তাহা তিনি জানিতেন না। তথাপি আপন ইচ্ছায় ঠিক করিয়াছিলেন যে, যদি তিনি কন্যা দান করেন, তবে হিরণ্ময়ীকেই করিবেন। ধীরেন্দ্রনাথের এরূপ বিসদৃশ আশা কেবল ভালবাসার কল্পিত ফল ব্যতীত কাজের নহে, এক্ষণে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। এক্ষণে তিনি বুঝিলেন, তাঁহার আত্মপোষিত আশা আশাই নহে। জগদীশপ্রসাদ যাহা করিবেন, তাহাই হইবে, সুতরাং তাঁহার আশাই আশা।

ধীরেন্দ্রনাথের হিরণ্ময়ী প্রণয়-মোহিত অন্তঃকরণ কোনমতেই কিরণময়ীর দিকে নমিত হইল না, এই জন্য তিনি আজি এত অস্থির। কিরণময়ীকে তাঁহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা পূর্ব্ব হইতেই ছিল না, কিন্তু জগদীশপ্রসাদের অভিপ্রায় মতে কার্য্য না করিলে ভাল দেখায় না, কেন না জগদীশপ্রসাদ তাঁহার বিপদের পরিত্রাতা, ক্ষুধাতৃষ্ণায় অন্নজলদাতা এবং স্নেহে পিতা। তবে কি করিয়া তিনি এরূপ পরমহিতৈষীর বাক্য লঙ্ঘন করিতে পারেন? কিন্তু এ দিকে আবার তাঁহার কিরণময়ীকে বিবাহ করিবার একেবারেই ইচ্ছা নাই। তিনি উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। কিছু উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। মনে মনে নানাপ্রকার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সমস্তই বিফল হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে ধীরেন্দ্রনাথ হতাশ। তাঁহার অন্তর্জগতে বিপ্লব উপস্থিত হইল। সে বিপ্লব যে কি, তাহা আর পাঠক মহাশয়কে বলিয়া দিতে হইবে না।

দিবা অবসান হইল। অন্ধকার লইয়া সন্ধ্যা আসিল। সন্ধ্যার সেই অন্ধকার কেবল জড়প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিল না,—ধীরেন্দ্রনাথের হৃদয়, মন ও প্রাণকেও আচ্ছন্ন করিল। ধীরেন্দ্রনাথের অন্তরে বাহিরে নিবিড় অন্ধকার।

তিনি এই ঘোরতর অন্ধকারে ডুবিয়া যেন হিরণ্ময়ীকে আর দেখিতে পাইলেন না। দেখিতে পাইলেন, জগদীশপ্রসাদ কিরণময়ীকে লইয়া তাঁহার নিকট সমুপস্থিত। গভীর অন্ধকারের ভিতর এই দৃশ্য। ধীরেন্দ্রনাথ ইহা দেখিয়া চঞ্চল হইলেন, ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। বাড়ীতে আর থাকিতে পারিলেন না। সাঁ করিয়া বহির্গত হইলেন।

বহির্গত হইয়া কোথায় গেলেন ?—প্রিয়মাধবের নিকট। পথেই প্রিয়মাধবের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। প্রথমে উভয়ে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া দুই চারিটি কথা কহিলেন। তাহার পর কহিতে কহিতে যাইতে লাগিলেন।

প্রিয়মাধব বলিলেন, "ধীর ! তুমি দিন দিন এত বিষণ্ণ হইতেছ কেন ? অন্য দিন অপেক্ষা আজ আরও বেশী দেখিতেছি।"

ধীরেন্দ্রনাথ বিষাদিত চিত্তে ধীরে ধীরে কহিলেন, "তোমার চেষ্টা বিফল হইল আর আমার আশা ভরসাও পুড়িয়া গেল।"

প্রিয়মাধব ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "কেন ?"

"কর্ত্তামহাশয় কিরণময়ীর সহিত আমার বিবাহ দিবেন।"

"কি করিয়া জানিলে ?"

"সকলই প্রস্তুত। আগামী আষাঢ় মাসে বিবাহ।

এই কথা শুনিয়া প্রিয়মাধব উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া চলিতে লাগিলেন। এক্ষণে ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহার পশ্চাতে। ধীরেন্দ্র অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া চলিতেছিলেন, বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে হুঁছট লাগিল। তিনি প্রিয়মাধবের ভয়ে তজ্জনিত যন্ত্রণা মনে মনেই চাপিয়া রাখিলেন।

প্রিয়মাধব বলিলেন, "ধীর ! তাই ত, কি হইবে ?"

ধীরেন্দ্রনাথ নিরুত্তর।

উভয়ে আরও কতকটা পথ অতিক্রম করিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রিয়মাধবের বাটীর বহির্দ্বার দেখা দিল। উভয়ে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পাঠকমহাশয়কে প্রিয়মাধবের বৈঠকখানার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দুই বন্ধু সেই খানে গমন করিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ বিষণ্ণতার গুরুতর ভারে অগ্রেই বসিয়া পড়িলেন। প্রিয়মাধব বসিলেন না। তিনি ধীরেন্দ্রনাথের

বিষয় ভাবিতে ভাবিতে বৈঠকখানাগৃহের মধ্যে ধীরে ধীরে এদিক ওদিক করিয়া পাদচারণা করিতে লাগিলেন। গৃহমধ্যে দীপাধারে দীপ জ্বলিতেছিল, কিন্তু উহার আলোক বড় সমুজ্জ্বল ছিল না। সেই ক্ষীণালোকে ধীরেন্দ্র একবার চাহিয়া দেখিলেন, প্রিয়মাধবের বদনমণ্ডলে গভীর চিন্তার লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে। তিনি তাহা দেখিয়া আবার মুখ অবনত করিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রিয়মাধব বলিলেন, "ভাই ধীর! কিরণময়ীকে বিবাহ কর। কর্ত্তা মহাশয়কে বলিয়াও যেকালে তাঁহার মত ফিরাইতে পারিলাম না, সেকালে আর ত কোন উপায়ই দেখিতেছি না। তিনি যখন নিজের অভিপ্রায়ে এই কার্য্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তখন তাহার ব্যতিক্রম করিলে কোন শুভ ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা অগ্রে বিবাহিত হইলে কনিষ্ঠার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতেন, কিন্তু তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন বলিয়া আর উপযুক্ত জানিয়াই কিরণময়ীর সহিত তোমার উদ্বাহ-কার্য্য সমাধা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। গৃহে গুণবান্ পাত্র থাকিতে, তাঁহাকে রাখিয়া আবার কোথা হইতে অন্য এক জন সেইরূপ পাত্র আনিবেন। বড় মেয়ের বিবাহ হইয়া গেলে, পরে অন্বেষণ করিয়া অন্য পাত্রের সহিত কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিবেন, তাহাই তাঁহার ইচ্ছা। আর ধরিতে গেলে এইরূপই হইয়া থাকে।"

ধীরেন্দ্রনাথের কর্ণ স্থির হইয়া প্রিয়মাধবের এতগুলি কথা শ্রবণ করিল, কিন্তু রসনা ইহার উত্তরে একটিও কথা উচ্চারণ করিল না। ধীরেন্দ্রনাথ নিরুত্তর।

ধীরেন্দ্রনাথকে এইরূপ থাকিতে দেখিয়া প্রিয়মাধব আবার বলিলেন, "চুপ করিয়া রহিলে যে? আমার কথাগুলি সঙ্গত নয় কি?"

এবার ধীরেন্দ্রনাথ কথা কহিলেন, বলিলেন, "দেখ, ভাই প্রিয়মাধব! তুমি যাহা যাহা বলিলে, তাহার সকলগুলিই সঙ্গত। কিন্তু অনিচ্ছায় বিবাহ করিয়া কে নিজে অসুখী হইতে এবং আর এক জনকে অসুখী করিতে বাসনা করে? কর্ত্তা মহাশয় আমার পরম হিতৈষী। আমি কখন তাঁহার ইচ্ছা বা আদেশের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হই নাই। তাঁহার কথা আমার

শিরোধার্য্য। কিন্তু, ভাই! কখন যাহা হয় নাই -এইবার তাহা হইল।" ধীরেন্দ্রনাথ এই পর্য্যন্ত বলিয়া বাক্য রোধ করিলেন।

প্রিয়মাধব ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "কি হইল?"

"আমি কিরণময়ীকে বিবাহ করিব না।" এই কথা বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইলেন।

প্রিয়মাধব ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সে কি, ধীর! এতে দোষ কি?"

ধীরেন্দ্রনাথ মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "কেন, পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, অনিচ্ছায় বিবাহ করিয়া নিজেও অসুখী হইব না, কিরণময়ীকেও অসুখী করিব না।"

প্রিয়মাধব বলিলেন, "কেন, তুমি মনে করিলেই নিজে সুখী হইতে পার আর কিরণকেও সুখী করিতে পার।"

ধীর।—"তাহা হইলে আজ আমি কেন এমন হইব?—

প্রিয়।—"এরূপ হওয়াও তুমি চেষ্টা করিয়া পরিত্যাগ করিতে পার।"

ধীর।—"পরিত্যাগ? ক্ষমতার বাহিরে। যেরূপ করিলে আমি হিরণ্ময়ীকে ভুলিয়া গিয়া কিরণময়ীকে বিবাহ করিতে পারি, আজিও তাহা আমাতে বর্ত্তে নাই।"

প্রিয়।—"তুমি নিতান্ত বালক হইলে দেখিতেছি। কর্ত্তার কথামত কাজ কর, ভাল হইবে।"

ধীর।—"অন্যের বিবেচনায় ভাল বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু আমার নহে।"

প্রিয়।—"কর্ত্তা মহাশয়ের কথা কি উল্লঙ্ঘন করিতে আছে?"

ধীরেন্দ্রনাথ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "তা' নাই, তা' করিও নাই,। কিন্তু —কিন্তু এবার করিলাম, এই অপরাধে আমি কর্ত্তা মহাশয়ের নিকট মহা অপরাধী।"

প্রিয়মাধব দেখিলেন, ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহার একটিও কথা রাখিতেছেন না, তজ্জন্য অতিশয় দুঃখিত হইলেন। এবার তিনি ধীরেন্দ্রনাথের নিকট উপবেশন করিলেন। চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহার দিকে একটিবারও চাহিলেন না—অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

এবার প্রিয়মাধব যেন হতাশ হইয়া বলিলেন, "তবে তুমি, ধীর! কি করিবে?"

ধীরেন্দ্রনাথ সদুঃখে বলিলেন, "তোমাকে আর দেখিতে পাইব না।"

প্রিয়মাধব বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "কেন দেখিতে পাইবে না!"

ধীর।—"আমি মধুপুর পরিত্যাগ করিয়া যাইব।"

প্রিয়মাধবের বিস্ময় অধিকতর বৃদ্ধি হইল, মনে দুঃখ হইল। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তুমি পাগল। কেন এমন আশা করিতেছ? কেনই বা এই যৎসামান্য মনোভঙ্গের কারণকে অসামান্য বলিয়া আকুল হইতেছ? কেন মধুপুর ত্যাগ করিবে?"

ধীরেন্দ্রনাথ অতিশয় কষ্টের সহিত বলিলেন, "নতুবা আমার আর অন্য উপায় নাই। এখানে থাকিলে আমায় ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করিতে হইবে। ভাই প্রিয়মাধব! আমি তাহা পারিব না। একাকী আমিই কেন? কেহই ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করিতে পারে না। যদি করে, তবে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হয়। যেরূপ করিলে আমাকে আর বেশী কষ্ট ভুগিতে হইবে না, আমি তাহাই করিব।—মধুপুর ত্যাগ করিব।"

প্রিয়মাধব দেখিলেন, ধীরেন্দ্রনাথকে ফিরাইবার আর আশা ভরসা নাই। তিনি তাঁহার চিত্তোদ্বেগের শান্তি বিধান করিবার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তথাপি বলিলেন, "বিবাহের এখনও বিলম্ব আছে, অতএব তুমি আরও কিছু দিন স্থির হইয়া থাক। আমি আবার চেষ্টা করিব। তবে নিতান্তই যদি কর্ত্তা মহাশয়ের মন ফিরাইতে না পারি, তবে তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিও। এক্ষণে ভাবিও না—কোথাও চলিয়া যাইবার ইচ্ছা করিও না।"

ধীরেন্দ্রনাথ সম্মত হইলেন। অনন্তর প্রিয়মাধবের নিকট বিদায় লইয়া আপনার গৃহে প্রস্থান করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গদাধর উপাধ্যায়।

গদাধর উপাধ্যায় স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক—বিশিষ্টরূপ পণ্ডিত। মধুপুরে তাঁহার ন্যায় আর একটিও পণ্ডিত পাওয়া যাইত না। মধুপুরের সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মানপ্রদর্শন করিত। লৌকিক ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রত্যহ মধুপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের লোকেরা তাঁহার নিকট বিধান লইতে আসিত।

গদাধর উপাধ্যায়ের একটি বড় গোছের চতুষ্পাঠী ছিল। ছাত্রসংখ্যাও অনেক। তিনি সকলকেই স্মৃতিশাস্ত্রের শিক্ষা দিতেন। ছাত্রেরা তাঁহার নিকট অন্নবস্ত্রের সহিত স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। তন্মধ্যে কএকটি ছাত্র তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিল। তিনি কোন স্থানে সামাজিক বিদায় পাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইলে, সেই কএক জনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন।

উপাধ্যায় মহাশয় অশীতি বর্ষের বৃদ্ধ। তাঁহার দেহ যদিও স্থূল, কিন্তু অত্যন্ত শিথিল। তিনি বৃদ্ধ বয়সের পরমসখী একগাছি যষ্টির সহায়তা লইয়া ধীরে ধীরে গমনাগমন করিতেন। তাঁহার ভ্রূপর্য্যন্ত পাকিয়া গিয়াছিল। তিনি বার্দ্ধক্যবশতঃ অধ্যাপনাকার্য্যে আর বড় পরিশ্রম করিতে পারিতেন না। প্রধান ছাত্রেরাই নিম্নস্থ ছাত্রগণকে শাস্ত্রশিক্ষা দিতেন। তবে যে যে স্থলে কূট বাহির হইত, সেই সেই স্থলে তাঁহার সহায়তার প্রয়োজন হইত।

গদাধর উপাধ্যায় মহাশয়ের চতুষ্পাঠীটি তৃণাচ্ছাদিত একখানি বড় চালা-ঘর। তাহার চতুর্দ্দিকে কোন আবরণ ছিল না, সুতরাং চারি দিক হইতেই তাহার অভ্যন্তর ভাগ দেখা যাইত। সুদৃঢ় সালের ও বাঁশের অনেকগুলি খুঁটির উপর চালাখানির ভর ছিল। বর্ষকালে পাছে চতুষ্পাঠী-চালার ভিতর জল প্রবেশ করে, এইজন্য উহার মেঝে প্রায় দ্বিহস্ত উচ্চ ছিল। উহার উপরে উঠিবার জন্য চারি দিকে চারিটি সোপানমঞ্চ। প্রত্যেকটিতে পাঁচটি করিয়া ধাপ। প্রত্যেক সোপানমঞ্চের দুই দিকে একটি করিয়া দুই দুইটি কামিনী

ফুলের গাছ। কামিনীফুলের গাচ যতদূর বাড়িতে পারে, সেগুলি ততদূরই বাড়িয়াছিল। প্রত্যেক গাছের নীচে আলবাল। সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক ছাত্রেরা কলসী ভরিয়া তাহাতে জল ঢালিত। তাহাদেরই উপরে সেই আটটি কামিনী গাছের জীবন মরণের ভার অর্পিত হইয়াছিল। চতুষ্পাঠীর মেঝের উপর সারি সারি আটখানি তক্তাপোস্। তক্তাপোস্গুলি বড় ও মজ্বুৎ। প্রত্যেকের উপর এক একখানি মাদুর পাতা। কিন্তু যেখানিতে উপাধ্যায় মহাশয় বসিতেন, সেখানির মাদুরের উপর একখানি পশুলোমনির্ম্মিত তক্তাপোস্-সমান আসন পাতা থাকিত।

সেই চতুষ্পাঠীর নিকটেই পশ্চিম দিকে গদাধর উপাধ্যায় মহাশয়ের ইষ্টক নির্ম্মিত বাটী। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোকের বাটী যেরূপ হইয়া থাকে, উহাও সেইরূপ ছিল। সেই বাটীতে উপাধ্যায় মহাশয়ের বৃদ্ধা সহধর্ম্মিণী, একটি বিধবা কন্যা, সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ও তিনি থাকিতেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র বিদেশে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। চতুষ্পাঠীর পূর্ব্ব দিকে একটি ইষ্টকনির্ম্মিত দেওয়ালের উপর তৃণাচ্ছাদিত বাটীর মধ্যে ছাত্রেরা অবস্থান করিত। কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে তাহাদিগের ভোজনকার্য্য সমাধা হইত। গ্রীষ্মকালে কতকগুলি ছাত্র চতুষ্পাঠীর তক্তাপোসের উপর চালাও বিছানা পাতিয়াও শয়ন করিত।

রাত্রি গিয়াছে—প্রভাত আসিয়াছে। ছাত্রেরা আপনাপন পুঁথি লইয়া অধ্যয়নে নিযুক্ত হইয়াছে। প্রধান ছাত্রেরা নিম্নস্থ ছাত্রদিগকে পাঠ ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেছেন। এক এক স্থলের ব্যাখ্যায় ব্যাকরণের নানাপ্রকার সূত্র বিবৃত হইতেছে। বুদ্ধি অনুসারে ছাত্রেরা এক বারে দুই বারে তিন বারে বা ততোঽধিক বারে পাঠমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতেছে। যাহারা প্রথম-শিক্ষার্থী, তাহারা ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করিতেছে, এখনও স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ঘটে নাই। কোন কোন ছাত্র ভ্রমক্রমে পুঁথির পাতা উল্টা পাল্টা করিয়া আবার ঠিক করিতেছে। কেহ বাঁখারির কলম কাটিতেছে। কেহ বা উপাধ্যায় মহাশয়ের পুঁথি নকল করিতেছে। কেহ তুলট কাগজে বড় কড়ি ঘসিয়া পালিস করিতেছে। কেহ মস্যাধারে কালি ঢালিতেছে। কেহ আলতা গুলিতেছে। কেহ বা লিখিতে লিখিতে ভুল লিখিয়া, তাহাতে

হরিতালমণ্ড ঘসিতেছে। এ দিকে উপাধ্যায় মহাশয় আপনার স্থানে উপবিষ্ট হইয়া একখানি সটীক মনুসংহিতার পুঁথি খুলিয়া কিসের ব্যবস্থা লিখিতেছেন। তাঁহার পার্শ্বে পরাশরসংহিতা, বৃহস্পতিসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, হারীত-সংহিতা, যমসংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা, শাতাতপসংহিতা, শঙ্খসংহিতা প্রভৃতি অনেকগুলি পুঁথি রহিয়াছে। সকলগুলিই চন্দনকাষ্ঠের পট্টে আবদ্ধ। জগদীশপ্রসাদ, উপাধ্যায় মহাশয়কে এই সকল চন্দনপট্ট প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। সংহিতাগুলিও তাঁহারই ব্যয়ে নূতন আকারে পুনর্লিখিত হইয়াছে। গদাধর উপাধ্যায় মহাশয় জগদীশপ্রসাদের কুলপুরোহিত।

চতুষ্পাঠীর ভিতর উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এইরূপে অধ্যাপনা ও অধ্যয়নকার্য্য চলিতেছে, এমন সময়ে জগদীশপ্রসাদের একজন দ্বারবান আসিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র প্রদান করিল। তিনি তাহার নিকট হইতে পত্রখানি লইয়া উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন। পাঠক মহাশয় হয় ত এই পত্রখানির ভিতর কি আছে, জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন। পত্রখানির ভিতর ধীরেন্দ্রনাথের সহিত কিরণময়ীর শুভ বিবাহের কথা লিখিত আছে। জগদীশপ্রসাদ এই বিবাহ সম্বন্ধে কি বলিবেন বলিয়া কুলপুরোহিত উপাধ্যায় মহাশয়কে ডাকিয়াছেন। উপাধ্যায় মহাশয়ও পত্র পাঠ করিয়া যজমানগৃহে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

উপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি পাল্কী ছিল। তিনি সেই পাল্কীখানিতে চড়িয়া গন্তব্য স্থলে গমন করিতেন। এক্ষণেও তাহাই হইল। চারি জন পাল্কীবাহক তাঁহাকে পাল্কী করিয়া জগদীশপ্রসাদের বাটী লইয়া চলিল। জগদীশপ্রসাদের দ্বারবান সঙ্গে সঙ্গে চলিল। উপাধ্যায় মহাশয় তথায় গিয়া জগদীশপ্রসাদের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে যে সকল কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন, তাহা এখানে "অলমিতি বিস্তরেণ"।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পীড়া—চিকিৎসা।

আরও কএক দিন গত হইল—বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিল। কিরণময়ীর আনন্দ এবং ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীর দুঃখ বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

হিরণ্ময়ী ভাবিয়া ভাবিয়া এতদূর হতাশ হইলেন যে, তাঁহাকে হিরণ্ময়ী বলিয়া চেনা ভার। মনের সঙ্গে শরীরের যে কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা এক্ষণে হিরণ্ময়ীতে বর্ত্তমান। তাঁহার মন অত্যন্ত বিচলিত ও বিষণ্ণ হওয়াতে, শরীরও তাহাই হইল। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হয়, যেন কোন গুরুতর পীড়া হইয়াছে। মনুষ্যের প্রাণ স্বরূপ আশা বিনষ্ট হইলে, মনুষ্য জীবন্মৃত। হতভাগিনী হিরণ্ময়ীও তাহাই।

হিরণ্ময়ীর এই বিকৃত অবস্থা দেখিয়া জগদীশপ্রসাদ জাহ্নবীদেবী প্রভৃতি চিন্তিত ও ব্যথিত হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, হিরণ্ময়ীর পীড়া হইয়াছে, কিন্তু তিনি যে কি পীড়ায় এতদূর অবসন্ন হইয়াছেন, তাহা কাহারই অনুভূত হইল না। আহা, তাহার মর্ম্মপীড়া কেহই আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিল না। যদি কেহ বুঝিয়া থাকেন, তবে সে ধীরেন্দ্রনাথ।

হিরণ্ময়ী আর নিয়মিতরূপে আহার করেন না—রাত্রিকালে নিদ্রা যান না—কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহেন না। তিনি যেন কি একটি প্রিয় পদার্থ হারাইয়া দুস্তর দুশ্চিন্তা-সাগরের অতল গহ্বরে ডুবিয়া গিয়াছেন। হিরণ্ময়ীর অবস্থা ক্রমে ক্রমে ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইল।

দুই চারি দিন দেখিয়া জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবীদেবী থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা হিরণ্ময়ীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিয়াও রোগ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন না। হিরণ্ময়ীও প্রকৃত রোগের কথা প্রকাশ করিতে পারিলেন না। পিতা মাতা বা অন্য কাহারই নিকট এ রোগের তথ্য প্রকাশ করা অসম্ভব। যাঁহার নিকট করিবেন, হিরণ্ময়ী দেখিলেন, তিনিও তাঁহার ন্যায় পীড়িত। ইহাতেও তিনি অধিকতর অবসন্ন হইলেন।

জগদীশপ্রসাদ আর স্থির হইয়া থাকা ভাল নহে জানিয়া পারিবারিক চিকিৎসককে ডাকাইয়া আনিলেন। সেই চিকিৎসকের নাম সনাতন ধন্বন্তরি। তাঁহার বয়ঃক্রম আটচল্লিশ বৎসর। বর্ণ শ্যাম, গঠন একহারা, বাম চক্ষুটি অন্ধ, দাড়ী গোঁপ নাই, মস্তকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ। তিনি আকারে কিছু লম্বা। চিকিৎসা ব্যবসায়ে পারদর্শী; নাড়ীজ্ঞান বিলক্ষণ। চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থগুলি বিশেষরূপে দেখা আছে। রোগনির্ণয়ে চমৎকার অভিজ্ঞতা। সনাতন ধন্বন্তরি জাতিতে বৈদ্য। তিনি রোগনির্ণয় ও ঔষধপ্রয়োগসম্বন্ধে যেরূপ বিচক্ষণ, সেইরূপ সংস্কৃত ভাষাতেও বিজ্ঞ। তদ্রচিত কএকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থও ছিল।

জগদীশপ্রসাদের আহ্বানে ধন্বন্তরি মহাশয় হিরণ্ময়ীকে দেখিতে আসিলেন। হিরণ্ময়ী শয্যায় শায়িতা। মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় বিছানার এ পাশ ও পাশ করিতেছেন। হাত পা আছড়াইতেছেন। এক একবার যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিতেছেন। আবার কিয়ৎক্ষণ নীরব। পুনর্ব্বার পূর্ব্বভাব। একবার চক্ষু চাহিতেছেন আবার নিমীলিত করিতেছেন—আবার চাহিতেছেন—আবার নিমীলিত করিতেছেন। মর্ম্মের গূঢ়স্থলে অত্যন্ত যন্ত্রণা।

ধন্বন্তরি মহাশয় হিরণ্ময়ীর পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র অথচ পর্য্যঙ্ক-সমান উচ্চ চৌকীতে উপবেশন করিলেন। তাঁহার পার্শ্বে জগদীশপ্রসাদ, জাহ্নবী দেবী ও কিরণময়ী দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। কিরণময়ী বেশী ক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না; পর্য্যঙ্কের অপর পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন। হিরণ্ময়ীর গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

ধন্বন্তরি মহাশয় অনেকক্ষণ ধরিয়া দক্ষিণ করে হিরণ্ময়ীর বাম করের মণিবন্ধ ধারণ করিয়া নাড়ী দেখিলেন। একবার টিপিলেন, আবার ছাড়িলেন—আবার টিপিলেন, আবার ছাড়িলেন। এইরূপ কএক বার করিলেন, কিন্তু রোগনির্ণয় হইল না। কি ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে জাহ্নবী দেবী আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে বলিলেন, "কি দেখিলে, ধন্বন্তরি?"

ধন্বন্তরি মহাশয় বলিলেন, "কই জ্বর জ্বালা ত কিছুই নাই।"

জাহ্নবী।—"তবে কি?"

ধন্বন্তরি মহাশয় জাহ্নবী দেবীর এই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া, হিরণ্ময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার শরীরের ভিতর কিরূপ হইতেছে?"

হিরণ্ময়ী কষ্টপ্রসূতস্বরে বলিলেন, "কি রকম যে হইতেছে, তাহা ঠিক করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।"

জগদীশপ্রসাদ কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন, "তবে কি করিয়া পীড়া ভাল হইবে? তোর্ রোগের কথা তুই না বলিলে কি করিয়া ঔষধ দেওয়া হইবে? লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে নিজেও ভুগিবি আর আমাদিগকেও ভুগাইবি।"

পিতার এই ভর্ৎসনবাক্যে হিরণ্ময়ীর অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। পাশ ফিরিয়া শুইলেন। কিরণময়ী অঞ্চলে তাঁহার অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

জহ্নবী দেবী দুই চারি কথায় জগদীশপ্রসাদকে বকিলেন।

ধন্বন্তরি মহাশয় বলিলেন, "রাত্রিকালে নিদ্রা হয় কিরূপ?"

কিরণময়ী হিরণ্ময়ীর হইয়া বলিলেন, "আজ কএক দিন ধরিয়া আদপেই ঘুম হয় না। সারা রাত্রিই ছট্‌ফট্ করে।"

ধন্বন্তরি বলিলেন, "ক্ষুধা কেমন?"

জাহ্নবী দেবী উত্তর করিলেন, "চারি ভাগের এক ভাগেরও কম।"

এই দুইটি কথা শুনিয়া সনাতন ধন্বন্তরি কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। ভাবিয়া জগদীশপ্রসাদকে বলিলেন, "মহাশয়! পীড়া এমন কিছুই নয়, কিন্তু বায়ুর প্রকোপ বেশী, সেই জন্য শরীর অত্যন্ত গরম হইয়াছে।" এই বলিয়া তিনি গৃহ হইতে আনীত একটি পিত্তলের বাক্স খুলিলেন। খুলিয়া এ মোড়ক সে মোড়ক হাঁট্‌কাইয়া একটি মোড়ক খুলিলেন। সেই মোড়কে যে ঔষধ-বটিকাগুলি ছিল, তাহা ভাল করিয়া দেখিলেন। আবার পূর্ব্ববৎ মোড়ক করিয়া জগদীশপ্রসাদের হস্তে দিয়া কহিলেন, "মহাশয়! প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা এই বটিকার এক একটি ত্রিফলার জলে মাড়িয়া আপনার কনিষ্ঠা কন্যাকে খাওয়াইবেন। পাঁচ সাত দিন খাইলেই পীড়ার উপশম হইবে। আর প্রত্যহ তক্রসিক্ত অন্ন আহার করিতে দিবেন। তাহা হইলে ক্ষুধারও উদ্রেক হইবে এবং রাত্রিকালে নিদ্রারও ব্যাঘাত হইবে না।"

এই বলিয়া সনাতন ধন্বন্তরি জগদীশপ্রসাদকে অভিবাদন করিয়া ঔষধের

যান্ত্র হস্তে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "আমি কল্য প্রাতে আবার দেখিতে আসিব।"

ধন্বন্তরি মহাশয় প্রস্থান করিলে পর জাহ্নবী দেবী ও কিরণময়ী উভয়ে মিলিয়া যথানিয়মে হিরণ্ময়ীকে ঔষধ সেবন করাইলেন। জগদীশপ্রসাদ দাঁড়াইয়া দেখিলেন।

হিরণ্ময়ী পিতামাতার ভয়ে ঔষধ সেবন করিলেন, কিন্তু পীড়ার জন্য নহে। এ ঔষধ যে তাঁহার প্রকৃত পীড়ার কিছুই করিতে পারিবে না, তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলেন। তাঁহাব পীড়ার প্রকৃত ঔষধ ধীরেন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ। কিন্তু সেই ঔষধ না হইলে তাঁহার যে উত্তরোত্তর কি দশা ঘটিবে, তাহাই ভাবিয়া আবার অস্থির হইতে লাগিলেন।—পাঠক! হিরণ্ময়ীর এ কি হইল! বেচারীর আর কূল কিনারা নাই! এমন বিপদেও মানুষে পড়ে! বিশেষতঃ হিরণ্ময়ীর ন্যায় বালিকা!

ঔষধ সেবন সমাপন হইলে জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবী দেবী বাহিরে গেলেন। কেবল কিরণময়ীই কনিষ্ঠা ভগিনীর গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন। যাইবার সময় জাহ্নবী দেবী বলিয়া গেলেন, "কিরণ! দেখ মা, তুমি হিরণকে একাকিনী ফেলিয়া কোথাও যাইও না; আমি আবার এখনই আসিতেছি।"

পাঠক! ঐ দেখুন, হিরণ্ময়ীর কক্ষে শয্যাশায়িনী বিষাদময়ীর পার্শ্বে উপবিষ্টা আনন্দময়ী! কিন্তু আনন্দময়ীও আজ বিষাদময়ীর মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিষাদময়ী।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মনের কথা।

সে দিন ও সে রাত্রি অতিবাহিত হইল, কিন্তু হিরণ্ময়ীর পীড়ার কিছুই হইল না, বরং বৃদ্ধি। প্রাতঃকালে আবার সনাতন ধন্বন্তরি আসিয়া

তাঁহাকে দেখিলেন। অনুপান বদলাইয়া দিলেন। আরও কি একটি ঔষধ দিলেন। অনন্তর চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার প্রস্থানের সময় জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "ধন্বন্তরি! পীড়া বৃদ্ধি হইল কেন?"

ধন্বন্তরি মুখভঙ্গি দ্বারা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ও কিছুই নহে, মহাশয! ঔষধের গুণে প্রথম প্রথম ওরূপ হইয়া থাকে। শীঘ্রই সারিয়া যাইবে।" ধন্বন্তরি মহাশয় প্রস্থান করিলেন।

আবার হিরণ্ময়ীকে ঔষধ সেবন ও যথা সময়ে তক্রমিশ্রিত অন্ন ভোজন করান হইল। কিন্তু হিরণ্ময়ী আহার করিতে পারিলেন না। সে দিন গেল, তাহার পর আরও চারি পাঁচ দিন গত হইল। হিরণ্ময়ী অধিকতর বিষণ্ণা। এই ব্যাপার দেখিয়া জগদীশপ্রসাদ, জাহ্নবী দেবী, কিরণময়ী ও বাড়ীশুদ্ধ লোক অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। কেন যে এমন সুচিকিৎসাতেও পীড়ার প্রতীকার হইতেছে না, এই ভাবনায় সকলেই অস্থির।

হিরণ্ময়ী পীড়িত হইয়া অবধি প্রত্যহ দুই তিন বার করিয়া ধীরেন্দ্রনাথের দর্শন পাইতেন। ধীরেন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতেন, রোগের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, সাবধান হইয়া থাকিতে বলিতেন। অদ্যও তিনি দেখিতে আসিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ যুবাবয়স্ক পুরুষ, তিনি ভগ্নহৃদয় হইয়াও হিরণ্ময়ীর মত প্রকাশ্যরূপে অস্থির হইয়া পড়েন নাই। তিনি অতি সতর্কতার সহিত মনের ভাব লুকাইয়া এ কয় দিন কাটাইতেছেন। কেবল প্রিয়মাধব তাঁহার মনের কথা তাঁহারই মুখে শুনিয়াছেন। যাই হউক্, যদিও ধীরেন্দ্রনাথ মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আকার প্রকারে উহা যেন ধরা পড়িতেছে। কিন্তু অন্যে তাহা তলাইয়া বুঝিতেছে না।

ধীরেন্দ্রনাথ অন্য অন্য দিন যখনই হিরণ্ময়ীকে দেখিতে আসিতেন, তখনই তাঁহার নিকট কিরণময়ীকে দেখিতে পাইতেন। পীড়া সম্বন্ধিনী কথা পাড়িতেন, কিন্তু, বোধ হয়, যেন আরও কি দুই চারি কথা বলি বলি, করিয়া মনেই চাপা দিয়া রাখিতেন, মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেন না। অনেকক্ষণ থাকিয়া ফিরিয়া যাইতেন। হিরণ্ময়ীও কিরণময়ীর ভয়ে, নিকটে পাইয়াও, ধীরেন্দ্রনাথকে মনের কথা মনে মনেই বলিতেন, মুখ ফুটিয়া

বলিতে পারিতেন না। পাঠক! মনে কর দেখি, ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীর এই নির্ব্বাক্ অবস্থার যন্ত্রণা কিরূপ ভয়ঙ্করী!

হিরণ্ময়ী, কিরণময়ী নিকটে আছেন বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে যেমন মনের কথা বলিতে পারিতেন না, সেইরূপ কিরণময়ীও, হিরণ্ময়ী কাছে আছেন বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে মনের কথা খুলিয়া বলিতেন না। যদিও তিনি মনে মনে আনন্দময়ী, তথাপি ধীরেন্দ্রনাথকে চক্ষের নিকট পাইয়াও দুই চারিটি মনের কথা বলিতে না পারিয়া,তাঁহার আনন্দে এক এক বার বিষাদ-রেখা বসিয়া যাইত। কিন্তু তখনি আবার মনে মনে ভাবিতেন, "আর দিন কএক পরে ধীরেন্দ্রনাথ আমার হইবেন। তখন মনের কত কথাই বলিব।"

অদ্য ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীকে দেখিতে আসিয়া কিরণময়ীকে দেখিতে পাইলেন না। ভালই হইল;—মনের কথা বলিবার পন্থা পরিষ্কৃত হইল।

ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীর পর্য্যঙ্কসন্নিহিত একখানি চৌকীর উপর উপবেশন করিয়া কহিলেন, "হিরণ! কেমন আছ?" এই কথা বলিয়া তাঁহার ললাটে করতলস্পর্শ করিলেন। দেখিলেন, ললাট কিছু উষ্ণ।

হিরণ্ময়ী বিষণ্ণমুখে বলিলেন, "মরিলেই বাঁচি। আর সহ্য হয় না। ধীরেন্! আমি আর বাঁচিব না।"এই বলিয়া তিনি ধীরেন্দ্রনাথের ললাটস্পৃষ্ট করের উপর কর স্থাপন করিলেন। নয়ন হইতে অশ্রু বিন্দু ঝরিতে লাগিল।

ধীরেন্দ্রনাথ ব্যথিতচিত্তে উহা মুছিয়া দিলেন। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। উহার শব্দ হিরণ্ময়ীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। হিরণ্ময়ী আরও দুঃখিত হইলেন। কহিলেন, "ধীরেন্! বড় দিদির আশা পূর্ণ হইল। তিনিই জগতে একমাত্র সুখিনী।"

ধীরেন্দ্রনাথ বুঝিয়াও, যেন না বুঝিবার মত বলিলেন, "কেন, হিরণ্!"

হিরণ্ময়ী।—"কেন কি? তুমি ত সকলই জানিয়াছ।"

ধীরেন্দ্রনাথ অকপট মনে কহিলেন, "হিরণ্! তুমিও ত জান।"

হিরণ্ময়ী।—"কি, ধীরেন্?"

ধীর।—"আমার শপথ—আমার প্রতিজ্ঞা।"

হিরণ্ময়ী।—"কি শপথ?—কি প্রতিজ্ঞা?" হিরণ্ময়ী ইহা জানিয়াও, না জানিবার মত বলিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ভুলিয়া গেলে কি? সেই তোমার হস্ত হইতে দেবপ্রসাদিত পুষ্প লইয়া আমার শপথ—আমার প্রতিজ্ঞা—কিরণময়ীকে বিবাহ করিব না।"

হিরণ্ময়ী এবার একটু হাসিলেন। আমরা এই হাসির মর্ম্ম বুঝিলাম না। হাসিয়া বলিলেন, "তুমি পাগল।"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি পাগল নহি, তুমিই পাগল।"

হিরণ্ময়ী কিঞ্চিৎ ব্যস্ততাসহকারে বলিলেন, "কেন কেন, আমি কিসে পাগল?"

ধীরেন্দ্র।—"কারণ, এখনও তুমি আমার প্রতিজ্ঞা ও শপথে বিশ্বাস করিতেছ না।"

এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী লজ্জিত হইলেন, কিয়ৎ ক্ষণ কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন, "তুমি ভুলেও এমন মনে করিও না। আমি আমার নিজের কথা বা কার্য্যকে বরং অবিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথের কথা বা কার্য্যকে ক্ষণকালের জন্যও অবিশ্বাসের অঙ্গস্পৃষ্ট করাইতে পারি না।"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তবে কেন তুমি আমাকে পাগল বলিতেছ?"

হিরণ্ময়ী।—"বলিতেছি এই জন্য, কি করিয়া তুমি আমার পিতার কথা লঙ্ঘন করিবে? তাহা পারিবে না। সুতরাং বড় দিদিকে তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে—ইচ্ছা নাই সত্য, তথাপি দায়ে পড়িয়া বিবাহ করিতে হইবে।"

এই কথা শুনিয়া ধীরেন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কোন উত্তর নাই।

ইহা দেখিয়া সময় পাইয়া আবার হিরণ্ময়ী বলিলেন, "তাই বলিতে-ছিলাম, তুমি পাগল।"

ধীরেন্দ্রনাথ কি ভাবিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "আমি এবার তোমার পিতার কথা রক্ষা করিতে অসমর্থ। পূর্ব্বে একজনের নিকট প্রতিজ্ঞা করি-য়াছি, এক্ষণে কেমন করিয়া উহা লঙ্ঘন করিব? একটি প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া অপরটি পালন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।"

হিরণ্ময়ী কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তবে তুমি কি করিবে, ধীরেন্?"

ধীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিলেন, "চিরকালের জন্য মধুপুর পরিত্যাগ।"

এই কথা শুনিবামাত্র হিরণ্ময়ী চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখখানি আরও শুকাইয়া গেল—নয়ন ছলছল করিতে লাগিল—হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ চক্ষু দুইটি নিমীলিত করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথও তাঁহার তাদৃশ অবস্থা-পরিবর্ত্তন নিরীক্ষণ করিয়া বিষণ্ণ হইলেন। অধোমুখে বসিয়া রহিলেন।

হিরণ্ময়ী এবার অতিশয় কাতর স্বরে বলিলেন, "তবে আমার দশা কি হইবে, ধীরেন্!"

ধীরেন্দ্রনাথ অতিশয় বিষণ্ণচিত্তে বলিলেন, "হিরণ! কি বলিব বল? কি কথায় তোমার এ কথার উত্তর দিব, তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমার বর্ত্তমান অবস্থায় তোমার এ কথার উত্তর নাই।" এই বলিয়া তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এবার ধীরেন্দ্রনাথেরও নয়ন ছল ছল করিয়া উঠিল।

হিরণ্ময়ী তাঁহার মন বুঝিলেন। আরও হতাশ হইলেন। আশা ছিল, কোন সদুপায় হইবে, এক্ষণে তাহাও ঘুচিয়া গেল। তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্ম-স্থলে কি বিঁধিতে লাগিল। আলোকময় গৃহ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। হিরণ্ময়ী পাশ ফিরিয়া শুইলেন। তাঁহার শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল।

তখন ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীর ও আপনার অবস্থা-বিপর্য্যয় দেখিয়া আর অধিক ক্ষণ সেখানে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। পাছে কেহ আসিয়া দেখিতে পায়, এই ভয়ে তিনি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "হিরণ! তুমি ভাবিও না, সুস্থির হও। আমি এক্ষণে আসি, আবার আসিব।" এই বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। হিরণ্ময়ী মস্তক ফিরাইয়া দেখিলেন, ধীরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন। আবার ডাকিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু পাছে কেহ শুনিতে পায়, সেই ভয়ে ডাকি ডাকি করিয়াও ডাকিতে পারিলেন না। নয়ন নিমীলিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পীড়া-প্রতীকার।

হিরণ্ময়ীর সহিত ধীরেন্দ্রনাথের যে সকল কথা হইতেছিল, পার্শ্বের গৃহে থাকিয়া কিরণময়ী তাহার কতক কতক শুনিতে পাইয়াছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ যখন প্রস্থান করিলেন, তাহার কিছুক্ষণ পরে কিরণময়ী হিরণ্ময়ীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিরণময়ীকে দেখিয়া হিরণ্ময়ী আত্মভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিরণময়ী কাছে বসিয়া বলিলেন, "হিরণ! আবার এত বিষণ্ণ হইলে কেন?" হিরণ্ময়ী কাতর স্বরে বলিলেন, "বড় কষ্ট হইতেছে, বড় দিদি!"

এই কথা শুনিয়া কিরণময়ী বলিলেন, "হিরণ্! আমি এতক্ষণে তোমার পীড়া কি, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।"

হিরণ্ময়ী কতকটা বিস্মিত হইলেন। আগ্রহের সহিত বলিলেন, "কি বুঝিয়াছ, বড় দিদি?

কিরণময়ী হিরণ্ময়ীর মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "বলিলে রাগ বা দুঃখ করিবে না বল।"

হিরণ্ময়ী আরও বিস্মিত হইলেন। মনের ভিতর ভাবনা আসিয়া জুটিল। কিন্তু অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়াতে বলিলেন, "কেন রাগ করিব? কেন দুঃখ করিব? তুমি বল বড় দিদি!"

কিরণময়ী বলিলেন, "বাবাই তোমার শত্রু। মাও বড় ছাড়া যান না।"

এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার নয়নযুগল বিস্ফারিত হইল। বলিলেন, "কেন? সে কি কথা? একি বল বড় দিদি?"

"কেন বলি, শুনিবে?" এই বলিয়া কিরণময়ী বলিলেন, "ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে বলিয়া।"

অন্যমনস্ক ব্যক্তির কর্ণে সহসা একটা উৎকট শব্দ প্রবেশ করিলে, সে যেমন হয়, সেইরূপ কিরণময়ীর এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ীর বুক শিহরিয়া

উঠিল, হৃৎপিণ্ডে বেগে শোণিত উথলিতে লাগিল, বস্ত্রাবৃত দেহ-যষ্টি একবার কণ্টকিত হইল। যাঁহার কোমল কণ্ঠোত্থিত সুধাস্রাবী বচন-রসে কর্ণ জুড়াইয়া যায়, এ হেন কিরণময়ীর এই বাক্য হিরণ্ময়ীর কর্ণকুহরকে নির্ঘাত-রূপে আঘাতিত করিল। হিরণ্ময়ী অস্থির, লজ্জিত, শঙ্কিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনোগত ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "না, বড় দিদি! তাহা নয়। ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে, সে ত সুখের কথা, তজ্জন্য পিতা মাতা শত্রু হইবেন কেন?"

এবার কিরণময়ী হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "হিরণ! তুমি আর আমাকে ফাঁকি দিতে পারিবে না। আমি সব জানিতে পারিয়াছি। সত্য করিয়া বল দেখি, ধীরেন্দ্রনাথের সহিত তোমার বিবাহ হইল না বলিয়া, তোমার মন ভাঙ্গিয়াছে কি না? তুমি ভয় বা লজ্জা করিও না—আমাকে তোমার মনের কথা খুলিয়া বলিতে কোন বাধা নাই। আমাকে বল, তোমার কোন অপকার হইবে না।"

হিরণ্ময়ী ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই বলিতে সাহস পাই-লেন না। ভয় ও লজ্জাই তাহার কারণ।

হিরণ্ময়ীকে নিরুত্তর দেখিয়া কিরণময়ী বুঝিলেন, তিনি তাঁহাকে মনের কথা বলিতে সাহস পাইতেছেন না—বলিতেও পারিবেন না। সুতরাং আপনিই তখন বলিলেন, "হিরণ! আমি তোমাকে প্রাণের অপেক্ষাও ভালবাসি। তুমিও আমাকে সেইরূপ ভালবাস, তাও জানি। আমাদের উভয় ভগিনীর ভালবাসা বরাবর যাহাতে অচল থাকে, আমার তাহাই ইচ্ছা। কিন্তু এক্ষণে যে সূত্রে ইহা বিচলিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, আমি তাহা ঘুচাইয়া দিব। শুন, আমি ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিব না। তোমার পীড়া যে কি আর পীড়ার নিগূঢ় কারণও যে কি, এক্ষণে আমি তাহা বুঝিয়াছি। সুতরাং তাহার প্রতীকার করিবই করিব।"

হিরণ্ময়ী বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার অগ্রজা ভগিনী কি কৌশলে সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছেন। কত কি ভাবিলেন, কিন্তু সে কৌশলের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলেন না। তথাপি বুঝিলেন, বড় দিদি সমস্তই জানিতে পারিয়া-ছেন। লজ্জায় কথা কহিতে পারিলেন না।

কিরণময়ী সেই অবধি এখন পর্য্যন্ত কনিষ্ঠা ভগিনীকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া আর এমন কিছু বলিলেন না। কেবল বলিলেন, "হিরণ! আমি যে কোন কৌশলে হউক্, ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিব না। যাহাতে অন্য কোন পাত্রের সহিত আমার বিবাহ হয়, তাহারই চেষ্টা করিব। তুমি নিশ্চয় জানিও, তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি, ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিব না।—আরও বলি, আমিও তোমার ন্যায় ধীরেন্দ্রনাথকে ভালবাসি, কিন্তু জানিতাম না যে, এক জনকে ভালবাসিলে, আমার আর একটি ভাল বাসার—প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসার পাত্রীকে দুঃখভাগিনী করিতে হইবে। জানিলে কখনই ধীরেন্দ্রনাথকে এত দূর ভালবাসিতাম না। যাহা হইবার হইয়াছে। এক্ষণে আর তাঁহাকে ভালবাসিব না—তুমি যে মনে এবং যে অভিপ্রায়ে তাঁহাকে ভালবাস, আমি সে মনে এবং সে অভিপ্রায়ে ভাল বাসিব না। তবে বন্ধুকে যেরূপে ভালবাসিতে হয়, আমি ধীরেন্দ্রনাথকে সেইরূপে ভালবাসিব। ভগিনীপতিকে যেরূপে ভালবাসিতে হয়, আমি ধীরেন্দ্রনাথকে সেইরূপে ভালবাসিব। হিরণ্ময়ি! আমি আবার বলিতেছি, তুমি আর ভাবিও না—ইচ্ছা করিয়া যন্ত্রণাভোগ করিও না, সুস্থির হও, আমার কথায় বিশ্বাস কর—আমি ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিব না। ধীরেন্দ্রনাথের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইলে এ কথা বলিও। আমিও বলিব।"

কিরণময়ীর এই দীর্ঘকালস্থায়ী বাক্যগুলি শুনিয়া হিরণ্ময়ীর ভয়লজ্জা দুঃখনিরাশাজড়ীভূত তমোময় অন্তরে কিঞ্চিৎ আলোক প্রকাশ হইল। মনে মনে কিরণময়ীকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন—প্রণাম করিলেন, কিন্তু মুখ ফুটিয়া এখনও কিছু বলিতে পারিলেন না।

আরও কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া, কিরণময়ী তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

হিরণ্ময়ী কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

চেষ্টা বিফলা।

কিরণময়ীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী বিস্ময়ান্বিত হইলেন। বিস্ময়ের সহিত আনন্দ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল। তিনি এক একবার পুলকিত আবার কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি বড় দিদির নিকট এরূপ মনোমত কথা শুনিবার কখনই আশা করি নাই, কিন্তু তিনি আপনিই আমার আশার সুসার করিয়া দিলেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব কার্য্যের তুলনা নাই। আমি ধীরেন্দ্রনাথকে ভালবাসি বলিয়া বড় দিদির উপর মনে মনে রাগ করিয়াছিলাম। এক্ষণে বুঝিলাম ভাল করি নাই। তিনি আমাকে আজিও যে পূর্ব্বের মত সমান ভাবে ভালবাসেন, আমার দুঃখে দুঃখিত ও সুখে সুখিত হইয়া থাকেন, আমি তাহা বুঝিয়াও বুঝি নাই। কেন বুঝি নাই? না—ধীরেন্দ্রনাথকে ভালবাসি বলিয়া। কিন্তু তিনিও ত ধীরেন্দ্রনাথকে আমার মত ভালবাসেন। তবে এমন করিলেন কেন? বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি, ধীরেন্দ্রনাথের অপেক্ষা আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসা অধিক। তা নহিলে কখনই এরূপ করিতেন না। ধন্য বড় দিদি! আমি তোমার এই অতুলনীয় উপকারের প্রত্যুপকার করিতে পারিব না। কিন্তু যাবজ্জীবন তোমার চরণে বিক্রীত হইয়া থাকিলাম।" এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

কিরণময়ীর কথাগুলি হিরণ্ময়ীর মনে যতবার সমুদিত হইতে লাগিল, ততবারই যেন তাঁহার মন ও শরীর সুস্থির হইতে লাগিল। তাঁহার পীড়ার উপশম হইল। এক্ষণে হিরণ্ময়ী পীড়াহীনা।

ও দিকে প্রিয়মাধব প্রিয়তম বন্ধু ধীরেন্দ্রনাথের নিকট পুনঃপ্রতিশ্রুত হইয়া জগদীশপ্রসাদকে অন্য পাত্রের সহিত কিরণময়ীর এবং ধীরেন্দ্রনাথের সহিত হিরণ্ময়ীর বিবাহের কথা তুলিয়াছিলেন, অনেক কারণ দেখাইয়া দিয়া-

ছিলেন। কিন্তু তাহাতেও কিছু হয় নাই। প্রিয়মাধবের নিকট ধীরেন্দ্রনাথ তাহা শুনিয়া সম্পূর্ণরূপে হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে হিরণ্ময়ী-লাভের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি হতাশ হইয়া মনে মনে ভবিষ্যতের ব্যাপার কিরূপে ভাবিতে লাগিলেন, তাহা আমরা জানি না।

এ দিকে কিরণময়ী হিরণময়ীর নিকট যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারই পালন কার্য্যে যত্নবতী হইলেন। কিন্তু সহসা কাহার নিকট উহা প্রকাশ করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। পিতা মাতার নিকট কন্যার মুখ হইতে এরূপ কথা বাহির হয় না। ভয় ও লজ্জা আসিয়া জিহ্বা চাপিয়া ধরে।—এই জন্য তিনি মনে মনে নানা প্রকার কৌশল গড়িয়া তাঁহার দাসীর নিকট মনের কথা পাড়িলেন। দাসী অনন্যচিত্তে একটি একটি করিয়া সমুদয় শুনিল। শুনিয়া বলিল, "মা ঠাকুরাণী এ কথা শুনিয়াছেন ?"

কিরণ বলিলেন, "না।—তুই তাঁহাকে বলিস্।"

দাসী বলিল, "তা যেমন বলিব, কিন্তু তিনি যদি আমার উপর রাগ করেন।"

কিরণময়ী হাসিয়া বলিলেন, "তোর উপর রাগ করিবেন কেন ? যদি করেন ত আমার উপরেই করিবেন।"

দাসী কিরণময়ীকে বড় ভালবাসিত। সে এ কথা শুনিয়া বলিল, সেও ত ভাল কথা নয়।"

কিরণময়ী কিঞ্চিৎ বিরক্তিসহকারে বলিলেন, "সে যাই হউক, তুই বল্‌বি কি না ? না বলিস্ ত আমি ভাত খাইব না।"

দাসী চঞ্চল হইল। বলিল, "আচ্ছা, বলিব।" এই কথা বলিয়া আবার বলিল, "আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

কিরণময়ী বলিলেন, "এখন বুঝিয়াও কাজ নাই। পরে বুঝাইয়া দিব।"

দাসী।—"আচ্ছা, তবে এখন যাই।"

কিরণ।—"হ্যা দেখ্, তুই কেবল এই কথাগুলি মা'র কাছে বল্‌বি যে, কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। এ কথা শুনিয়া তিনি যদি বলেন যে, কে ইহা বলিল ? তাহা হইলে তুই বলিস্ যে, কিরণময়ী

জাই। কিন্তু আমি যে এ কথা মা'কে বলিবার জন্য তোকে পাঠাইলাম, তা যেন তিনি জানিতে না পারেন, কেমন ?"

দাসী বলিল, "না, তা বলিব না। আমি যেন আপনার ইচ্ছায় বলিতেছি, এইরূপ ভাবে বলিব।"

কিরণময়ী বলিলেন, "হাঁ, তাই বলিস। দেখিস্ যেন এক বলিতে আর বলিয়া ফেলিস্ না।"

দাসী আপনার বুদ্ধিমত্তা দেখাইবার জন্য বলিল, "না গো না, তা' কেন বলিব ? আমি এমনই কি না ? তবে এখন যাই।"

কিরণময়ী বলিলেন, "আচ্ছা, যা ; কিন্তু খুব সাবধান।" দাসী প্রস্থান করিল।

দাসী চলিয়া গেলে পর, কিরণময়ী ভাবিতে লাগিলেন, "মা দাসীর নিকট এ কথা শুনিলে পিতাকে বলিবেন। অবশ্য আমাকে ডাক পড়িবে। পিতা আমাকে কিছু বলিবেন না, কিন্তু মা সব বলিবেন। তখন আমিও আমার মনের কথা তাঁহাকে বলিব। কারণ দেখাইলে অবশ্যই আমার কথা রক্ষা হইবে।" তিনি এইরূপ আরও কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

এ দিকে দাসী জাহ্নবীদেবীর নিকট গিয়া, এ কথা সে কথার পর কিরণময়ীর বিবাহের কথা পাড়িল। জাহ্নবী দেবীও বিবাহের বিষয়ে কত কি বলিলেন। দাসী সকলগুলিই শুনিল। শুনিয়া একটু বিরস হইল। জাহ্নবী দেবী তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন, "তুই এমন হইলি কেন ?"

দাসী বলিল, "মা ঠাকুরুণ। তুমি যা বলিতেছ, তা শুনিয়া আমার আনন্দও হইতেছে, অসুখও হইতেছে।"

জাহ্নবী দেবী বলিলেন, "অসুখ আবার কিসের ?"

দাসী বলিল, "ধীরেন্দ্রনাথকে কিরণের বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই।"

জাহ্নবী দেবী ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "সে কি ? কে তোকে এ কথা বলিয়াছে ?"

দাসী।—"আমি তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি। তিনি ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিতে নারাজ।"

জাহ্নবী।—"কই, আমার কাছে ত সে কিছুই বলে নাই।"

দাসী।—"লজ্জার ভয়ে।"

জাহ্নবী দেবী কি নিমিত্ত চিন্তিত হইলেন। কারণ বুঝিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া দাসীকে বলিলেন, "তুই কিরণময়ীর নিকট গিয়া ভাল করিয়া তাহার মনের কথা গুলি শুনিয়া আমাকে আবার সংবাদ দিস। আমি যে তোকে তাহার নিকট পাঠাই-তেছি, তাহা যেন সে জানিতে না পারে। জানিতে পারিলে লজ্জা ভয়ে কিছুই প্রকাশ করিবে না।"

দাসী আবার কিরণময়ীর নিকট গমন করিল। গিয়া জাহ্নবী দেবীর কথা গুলি এক এক করিয়া বলিল। কিরণময়ী শুনিয়া উপায় ঠিক করিতে লাগিলেন।

এ দিকে জাহ্নবী দেবীও নানা চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন। এক-বার স্বামীর নিকট এই কথা বলিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু বিশেষ কারণ না জানিয়া বলিলেন না।

সে দিন এই রূপে অতিবাহিত হইল।

পর দিন প্রভাতে জাহ্নবী দেবী কিরণময়ীকে আপনার নিকট ডাকাইয়া বলিলেন, "কিরণ! স্বামীর প্রতি পত্নীর কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা তুমি নানাবিধ গ্রন্থ পাঠে অবগত হইয়াছ। অদ্য আমি ও সে বিষয়ে আরও কতক গুলি কথা বলিব। পতিই পত্নীর গুরু। বিপদে ও সম্পদে স্ত্রীলোকের পতিই একমাত্র ভরসা। পতী সেবা করিলে নারীর স্বর্গলাভ হয়। যে পত্নী ভর্ত্তার প্রতি বিমুখ, তাহাকে অক্ষয় নরকে পতিত হইতে হয়। স্বামীই স্ত্রীলোকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ। পতিব্রতা রমণীর প্রতি দেবগণ সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকেন, কিন্তু পতিসেবাহীনার প্রতি তাঁহারা অত্যন্ত রুষ্ট হ'ন। স্ত্রী-লোকের পতিই একমাত্র গতি—পতি ব্যতীত তাহার আর ঐহিক ও পার-লৌকিক সুখের কেহই নাই। স্বামীসেবার জন্যই সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী শৈব্যা প্রভৃতি রমণীগণ প্রত্যেক লোকের মুখে আজিও প্রশংসা লাভ করিতেছন। তাই বলিতেছি, স্ত্রীলোকের পক্ষে পতিসেবাই সর্ব্ব-তোভাবে কর্ত্তব্য। তোমারও বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিল। আর

অল্প দিন পরে দুই হস্ত এক হইবে। তুমিও সীতা সাবিত্রী প্রভৃতির ন্যায় ভর্ত্তৃসেবায় কায়মনোবাক্যে যত্ন করিবে;—দেখিও কখন যেন তাহার অন্যথা করিও না। ধীরেন্দ্রনাথ তোমার স্বামী হইবেন, তাহা তুমি শুনিয়াছ। তুমি তাঁহার প্রতি সর্ব্বক্ষণ ভক্তি প্রদর্শন করিবে।" জাহ্নবী দেবী কিরণময়ীর মনঃপরীক্ষার জন্য এই কথা গুলি বলিলেন।

কিরণময়ী জননীর মুখে স্ত্রীলোকের পতিসেবা ও ধীরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিবাহের কথা গুলি আদ্যোপান্ত শুনিয়া নীরব হইয়া নতমুখে চাহিয়া রহিলেন। জাহ্নবী দেবী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে কিরণময়ী বলিলেন, "মা! তুমি যাহা বলিলে, তাহার সকলগুলিই সত্য, কিন্তু—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া হিরণময়ী নির্ব্বাক্ হইলেন।

কথার শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে না পাইয়া জাহ্নবীর কৌতূহল বৃদ্ধি হইল। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কিন্তু কি, বাছা?"

কিরণময়ী বলিলেন, "তোমার কাছে বলিতে লজ্জা করে।" মুখ অবনত করিয়া এই কথা বলিলেন।

জাহ্নবী দেবী কন্যার মনোগত ভাবের আভাস পাইলেন। পাইয়াও যেন কিছুই জানেন না, এই রূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিরণময়ী দাসীর নিকট জননীর মনস্থ বুঝিয়াছেন। সেই জন্য মনে মনে উহা চিন্তা করিয়া মাতৃকৌশলের মর্ম্ম ভাবিতে লাগিলেন। জাহ্নবী দেবী তাহার কিছুই বুঝিলেন না। তিনি কেবল বুঝিলেন, কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথকে যে বিবাহ করিবেন না, তাহা তাঁহার লজ্জা জনিত নিরুত্তরতায় প্রকাশিত হইতেছে। জাহ্নবী দেবী এই রূপ বুঝিয়া কিরণময়ীকে বলিলেন, "মায়ের কাছে বলিতে লজ্জা কি? তুমি বল।" কিরণময়ী বলি বলি করিয়া কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন "মা! আমি ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিব না।"

জাহ্নবী বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "কেন?"

কিরণ —"যদি আমার উপর রাগ না কর, তবে বলিতে সাহস করি।"

জাহ্নবী।—"কিসের রাগ?—তুমি বল।"

কিরণ।—"মনের মিলন হইবে না।"

জাহ্নবী।—"কি করিয়া জানিলে ?"

কিরণ।—"তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই বলিয়াই জানিয়াছি।"

জাহ্নবী দেবী ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া কি বলিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। বিবাহের এক প্রকার সমস্তই ঠিক হইয়াছে অথচ এমন সময়ে কিরণময়ী এ রূপ বলিতেছেন শুনিয়া তিনি গোলযোগে পড়িলেন। অনেক ভাবিয়া শেষে বলিলেন, "আচ্ছা, এখন তুমি গিয়া স্নানাহার কর। আমি ভাবিয়া দেখি, পরে বলিব।"

কিরণময়ী প্রস্থান করিলেন। জাহ্নবী দেবী ভাবিতে লাগিলেন। অনন্তর যথা সময়ে স্নান পূজাদি সমাপন করিলেন। কিন্তু ভাবনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

মধ্যাহ্ন উপস্থিত। জগদীশপ্রসাদ আহার করিতে বসিলেন। জাহ্নবী দেবীও পূর্ব্ববৎ তাঁহার নিকট বসিয়া তালবৃন্ত বীজন করিতে লাগিলেন। ভোজনকার্য্যের প্রায় অর্দ্ধেক শেষ হইল।

এমন সময়ে এ কথা সে কথার পর জাহ্নবী দেবী জগদীশপ্রসাদকে বলিলেন, "যদি রাগ না কর, তবে একটি কথা বলি।"

জগদীশপ্রসাদ হাসিলেন। পরিহাস করিয়া বলিলেন, "আহার করিতে করিতে পুরুষে রাগ করে না, স্ত্রীলোকেই করে।"

জাহ্নবী দেবীও পরিহাস করিয়া বলিলেন, "আজ বোধ হয়, তাহার বিপরীত হইবে।"

জগ।—"তা' হইবে না, তুমি বল।"

কাজেই জাহ্নবী দেবীকে বলিতে হইল। তিনি বলিলেন, "কিরণময়ী গোলযোগ বাধাইতেছে।"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "কিসের গোলযোগ ? কি হইয়াছে ?"

জাহ্নবী বলিলেন, "বলিব না।"

এই কথা শুনিয়া জগদীশপ্রসাদ বাম হস্তে জাহ্নবী দেবীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "বলিতেই হইবে।"

জাহ্নবী।—"তুমি এখনি রাগিয়া উঠিবে।"

জগ।—"না।"

জাহ্নবী বলিলেন, "কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিবে না। সে বলিতেছে, তাহার মনের মিল হইবে না।

জগদীশপ্রসাদ এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "কে তোমাকে এ কথা বলিল?"

জাহ্নবী।—"সে নিজেই।"

জগদীশপ্রসাদ বিস্ময়সহকারে বলিলেন, "সে নিজেই বলিয়াছে?"

জাহ্নবী দেবী বলিলেন, "হাঁ।"

জগদীশপ্রসাদ জাহ্নবী দেবীকে আর কিছুই বলিলেন না। দাসীকে ডাকিলেন। দাসী ভোজনগৃহে প্রবেশ করিল। জগদীশ তাহাকে বলিলেন, "এখানে কিরণময়ীকে ডাকিয়া আন্।"

দাসী প্রস্থান করিল।

জগদীশপ্রসাদের ভাব দেখিয়া জাহ্নবী কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। বলিলেন, "কিরণকে রুষ্ট হইয়া কিছু বলিও না।"

জগদীশপ্রসাদ কথা কহিলেন না।

জাহ্নবী আরও ভাবিতে লাগিলেন। বলিলেন, "হ্যা দেখ, তুমি চুপ করিয়া থাকিও। আমিই তাহাকে বলিব।"

কিয়ৎক্ষণ পরে কিরণময়ী আসিয়া ভোজনগৃহের দ্বার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জগদীশপ্রসাদের নিকটে গেলেন না, দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাসীর মুখে সমুদয় কথা শুনিয়া তাঁহার মনে বড় ভয় হইয়াছে।

জগদীশপ্রসাদ কিরণময়ীকে দেখিয়া বলিলেন, "কাণ্ডকারখানাটা কি?" এই কএকটি কথাতে তাঁহার ক্রোধচিহ্ন প্রকাশ পাইল।

কিরণময়ী ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "কি, বাবা?"

জগদীশ।—"তোর মতে কি আমাকে চলিতে হইবে?" এই কথার সহিত ক্রোধব্যঞ্জক আরও কত কথা বলিলেন।

তদ্দর্শনে জাহ্নবী দেবী বলিলেন, "রাগ করিবে না বলিলে, কিন্তু আমি যাহা বলিলাম, তাহাই হইল। ভাল কথায় বল না। অমন করিয়া রাগ করিলে বা গালি দিলে কি হইবে?"

জগদীশপ্রসাদের কর্ণে এ কথা স্থান পাইল না। আবার কিরণময়ীকে

বলিলেন, "ধীরেন্দ্রনাথের সহিত তোর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া সমুদয় প্রস্তুত হইয়াছে। বিবাহেরও বেশী দিন বাকী নাই। কিন্তু এমন সময়ে আপনার মতে কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছিস্।"

কিরণময়ী পিতার মুখে এই রোষপূরিত বাক্যগুলি শুনিয়া ভীত হইলেন। কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন, প্রকৃত কথা বলিয়া ফেলি, তাহা হইলে পিতা আমার উপর রাগ করিবেন না।" এই ভাবিয়া আবার ভাবিলেন, "না তাহা বলিব না। বলিলে বিপদ ঘটিবে—হিরণ্ময়ী মারা যাইবে। সে একে হতাশ হইয়া আছে, এমন সময়ে প্রকৃত কথা বলিলে, আমার যত না হউক, কিন্তু তাহার সর্ব্বনাশ হইবে।" এই ভাবিয়া নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জগদীশপ্রসাদ কন্যাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া আবার বলিলেন, "কেন তুই ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিতে চাহিস্ না? কারণ কি বল্?"

কিরণময়ী ধীর স্বরে বলিলেন, "কারণ কি আমি জানি না, কিন্তু তাঁহাকে বিবাহ করিব না।" এই কথাগুলি বলিবার সময় কিরণময়ীর মুখমণ্ডলে লজ্জারেখা পরিস্ফুট হইল।

জগদীশপ্রসাদ এই কথা শুনিয়া রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। তাঁহার শান্তমূর্ত্তি রৌদ্ররসে কতকটা আপ্লুত হইয়া উঠিল। কথা গুলি ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া গেল। চক্ষু ঈষৎ আরক্তিম হইল। তাঁহার এ মূর্ত্তিবিপর্য্যয় দেখিয়া জাহ্নবী দেবী ও কিরণময়ী বড় ভীত হইলেন। দ্বারবহির্ভাগে দাসী দাঁড়াইয়াছিল, সেও ভয় পাইল। জগদীশপ্রসাদ কিরণময়ীকে বলিলেন, "হ্যা দেখ্, কিরণ! আবার যদি তোর মুখে বিবাহের অনিচ্ছার কথা শুনিতে পাই, তবে উপযুক্ত শাস্তি দিব। পিতা মাতা কন্যার মঙ্গল কামনাই করিয়া থাকে; বিবাহ দেওয়া তাহার অন্যতম নিদর্শন। আমি উপযুক্ত পাত্রের হস্তে তোকে অর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি; কিন্তু তুই বালিকাস্বভাব-সুলভ নির্ব্বুদ্ধিতায় তাহার বিপরীত করিতে উদ্যত হইইয়াছিস। সাবধান, আর যেন তোর এরূপ অন্যায় ইচ্ছা ও অন্যায় ব্যবহার দেখিতে না পাই। তুই নিশ্চয় জানিস্, তোর খুব সৌভাগ্য যে, ধীরেন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ হইবে।" এই কথা গুলি বলিয়া জগদীশপ্রসাদ কিরণময়ীকে নিজ কক্ষে যাইতে বলিলেন।

কিরণময়ী প্রস্থান করিলেন। তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। হিরণ্ময়ীকে কি বলিবেন, তাহাই ভাবিয়া অস্থির হইলেন। শেষে ভাবিয়া দেখিলেন তাঁহার চেষ্টা বিফলা।

জগদীশপ্রসাদের ভোজনব্যাপার শেষ হইল, কিন্তু তৃপ্তিবোধ হইল না। চিত্ত চঞ্চল ও অসুস্থ হইল। তিনি মুখ প্রক্ষালনাদি করিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে বিশ্রামগৃহে প্রস্থান করিলেন। জাহ্নবীদেবীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

বিশ্রামগৃহে গিয়া জগদীশপ্রসাদ পর্য্যঙ্কোপরি বাম পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলেন। জাহ্নবী তাঁহার নিকট বসিয়া তালবৃন্তের ব্যজন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে জাহ্নবীদেবী বলিলেন, "যদি কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিতে না চাহে, তবে তুমি এক কাজ কর না কেন?

জগদীশ বলিলেন, "কি কাজ?"

জাহ্নবী।—"অন্য পাত্রের সহিত কিরণের বিবাহ দাও না কেন? এখনও ত সময় আছে; ঘটক পাঠাইয়া অনায়াসে ঠিক্ করিতে পার।"

জগ।—"তা' যেন পারিলাম, কিন্তু আমি হঠাৎ ধীরেন্দ্রনাথের মত মনোমত পাত্র কোথায় পাই? তোমরা স্ত্রীলোক, বুঝ না, তাই এমন কথা বল।"

জাহ্নবীদেবী বলিলেন, "আচ্ছা, ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যেন কিরণময়ীর বিবাহ হইল, কিন্তু হিরণ্ময়ীর বেলা কি হইবে? তাহার জন্যও ত আর একটি বর ঠিক্ করিতে হইবে।"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "সে ভবিষ্যতের কথা। তখন অন্বেষণ করিয়া দেখা যাইবে। এখন ত আর হঠাৎ এই অল্পদিনের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাইতে পারে না। আর এক কথা এই, ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কিরণময়ীর বিবাহ হইবে, ইহা সকলেই জানিয়াছে। এখন্ আবার আমি কি করিয়া তাহার বিপর্য্যয় করিতে পারি? ধীরেন্দ্রনাথই বা কি মনে করিবে? আমা হইতে তাহা হইবে না। আমি কিরণময়ীর কথায় চলিতে পারি না।"

জাহ্নবীদেবী এই কথাগুলি শুনিয়া কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন, 'তাই ত, কি হইবে।"

জগদীশ বলিলেন, "কি হইবে কি ? তোমরা স্ত্রীলোক, বুঝিয়াও বুঝ না। যে কিরণময়ীকে ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক দেখিতেছ, বিবাহের পর সেই কিরণময়ীকেই আবার পতিপরিচর্য্যানুসারিণী দেখিবে। অনেক স্থলে এই রূপ হইতে দেখা যায়। ইহার জন্য তুমি ভাবিও না।" এই বলিয়া স্বীয় উদরে হস্তাবমর্ষণ করিতে লাগিলেন।

জাহ্নবীদেবী বলিলেন, "তা হইলেই সুখের বিষয়। ভগবান্ কিরণময়ীকে সেই রূপ মতি দিউন।" এই বলিয়া তিনি আহার করিতে গেলেন, কিন্তু সুখ নাই। কিরণময়ী কখন কি করেন, এই ভাবনাতেই তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

জগদীশপ্রসাদও পর্য্যঙ্কোপরি শয়ান্ থাকিয়া মনে মনে এই সকল কথার আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আশায় নিরাশ।

কিরণময়ী পিতার নিকট ভর্ৎসিত হইয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন। বিশেষতঃ হিরণ্ময়ীর অবস্থা ভাবিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ অধিকতর পীড়িত হইল। তিনি নিশ্চিতরূপে জানিলেন যে, এ কথা যদি হিরণ্ময়ীর কর্ণে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাঁহার ঘোর সর্ব্বনাশ হইবে। এই জন্য কিরণময়ী হিরণ্ময়ীকে এই কথা বলিবার ইচ্ছা করিলেন না।

এ দিকে হিরণ্ময়ী আপনার কক্ষে বসিয়া আছেন। তিনি অগ্রজা ভগিনীর সেই সকল আশ্বাসপ্রদ বাক্যগুলি শুনিয়া অবধি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। এখন শয্যাতলে প্রতিনিয়ত শুইয়া থাকেন না। উঠিয়া বসেন, গৃহমধ্যে পদচারণা করেন এবং মধ্যে মধ্যে বহির্ভাগেও আসেন, কিন্তু বেশী দূর গমন করেন না। এক্ষণে হিরণ্ময়ী শয্যার উপরে বসিয়া ভাবিতেছেন, "বড় দিদি ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ না করিলে, পিতা অন্য পাত্রের

সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন। বড় দিদি আমাকে যেরূপ ভালবাসেন, তাহাতে নিশ্চয় জানিতেছি যে, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই করিবেন, কিন্তু পিতা কি বড় দিদির ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবেন?" শেষ কথা গুলি ভাবিয়া হিরণ্ময়ী কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইলেন। আবার ভাবিলেন, "বড় দিদি খুব বুদ্ধিমতী; তিনি আপনি কৌশল কবিয়া পিতার মন ফিরাইতে পারিবেন।" হিরণ্ময়ী এই রূপ কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

কিরণময়ী অন্য দিন হিরণ্ময়ীর কক্ষে এতক্ষণ কতবাব যাওয়া আসা করিতেন, কিন্তু অদ্য এখনও তথায় যান নাই। যাইয়া কি বলিবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই বলিয়াই যান নাই।

দেখিতে দেখিতে বেলা তৃতীয় প্রহর উপস্থিত হইল।

যে দাসী জগদীশপ্রসাদের আহারের সময় দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ছিল, কিরণময়ীর ধীবেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিবার অনিচ্ছাব কথা এবং তজ্জন্য জগদীশপ্রসাদের ভৎসনবাক্য যাহাব কর্ণে প্রবেশ করিযাছিল, সেই দাসী হিরণ্ময়ীর কক্ষে আসিল। তাহাব হস্তে জলখাবারেব পাত্র। সে জাহ্নবী দেবীর আদেশে হিরণ্ময়ীকে জলখাবার খাওয়াইতে আসিল। সেই দাসীটির বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর হইবে। দেহ বর্ণ মধ্যম গোছের, মুখশ্রীও তাহাই, নাকে উল্কি ও তাহাব উপব বসকলি, দাঁতে মিসি, গলায় সোণার দানা। দাসী বিধবা,—পরণে শাদা কাপড়। উহার নাম হাবাণী।

হারাণী আসিয়া হিবণ্ময়ীকে জলখাবার খাওয়াইতে লাগিল। এ কথা সে কথার পর হারাণী বলিল, "ওগো, আজ দুপুব বেলা কত্তাব ভাত খাবার সময় তোমার বড় দিদিকে নিয়ে গোলযোগ বেঁধে গিযেছিল।"

হিরণ্ময়ী এই কথা শুনিয়া উৎসুক হইয়া বলিলেন, "কি গোলযোগ, হারাণি?"

হারাণী বলিল, "তোমার বড় দিদি ধীবেন্দ্রনাথকে বিয়ে কত্তে নারাজ। গিন্নী ঠাকৃরুণ সেই কথা কত্তা মশায়কে বলেছিলেন, তাই তিনি তোমার বড় দিদিকে ডাকিয়ে বড় বকেছেন।"

হিরণ্ময়ীর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি সাবধান হইয়া বলিলেন "তাহার পর কি হইল?"

দাসী।—"কর্ত্তা মশায়ের যা' ইচ্ছে, তা'ই হ'বে। তোমার বড় দিদির সঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথের বিয়ে হ'বে।"

হিরণ্ময়ী আরও অস্থির হইলেন, কিন্তু পাছে হারাণী তাঁহার মনের ভাব জানিতে পাবে, এই জন্য সতর্কতার দিকে মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন।

হারাণী আবাব বলিল, 'হ্যাঁগা, ধীরেন্দ্রনাথ অমন গুণবান্ আর সুন্দর পুরুষ, তোমার বড় দিদি কেন তাঁ'কে বিয়ে কত্তে চা'ন না ?"

হিরণ্ময়ী আত্মভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "তা' আমি কি করিয়া জানিব ?" কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল বিমর্ষ হইল। হারাণী তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না। সে বুঝিল, অসুখের জন্য এইরূপ হইয়াছে।

হারাণী বলিল, "অমন সুন্দর যুবকে বিয়ে কত্তে কা'র না ইচ্ছে হয়, কিন্তু তোমার বড় দিদির যে কি পসন্দ, তা' আমরা বুঝ্‌তে পারি না। তা যা'ই হউক, কর্ত্তা মশায় ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তোমার বড় দিদির বিয়ে দিবেন বলেছেন। কর্ত্তা মশায় খুব বুদ্ধিমান মানুষ।"

হিরণ্ময়ী হাবাণীর এই কথাগুলি শুনিয়া বলিলেন, "হারাণি! বড় দিদি বাবার আর মায়ের মন বুঝিবার জন্য সেইরূপ করিয়াছিলেন, বোধ হয়।"

হারাণী তাঁহার এই কথায় বিশ্বাস করিয়া বলিল, "তা' হ'বে।" এই বলিয়া হিরণ্ময়ীর হস্তে একটি তাম্বূল দিয়া জলখাবারের উচ্ছিষ্ট পাত্র লইয়া প্রস্থান করিল। হিরণ্ময়ী তাহাকে আর বেশী কিছু বলিবার ইচ্ছা করিলেন না বলিয়া অপেক্ষা করিতে বলিলেন না। পাছে কথায় কথায় মনের ভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে বলিয়াই এইরূপ করিলেন। কিন্তু কিরণময়ীর মুখে সমুদয় তদন্ত জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলেন।

ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের ও দিবসের অন্তিম দশা উপস্থিত। উভয়েই অন্তর্হিত হইল। সন্ধ্যা আসিল। গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি হইল, ধূনার সুগন্ধ-মিশ্রিত ধূমোত্থিত হইতে লাগিল এবং দীপবর্ত্তিকা প্রজ্জ্বালিত হইল। সন্ধ্যার পর ক্রমে ক্রমে রাত্রি গাঢ় হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়া গেল। কিন্তু আজি এখনও কিরণময়ী হিরণ্ময়ীর কক্ষে অনুপস্থিতা।

রাত্রির আরও কিয়দংশ বৃদ্ধি হইলে পর, কিরণময়ী হিরণ্ময়ীর নিকট

আসিলেন। হিরণ্ময়ীকে দেখিয়া চিন্তাকুলা কিরণময়ীর চিত্ত আরও অস্থির হইয়া উঠিল। হিরণ্ময়ীর মুখখানি দেখিয়া তাঁহার মুখমণ্ডলে বিষাদ-রেখা অঙ্কিত হইতে লাগিল। কি বলিবেন, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না।

পাঠক মহাশয়ের মনে আছে যে, কিরণময়ীর কক্ষেই উভয় ভগিনী রাত্রিকালে এক শয্যায় শয়ন করিতেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে নিজ নিজ কক্ষেও শয়ন করিতেন, তাহাও আপনি জানিতে পারিয়াছেন। এক্ষণে হিরণ্ময়ী পীড়িতা হওয়াতে কয় দিন ধরিয়া কিরণময়ী কনিষ্ঠা ভগিনীর গৃহে রাত্রি-কালে শয়ন করিতে আসেন। অদ্যও সেই অভিপ্রায়ে আসিয়াছেন। হিরণ্ময়ী পীড়িতা, এই জন্যই অদ্য আসিয়াছেন, নতুবা অদ্যকার মাধ্যাহ্নিক ঘটনা স্মরিয়া তাঁহার একেবারেই আসিবার ইচ্ছা ছিল না।

কিরণময়ী হিরণ্ময়ীকে শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। হিরণ্ময়ীর পার্শ্বে শয়ন করিলেন।

হিরণ্ময়ী দুঃখিতচিত্তে বলিলেন, "বড় দিদি! তুমি আজ দিনের বেলায় একটি বারও আমাকে দেখিতে আসিলে না।"

কিরণময়ী বলিলেন, "তজ্জন্য আমি তোমার কাছে দোষী, কিন্তু কি করিব, আসিতে অবকাশ পাই নাই। তুমি কিছু মনে করিও না।" এই বলিয়া হিরণ্ময়ীর গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে হিরণ্ময়ী বলিলেন, "বড় দিদি! হারাণীর মুখে শুনিলাম, বাবা তোমাকে নাকি বড় বকিয়াছেন?"

কিরণময়ী চমকিয়া উঠিলেন। মনে মনে বলিলেন, "যাঃ লক্ষীছাড়া মাগী সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া গিয়াছে। আমি এখন কি উত্তর দি? ভাঁড়াইতে হইল, নতুবা অন্য উপায় নাই।" এই ভাবিয়া বলিলেন, "বাবা যেমন মাঝে মাঝে বকেন, সেইরূপ বকিয়াছেন।"

হিরণ্ময়ী।—"না, সে রকম বকা ত নয়, তুমি ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিবে না বলিয়াছিলে বলিয়া তিনি বকিয়াছেন।"

কিরণময়ী বলিলেন, "না না, হারাণী মাগী ধান শুনিতে পান শুনে। সে কি শুনিতে কি শুনিয়া তোমার কাছে উল্টা বলিয়াছে। তুমিও যেমন,

হিরণ্‌! কেন তাহার কথা শুন? সে মাগীর কাজই ঐ,—মিছামিছি গোল-যোগ বাঁধায়।"

হিরণ্ময়ী ম্লানমুখে বলিলেন, "বড় দিদি! আমি আরও ভাবিব বলিয়া তুমি আমাকে বলিলে না, কিন্তু আমার মনে বড় সন্দেহ হইয়াছে। আমি হারাণীর কথা শুনিয়া আশায় নিরাশ হইয়াছি।" এই বলিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

কিরণময়ী দেখিলেন, বড় সঙ্কট উপস্থিত হইল। কি করেন, নানারূপ সান্ত্বনাবাক্যে হিরণ্ময়ীকে বুঝাইতে লাগিলেন। বলিলেন, "দেখ, হিরণ! তুমি কেন পরের কথায় ভাবিয়া কষ্ট পাও? আমি যাহা বলি, তাহাই শুন। আমার কথায় কান দাও না, এ জন্য আমি বড় দুঃখিত হই। চুপ করিয়া ঘুমাও। কোন ভাবনা নাই।"

হিরণ্ময়ী দেখিলেন, বড় দিদি কিছুই ভঙ্গিয়া চুরিয়া বলিলেন না—বলি-বেনও না। সুতরাং চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু উস্‌খুস্‌ করিতে লাগি-লেন। চক্ষে নিদ্রা আসিল না। কিরণময়ী তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। উভয় ভগিনীরই নিদ্রা নাই—চিন্তায় অস্থির। অনেকক্ষণ পরে কিরণময়ীর নিদ্রা আসিয়াছিল, কিন্তু হিরণ্ময়ী একেবারেই জাগিয়া-ছিলেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া একপার্শ্বে শুইয়া গাত্রবেদনাবশতঃ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গচালনায় মধ্যে মধ্যে কিরণ-ময়ীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। কিরণময়ী যখনই ভগ্ননিদ্র হইয়াছিলেন, তখনই হিরণ্ময়ীকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন এবং কনিষ্ঠা ভগিনী নিদ্রা যান নাই বলিয়া মনে মনে কষ্টও পাইয়াছিলেন। হিরণ্ময়ীর যন্ত্রণা ভোগের যামিনী যেন অনেক বিলম্বে কাটিতে লাগিল।

রাত্রি প্রভাত হইল। নিদ্রিত নরনারী জাগিল, কিন্তু আশায় নিরাশ জাগরিতা হিরণ্ময়ী জাগিলেন কি বলিব?—না। যাঁহার চক্ষে নিদ্রার নাম মাত্রও নাই, তিনি ত জাগরিতাই।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নিরাশার ফল।

গত দিবস মধ্যাহ্নের সময় বিবাহ লইয়া যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, অদ্য প্রাতঃকালে উহা এক মুখ, দুই মুখ, পাঁচ মুখ, দশ মুখ করিয়া বাড়ীশুদ্ধ লোকের মুখে ধ্বনিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ ঐ কথা লইয়া কাণা-কাণিও করিতে লাগিল।

হিরণ্ময়ী প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া ঐ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানের জন্য উৎসুক হইলেন। কিরণময়ী গৃহ হইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। এক্ষণে হিরণ্ময়ী একাকিনী।

কিয়ৎকাল হিরণ্ময়ী স্বীয় কক্ষে থাকিয়া আর থাকিতে পারিলেন না—আস্তে আস্তে মাতার নিকট গমন করিলেন। জাহ্নবী দেবী তাঁহাকে শীর্ণ ও বিমর্ষ দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে বলিলেন, "হাঁ মা! আবার কি কাল রাত্রিতে অসুখ বাড়িয়াছিল?"

হিরণ্ময়ী ধীরস্বরে বলিলেন, "বড় কষ্ট হইয়াছিল।"

জাহ্নবী দেবী বলিলেন, "তবে কেন আবার এখানে আসিলে? যাও শোও গিয়া।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "যাইতেছি।" এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। জাহ্নবী দেবী তাঁহার গাত্রে হস্তাবমর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "কাল রাত্রিতে নিদ্রা হইয়াছিল?"

হিরণ্ময়ী ধীরস্বরে বলিলেন, "না।"

জাহ্নবী।—"নিদ্রা না হওয়াই ত তোর রোগ। আজ ধন্বন্তরি আসিলে ঔষধ বদলাইয়া দিতে বলিব।" এই বলিয়া আবার বলিলেন, "যাও, এখন না হয় একটু ঘুমাও গিয়া। সকাল বেলা বেশ ঠাণ্ডা আছে, হয় ত ঘুম আসিতে পারে।"

হিরণ্ময়ী আবার "যাই" বলিয়া বলিলেন, "হাঁ মা! কাল বাবা বড় দিদিকে কেন বকিয়াছিলেন?"

জাহ্নবী।—"তোমাকে সে কথা কে বলিল?"

হিরণ।—"হাবাণী।"

জাহ্নবী।—"তোমার বড় দিদি ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিতে নারাজ হইয়াছিল, তাই তোমার বাবা তাহাকে বকিয়াছিলেন।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "তা'র পর কি হইল, মা?"

জাহ্নবী বলিলেন, "তা'র পর আর কি হইবে?—বিবাহই হইবে। বিবাহের দিনও ত নিকট হইয়া আসিল। এখন কালী দুর্গার ইচ্ছায় তোর ব্যারাম সারিয়া গেলেই আর কোন ভাবনা থাকে না।"

মাতৃমুখে ধীরেন্দ্রনাথের সহিত জ্যেষ্ঠা ভগিনীরই বিবাহ হইবে শুনিয়া হিরণ্ময়ী বুঝিলেন, তাঁহার আর আশা ভরসা কিছুই নাই। কিরণময়ী যে, গত রাত্রিকালে তাঁহাকে ভাঁড়াইয়া ছিলেন, তাহাও বুঝিলেন। মাতা নিকটে আছেন বলিয়া মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিলেন। আর সেখানে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। বলিলেন, "মা! তবে আমি আসি, গিয়া খানিক ঘুমাই।" এই বলিয়া আস্তে আস্তে প্রস্থান করিলেন।

জাহ্নবীদেবীর নিকট হইতে হিরণ্ময়ী আত্মভাব গোপন করিয়া আসিলেন, কিন্তু বাহিরে আসিয়া আর সামলাইতে পারিলেন না—কাঁদিয়া ফেলিলেন। নয়ন দুইটি উছলিয়া উঠিল—গণ্ডদ্বয় বহিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী অঞ্চল দিয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ অঞ্চল ঘর্ষণে চক্ষু যুগল আরক্ত হইল। তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত স্থলে যেন কিসের ঘন ঘন আঘাত ইহতে লাগিল। চরণ আর যেন চলিতে চায় না। একে হতভাগিনী দুর্ব্বলা, তাহার উপর আবার এই নিদারুণ মনঃপীড়া, সুতরাং আর আপনা-আপনি আপনাকে সান্ত্বনা করিতে পারিলেন না। কিরণময়ীর আশ্বাসে তাঁহার মনের ভিতর যে আনন্দ টুকু জন্মিয়াছিল, তাহা বিলীন হইয়া চতুর্গুণ মাত্রায় যন্ত্রণার উৎস ফুটিয়া উঠিল। নিরাশা-ভুজঙ্গী-দংশিতা হিরণ্ময়ীর এই অসদৃশ মর্ম্মবেদনার মর্ম্ম বলিয়া বা লিখিয়া বুঝাইবার পন্থা নাই। তাঁহার মর্ম্মযন্ত্রণা তিনি এবং তাঁহার ইষ্টদেবতাই বুঝিতেছেন। আহা, এমন যে

মনোহর প্রভাত, তাহাও তাঁহার চক্ষে অমাবস্যার ভয়ঙ্করী নিশীথিনীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

মর্ম্মাহতা স্খলিতপদা হিরণ্ময়ী আপনাকে এই শঙ্কটকূটদশায় নিক্ষিপ্ত করিয়া ধীরে ধীরে স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। শিথিল-শরীর হইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। সুকোমল তূলগর্ভ শয্যাতল হইতেও যেন তাঁহার কোমল ও ক্লেশজর্জ্জরিত অঙ্গে তীক্ষ্মমুখ কণ্টকজাল বিদ্ধ হইতে লাগিল। দুর্ব্বল শরীরে যত টুকু বল থাকিবার সম্ভাবনা, তাহাও ঘুচিয়া গেল। মস্তক ঘুরিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী আপনাকে যেন বিশ্ব সংসারের মধ্যে যন্ত্রণার একমাত্র প্রস্রবণ মনে করিলেন।

হিরণ্ময়ী জননী-বদনে শুনিয়াছেন, পিতা নিশ্চয়ই ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার অগ্রজা ভগিনীর বিবাহ দিবেন, তাহার অন্যথা হইবে না। তিনি এখন কি করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, ধীরেন্দ্র-নাথের সহিত তাঁহার বিবাহ দিবার কথা পিতা মাতাকে বলিবেন। আবার ভাবিলেন, তাহা তাঁহা হইতে হইবে না—তিনি প্রাণ গেলেও মুখ ফুটিয়া এ কথা তাঁহাদিগকে বলিতে পারিবেন না, অথচ প্রতি নিমেষপাতে অসহ্য নিরাশা-জনিত যন্ত্রণার বজ্রমুষ্টিতে আপনাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিবেন। হিরণ্ময়ীর এই মর্ম্মবিদারিণী দুরবস্থা ও যন্ত্রণার শেষ সীমা, বোধ হয়, বিধাতা নির্ণয় করেন নাই, কেবল বৃদ্ধি হইবারই পন্থা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন! হা হতভাগিনী হিরণ্ময়ী! তুমি কেন ধীরেন্দ্রনাথকে ভুলিতে পারিতেছ না? বুঝিয়াছি, পারিবে না। তাহা পারিলে কি তোমাকে এখনও এত কাঁদিতে হয়—এত ভাবিতে হয় এবং এত হতাশ হইতেও হয়। বুঝিয়াছি, তুমি জগৎকে ভুলিতে পার, জগতের অস্থিমজ্জাবিজড়িত একটি পরমাণুর অপার অংশের এক এক অংশ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তন বিশ্বলোচন সূর্যকেও ভুলিতে পার—তুমি আপনাকে ভুলিতেও পার, কিন্তু একমাত্র ধীরেন্দ্রনাথকে ভুলিতে পার না—পারিবেও না। হিরণ্ময়ি! দশ বৎসরের কথা বলিতেছি, তুমিই না তোমাদের বাড়ীতে ধীরেন্দ্রনাথের প্রথম পদার্পণের দিন সুধামাথা ওষ্ঠাধরে হাসি মাথাইয়া তাঁহার সহিত খেলা করিতে চাহিয়া-ছিলে? তুমিই না সেই অপরিচিত নব আগন্তুক বালককে পরিচিতের ন্যায়

এই চক্ষে দেখিয়াছিলে ? কিন্তু, হায়, হতভাগিনি ! আজ তোমার সেই এই ওষ্ঠাধরে সেই হাসির খেলা কই?—সেই এই পদ্মপলাশ-লোচনে সেই আলাপ কৌশলই বা কই? আজ তোমার পক্কবিম্ববিনিন্দিত ওষ্ঠাধর বৈমর্ষ্যের আকর—নয়নযুগল উত্তপ্ত-অশ্রু-তরঙ্গের মহাসাগর! বিধাতার বিধি বা কৌশল যে কিরূপ ভৌতিক, কিরূপ চঞ্চল, কিরূপ পরিবর্ত্তনশীল, তাহা তোমার সেই দিন আর এই দিনের সঙ্গেই তুলনা করিলে হৃদয়ঙ্গম হয়! পাঠক! হিরণ্ময়ীর এ কি হইল! ইহার প্রতীকার কি ? ইহার পরিণাম কি ?—ঈশ্বরই জানেন।

হিরণ্ময়ী অনেক কাঁদিলেন—অনেক ভাবিলেন। কিন্তু দেখিলেন—তীব্র দৃষ্টির সহিত ভবিষ্যতের অভেদ্য তমোরাশির মধ্যে দেখিলেন, তাঁহার আশা-লতাটি শুকাইয়া গিয়াছে। সেই লতাটিতেই তাঁহার জীবনী-শক্তি ও ইহ-লোকে অবস্থিতির আশ্রয় ছিল, সে দুইটিও তাহার সহিত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই তিনটির অভাবে আরও দেখিলেন, তিনি যেন আর বাঁচিয়া নাই! অমনি তাঁহার চমক হইল। এমন সময়ে এরূপ চমক যে কেন হইল, তাহা হিরণ্ময়ী এবং হিরণ্ময়ীর অবস্থাপন্ন হতভাগ্য বা হতভাগিনী ব্যতীত কেহই বুঝিতে পারিবে না।

হিরণ্ময়ী চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। মাথা ঘুরিতে লাগিল। আবার শুইয়া পড়িলেন। অশ্রুপাতের বিরাম নাই। চক্ষু যুগল ও মুখমণ্ডল আরক্তিম। সেই আরক্তিম মুখমণ্ডলের ইতস্তত অশ্রুলিপ্ত হওয়াতে, বোধ হইল যেন প্রস্ফুটিত অনব গোলাপের উপর শিশির সিঞ্চিত হইয়াছে।

প্রভাত হিরণ্ময়ীকে কাঁদাইয়া সে দিনের মত চলিয়া গেল। মধ্যাহ্ন আসিল। হিরণ্ময়ীকে কি সান্ত্বনা করিতে ? কে বলিল ?—কাঁদাইতে! পলকে পলকে যেরূপ অশ্রুবৃদ্ধি, দেখিলে ভয় হয়, পরিণামে কি দাঁড়াইবে।

নারাণের মা হিরণ্ময়ীকে আহার করিতে ডাকিতে আসিল। বৃদ্ধা দাসী আসিয়াই অবাক্। হিরণ্ময়ীর রোদনে ও মুখমণ্ডল-বিস্ফুরিত-বৈমর্ষ্যে তাহারও হৃদয় গলিয়া গেল। সে হিরণকে প্রাণের সহিত ভালবাসে বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বড় কষ্ট হইতেছে কি ? শরীরের ভিতর—মনের ভিতর কি রকম হইতেছে ?" এই বলিয়া হিরণ্ময়ীকে আপনার বক্ষের উপর হেলাইয়া রাখিয়া আঁচল দিয়া মুখ মুছাইয়া দিতে

লাগিল। সরল মনে বলিতে লাগিল, "হে হরি! আমার হিরণ্‌কে শীগ্‌গির আরোগ্যি কর, তোমার হরি-লুট দিব। হে মা গঙ্গা! আমার হিরণকে শীগ্‌গির আরাম কর, তোমায় ডাব চিনি দিব মা!" বুড়ী এইরূপে আরও কত ঠাকুর ঠাকুরাণীর নিকট ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের মানসিক করিল।

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "আজ অসুখ বড় বাড়িয়াছে, আমি কিছুই খাইব না। তুই মাকে এই কথা গিয়া বল্।"

নারাণের মা তাহাই বলিতে চলিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "খুব সাবধানে থাকিও—জল টল যেন খাইও না। আমি নেয়ে টেয়ে আবার আসিব।"

*　　　*　　　*　　　*　　　*　　　*

ধীরেন্দ্রনাথ গত কল্যের সমস্ত কথা শুনিয়াছেন। তিনিও অত্যন্ত অস্থির হইয়াছেন। বাড়ীতে কোন মতে তিষ্ঠিতে না পারিয়া প্রিয়মাধবের নিকট গিয়া বসিয়া আছেন। বাড়ী হইতে যাইবার সময় তাহার ভৃত্যকে বলিয়া গিয়াছিলেন, "আমি আজ এখানে আহার করিব না, প্রিয়মাধবের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ আছে।" সুতরাং জগদীশপ্রসাদ বা জাহ্নবী দেবী আহারের সময় তাহার আর অনুসন্ধান লন নাই। ধীরেন্দ্রনাথ প্রিয়মাধবকে এই ঘটনার আদ্যোপান্ত বলিয়া ছিলেন, কিন্তু তাহার পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা জানি না।

*　　　*　　　*　　　*　　　*　　　*

এ দিকে কিরণময়ীও, হিরণ্ময়ী সমস্ত জানিতে পারিয়াছেন জানিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। কি বলিয়া কনিষ্ঠা ভগিনীর মনকে প্রবোধ দিবেন, তাহার কোন উপায় না পাইয়া, হতাশ হইয়াছেন। এই জন্য তিনি হিরণ্ময়ীর কক্ষ হইতে প্রাতঃকালে বহির্গত হইয়া অবধি আর প্রবেশ করেন নাই।

যথা সময়ে সনাতন ধন্বন্তরি আসিয়া ঔষধ বদলাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কি হইবে? আজি পর্য্যন্ত যে কালে রোগের প্রকৃত লক্ষণ পরিস্ফুট হইল না, সেকালে আনুমানিক ঔষধ-বটিকায় বা চূর্ণকে কি ফললাভ? সনাতন ধন্বন্তরি বাহিরে না হউক মনে মনে হারি মানিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্নের পর অপরাহ্ণ উপনীত হইল। কিন্তু আশা-দগ্ধা হিরণ্ময়ীর আর যন্ত্রণার শেষ হইল না। তিনি গত দিবস হইতে অদ্য এতক্ষণ পর্য্যন্ত কতশত চিন্তা করিলেন—যন্ত্রণার কতশত সবিষ দংশন সহ্য করিলেন, তাহা কে বলিয়া বুঝাইয়া দিতে পারে? হিরণ্ময়ী অবশেষে কি ভাবিয়া গাত্রোত্থান করিলেন—গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। যথাস্থান হইতে মস্যাধার, লেখনী ও একখণ্ড কাগজ লইয়া একখানি পত্র লিখিতে বসিলেন। ক্রমে ক্রমে পত্র লেখা শেষ হইল। পত্রখানি দুই তিন বার পাঠ করিলেন।

অনন্তর হিরণ্ময়ী দ্বারোন্মোচন করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কেহই নাই। আস্তে আস্তে ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষে গমন কবিলেন। কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তিনি ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ধীরেন্দ্রনাথের পর্য্যঙ্কের উপর বসিয়া শিরোবাহক উপাধান তুলিলেন, দেখিলেন, সেখানে ধীবেন্দ্রনাথের সিন্দুকের চাবি রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি সেই চাবি লইয়া সিন্দুক খুলিলেন। সিন্দুকের মধ্যে পত্রখানি রাখিয়া যথাস্থানে চাবি রাখিলেন। অনন্তর গৃহের দ্বার খুলিয়া আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। এখনও তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইল না। পত্রখানির ভিতর কি লেখা হইল, তাহা জানি না।

দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। সন্ধ্যা আসিল। যে দাসী অন্তঃপুরস্থ গৃহে গৃহে দীপ জ্বালে, সে হিরণ্ময়ীর কক্ষে দীপ জ্বালিয়া দিয়া গেল। হিরণ্ময়ী তাহা শয্যাতলে শুইয়া দেখিলেন। অনন্তব পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন। হিরণ্ময়ীব পিতা মাতা ও অন্যান্য পরিজনেরা মধ্যে মধ্যে তাঁহার শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণেও কেহ কেহ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ী যেরূপ উত্তর দিয়া থাকেন, তাহাই দিতে থাকিলেন। হিরণ্ময়ীর কক্ষে কিরণময়ী এখনও অনুপস্থিতা।

ক্রমে ক্রমে রাত্রি এক প্রহর অতীত হইল। কিরণময়ী আসিলেন না। দুই প্রহর অতীত হইল, তথাপি কিরণময়ীর দেখা নাই। এতক্ষণে হিরণ্ময়ী বিশেষরূপে বুঝিলেন, বড় দিদি লজ্জায় পড়িয়াছেন, তাঁহার অন্য কোন সদুপায় করিতে না পারিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, এইজন্য এখনও তাঁহাকে দেখা

দিলেন না। তিনি আরও বুঝিলেন যে, এত রাত্রি হইল, এখনও যেকালে বড় দিদি আসিলেন না, সেকালে আজ আর আসিবেন না। আপনার ঘরে শয়ন করিবেন। হিরণ্ময়ী মনে মনে এইরূপ ধারণা করিয়া একাকিনীই অনেকক্ষণ শুইয়া রহিলেন।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নিরাশার ফল-পরিণাম।

পাঠক মহাশয়! অদ্য রজনীতে একটি ভয়ানক ঘটনা ঘটিতে চলিল। এরূপ দুঃখের ঘটনা জগদীশপ্রসাদের আলয়ে পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। সকলেই নিদ্রিত, কেবল চিরজাগরণ-বতী হিরণ্ময়ীই নিদ্রার সুকোমলকোলশূন্যা। আরও বোধ হয়, স্ব স্ব কক্ষে ধীরেন্দ্রনাথ ও কিরণময়ীও এখন পর্য্যন্ত নিদ্রিত হন নাই।

হিরণ্ময়ী গা তুলিয়া পর্য্যঙ্কের উপর বসিলেন। মস্তকের দিকের বাতায়ন খুলিয়া দেখিলেন, চন্দ্র অস্তগত হইয়াছেন। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তাঁহার গৃহের বহির্ভাগের যে দক্ষিণ দিক নিশাকরের ধবল কৌমুদীজালে বিধৌত হইতে-ছিল, এক্ষণে তাহাই আবার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। এই দৃশ্যের সহিত হিরণ্ময়ীর ঠিক তুলনা হয়;—ধীরেন্দ্রনাথের সহিত কিরণময়ীর বিবাহ সম্বন্ধ উত্থাপিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার অন্তর্জগৎ উজ্জ্বল ছিল, কিন্তু এক্ষণে উহা গভীর অন্ধকারে স্তবীভূত হইয়া গিয়াছে।

হিরণ্ময়ীর অশ্রুসিক্ত নয়নযুগলের দৃষ্টিরেখা অন্ধকারের মধ্যে যতদূর প্রবেশ করিতে পারিল, তদ্দ্বারা তিনি দেখিলেন, যেন তমিস্রসাগরে সমস্ত পদার্থ ডুবিয়া গিয়াছে। অক্ষোমসীলিপ্ত বৃক্ষগুলি তাহাতে ভাসিতেছে। তমস-তরঙ্গসঙ্ঘ ভীষণ ভঙ্গিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহাকে যেন গ্রাস করিতে আসি-তেছে। তিনি ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ একটা পেচক কর্কশ-চীৎকারে এক বৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষের উপর উড়িয়া বসিল। পেচক-কণ্ঠের সুকঠোর শব্দে হিরণ্ময়ীর চক্ষু দুইটি পুনর্ব্বার উন্মীলিত হইল। তিনি কি ভাবিয়া বাতায়নকপাট বন্ধ করিলেন। পর্য্যঙ্কের মধ্যস্থলে আসিয়া

উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।—অত্যন্ত গভীর ভাবনা—সর্ব্বনাশিনী ভাবনা!

কতক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া হিরণ্ময়ী পর্য্যঙ্ক ত্যাগ করিয়া নিম্নে দাঁড়াইলেন। অদ্য শয়ন করিবার সময় সে গৃহের দ্বার বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার মনে ছিল না। তিনি কপাট বন্ধ আছে ভাবিয়া, অর্গল খুলিতে গেলেন, কিন্তু কপাট নিরর্গল। কপাট কেবল ভেজান ছিল। তিনি আস্তে আস্তে খুলিলেন, তথাপি কিঞ্চিৎ শব্দ হইল। হিরণ্ময়ী কপাট খুলিয়া ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া এ দিক ও দিক দেখিলেন, কেহই নাই। আবার গৃহের মধ্যস্থলে গিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন। পাঠক! এ ভাবনা সেই ভাবনা—অত্যন্ত গভীর ভাবনা—সর্ব্বনাশিনী ভাবনা!

এইবার হিরণ্ময়ী মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "বড় দিদি! তুমি আমাকে যে প্রাণের সহিত ভালবাস, তাহা তোমার কার্য্যের প্রত্যেক সূত্রপাতে আমি জানিতে পারিয়াছি। তুমি আমার জন্য কি না করিয়াছ আর কি নাই করিতেছ? কিন্তু আমার প্রতি বিধাতা সর্ব্বতোভাবে বিমুখ। আমি তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, নিয়তির ইচ্ছা এবং গতি অবশ্যম্ভাবিনী। উহাকে লঙ্ঘন করিয়া এক নিমেষের জন্যও চলিতে পারে, এমন লোক আজিও পরমাণুতে উৎপন্ন হয় নাই। তবে, বড় দিদি! তুমিই বা কি করিবে, আমিই বা কি করিব আর পিতাই বা কি করিবেন? নিয়তির ইচ্ছা ও গতি অলঙ্ঘনীয় বলিয়াই এই গভীর অন্ধকারময়ী তামসীতে আমি একটি অসমসাহসিক কার্য্য করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। বড় দিদি! প্রাণের বড় দিদি! আর তোমাকে দেখিতে পাইব না—জন্মের মত আজ তোমাকে প্রাতঃকালে এই গৃহ হইতে যাইবার সময় দেখিয়াছি। বড় দিদি! আজ তোমার স্নেহের অভাগিনী নিরাশার প্রতিমূর্ত্তি হিরণ্ময়ী উদ্দেশে বিদায় প্রার্থনা করিতেছে!" এই বলিয়া পুনঃপুনঃ অশ্রুবর্ষণ ও অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। আবার বলিলেন, "না, কেন আমি বড় দিদির কাছে বিদায় চাহিতেছি? কেন তাঁহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিব?—না,—তা' করিব না। বড় দিদি! ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তোমার বিবাহ হউক। আমি ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিতে যেরূপ উৎসুক, তুমিও ত তাহাই। তবে

কেন আমি এত উদ্বিগ্ন ও হতাশ হইতেছি?—তুমি বড়; তোমারই সহিত ধীরেনের শুভ পরিণয় কার্য্য সমাধা হইবে, ইহা ত অন্যায় নহে। পিতার মনস্কামনা পরিপূর্ণ হউক। আমি ধীরেন্দ্রনাথের হস্তে তোমার হস্ত এক হইতে দেখিয়া সুখিনী হইব।” এই কথাগুলি মনে মনে বলিয়া হিরণ্ময়ী কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

আবার তাঁহার ভাববিপর্য্যয় ঘটিল। মানুষের মন কখন যে কিরূপ হয়, তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করা মানুষের কর্ম্ম নহে। মানব-চিত্ত পলকে পলকে ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধারণ করে—এক পলকে হাসে অপর পলকে কাঁদে—এক পলকে জলের অপেক্ষাও গলিয়া যায়, অপর পলকে লৌহের অপেক্ষাও কঠিন হয়—এক পলকে বাঁচে, অপর পলকে মরে। দুঃখিনী হিরণ্ময়ীর চিত্ত ইহার একটি অন্যতম প্রকৃত সাক্ষী। হিরণ্ময়ী এই কিছু পূর্ব্বে উদ্দেশে কিরণময়ীর নিকট বিদায় চাহিতেছিলেন, আবার পরক্ষণেই সে আশা বিসর্জ্জন দিলেন—পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ভাব ধারণ করিলেন। তিনি যেন এক্ষণে একবারে আশার সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিরাশার চিরান্ধকারাময় গভীর হইতেও গভীরতর গর্ভে উলট পালট খাইয়া পড়িয়া গেলেন। অতিশয় অস্থির হইয়া অবলম্বনের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিরাশার সঙ্কটময় গর্ভ অবলম্বনশূন্য! হিরণ্ময়ী যেন আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন! আর গৃহের মধ্যে থাকিতে পারিলেন না—বাহিরে নির্গত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু আর গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না—একাকিনী চলিয়া যাইতে লাগিলেন।

তাই ত, হিরণ্ময়ী কোথায় যান? পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা সঙ্গী বা সঙ্গিনীশূন্যা হইয়া একাকিনী কোথায় যান?—অন্ধকার দেখিয়া, পেচকের চীৎকার শুনিয়া এই কতক্ষণ পূর্ব্বে যে হিরণ্ময়ী আতঙ্কে বাতায়ন-দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই হিরণ্ময়ী এক্ষণে গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া কোথায় যান? হিরণ্ময়ীর রমণীসুলভ অন্তঃকরণে এমন কি দুৰ্দ্ধর্ষ ভাবের আবির্ভাব হইল যে, যাহার চালনায় বা তাড়নায় তিনি ভয় ভুলিয়া নির্ভয়ে বাহির হইয়া পড়িলেন?—কিছুই বুঝি না, তবে কি করিয়া অন্যকে বুঝাইব? যাহার আশা ভরসা ঘুচিয়া গিয়াছে, যাহার পক্ষে প্রাণধারণ অত্যন্ত কষ্টকর, যাহার শরীরে তীক্ষ্মমুখ কণ্টকজাল

মুহুর্মুহু বিদ্ধ হইতেছে এবং মনের ভিতর জ্বলন্ত হুতাশন-শিখা হুঙ্কার ছাড়িতেছে, তাহার আবার জড় প্রকৃতিকে কিসের ভয়? তাহার জর্জ্জরিত অন্তঃপ্রকৃতির উপর জড় প্রকৃতি কি আর বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে পারে? এই জন্যই বুঝি হিরণ্ময়ী একাকিনী বাহির হইয়া পড়িয়াছেন।

হিরণ্ময়ী বরাবর চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে উপর তল হইতে নিম্ন তলে আসিবার সোপানের নিকট আসিলেন। তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে তথাকার প্রজ্জ্বলিত দীপ নিবিয়া গিয়াছিল। তিনি অন্ধকারে দেওয়ালে হাত দিয়া আস্তে আস্তে একটি একটি করিয়া সোপান অতিক্রম করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নীচে নামিলেন। অনন্তর, যে উদ্যানে তিনি ধীরেন্দ্রনাথের চক্ষু টিপিয়া ধরিয়াছিলেন, তাঁহার জন্য পুষ্পমালা গাঁথিয়াছিলেন, এবং তাঁহার হস্তে ধরা পড়িয়াছিলেন, সেই উদ্যানের দিকে যাইতে লাগিলেন। অন্তঃপুর হইতে উদ্যানে প্রবেশ করিবার দ্বারদেশে গিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানকার দেওয়ালে উদ্যানের খিড়কী দরজার চাবি টাঙ্গান থাকিত, হিরণ্ময়ী জানিতেন। তিনি সেই চাবি লইয়া উদ্যানের ভিতর প্রবেশ করিলেন। একটি পথ ধরিয়া বরাবর উত্তর দিকে যাইতে লাগিলেন। উদ্যানের বৃক্ষগুলি মসীমণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। কেবল খদ্যোতনিচয় তাহাদের পত্রাবৃত শাখা প্রশাখার অভ্যন্তরে স্ব স্ব স্বভাব-দীপ প্রজ্জ্বালন করিয়া এ দিকে ও দিকে সঞ্চরণ করিতেছে। মৃদুমন্দ নৈশ সমীরণে বৃক্ষের পত্রগুলি আপন মনে দুলিতেছে—মধ্যে মধ্যে এক একটি শুষ্কপত্র খসিয়া পড়িতেছে। পতনকালে এক প্রকার মধুর অস্ফুট মর্ম্মর শব্দ হইতেছে। শাখাশিখায় রজনীগন্ধা হৃদয় খুলিয়া সৌরভ বিতরণ করিতেছে। শীতল সমীর সেই মনোহর সৌরভ লুণ্ঠন করিয়া আপনার বাসস্থান শূন্যাকাশে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছে। বৃক্ষ লতার পত্র পুষ্পগুলি শিশিরসিক্ত হইয়া যেন পুনর্জীবিত হইয়াছে।

হিরণ্ময়ী ক্রমে ক্রমে উত্তর দিকের প্রাচীর মধ্যস্থ অবান্তর দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন। অন্য দিন হইলে তিনি কত পুষ্প তুলিতেন, আজ আর তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। প্রস্ফুটিত কুসুমসৌরভ তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে পারিল না। তাঁহার পক্ষে উদ্যানের সমস্ত ভাল ভাল পদার্থগুলিই আজ যেন অপকৃষ্ট বোধ হইল।

হিরণ্ময়ী চাবি দিয়া খিড়্‌কী দরজার তালা খুলিলেন। উদ্যানের বাহিরে গেলেন। বাহির হইতে বহির্ভাগের কড়ায় তালা লাগাইয়া আবার চাবি দিলেন। চাবি সঙ্গে রাখিলেন। কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া এ দিক ও দিক দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু আর বড় বেশীক্ষণ সেখানে থাকিলেন না। এইবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা! তুমি নিদ্রিত আছ; বাবা! তুমি নিদ্রিত আছ। তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হইল না। আমি উদ্দেশে তোমাদের চরণে প্রণাম করিয়া আজ জন্মের মত বিদায় লইলাম। আর ইহজন্মে দেখা হইবে না। আমি সর্ব্বসন্তাপহারিণী ভাগীরথীর শীতল গর্ভে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া আপনাকে শীতল করিতে চলিলাম। ধীরেন্! এ জন্মে ত আমি তোমার অর্দ্ধাঙ্গ হইতে পারিলাম না, কিন্তু পরজন্মে যেন হইতে পারি,এই আমার মনস্কামনা। আমি বিবাহের জন্য উন্মত্ত হইয়াছি—আত্মহত্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি, লোকে ইহা জানিতে পারিলে, না জানি কতই পরিহাস ও নিন্দা করিবে। করুক্; আমি তাহাতে ডরাই না। যে আমাকে বিয়ে-পাগ্‌লী বলিয়া গালি দিবে, সে মূর্খ—সে মনুষ্য নহে। যে যাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে, সে যদি তাহাকে না পায়, তবে তাহার ছার শরীরে ছার প্রাণ ধারণ করিয়া লাভ কি?—কিছু না। বরং তাহার মৃত্যুই পরম লাভ। এমন অবস্থায় সর্ব্ব যন্ত্রণা উপসমকারী মরণই শ্রেষ্ঠতম বন্ধু আর জীবনই অপকৃষ্টতম শত্রু। সুতরাং আমি ভাগীরথী-গর্ভে ডুবিয়া মরিব।" এই বলিয়া নিরাশ প্রণয়ের অশ্রুমুখী প্রতিমূর্ত্তি গঙ্গাজলে আত্ম বিসর্জ্জন করিতে চলিলেন। পেচক ডাকিল, হিরণ্ময়ীর ভয় হইল না—শৃগাল কুক্কুর দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল, ভয় হইল না—অন্ধকারে দূরস্থ বৃক্ষের ছায়ায় নানারূপ কল্পিত মূর্ত্তির অপছায়া দেখা যাইতে লাগিল, তথাপি হিরণ্ময়ীর ভয় হইল না। যে মরিতে যাইতেছে, তাহার আবার কিসের ভয়? যে আর কিছু সময় পরে পঞ্চদশ বর্ষের সুবর্ণ শরীর ও প্রিয়তম প্রাণকে বিচ্ছিন্ন করিবে, তাহার আবার মরণের ভয় কি?

হিরণ্ময়ী একটি পথ ধরিয়া বরাবর যাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে জন্মভূমি মধুপুর গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শূন্য গৃহে।

কাহার পক্ষে সুপ্রভাত আবার কাহারও পক্ষে কুপ্রভাত হইয়া রাত্রি প্রভাত হইল। দিবাকর প্রত্যহ যেরূপে উদয় হইয়া থাকেন, সেইরূপে ধীরে ধীরে নীলাকাশে উঠিতে লাগিলেন। পক্ষীরা যেরূপ করিয়া থাকে, তাহাই করিতে লাগিল। নিদ্রিত মানবগণ স্ব স্ব ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিয়া শয্যাত্যাগ করিতে লাগিল।

জগদীশপ্রসাদের প্রাসাদস্থ সকলেই ক্রমে ক্রমে জাগরিত হইয়া স্ব স্ব শয্যা ছাড়িতে লাগিল। বহির্দ্বারে দুই জন প্রহরী রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় বদলি হইয়া জাগিয়া বসিয়াছিল, তাহারা স্ব স্ব আসন ত্যাগ করিল। কিন্তু যে দুই জন প্রহরী রাত্রির মধ্য প্রহরে প্রহরা দিয়াছিল, তাহারা এখনও খাটিয়ার মায়া ছাড়িতে পারিল না—প্রভাতের শীতল সমীরণে পাশ ফিরিয়া সুখে ঘুমাইতে লাগিল।

জগদীশপ্রসাদ, জাহ্নবীদেবী, কিরণময়ী, ধীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলে প্রাতঃক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। জাহ্নবী দেবী হিরণ্ময়ীর কক্ষে হিরণ্মীকে দেখিতে আসিয়া দেখিতে পাইলেন না। মনে করিলেন মুখ হাত ধুইতে গিয়াছেন। ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু পুনর্ব্বার আসিবার ইচ্ছা রহিল।

যথা সময়ে সনাতন ধন্বন্তরি ঔষধের বাক্স লইয়া হিরণ্ময়ীকে দেখিতে আসিলেন। জগদীশপ্রসাদ, জাহ্নবী দেবী, কিরণময়ী ও একজন দাসী তাঁহার সহিত হিরণ্ময়ীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৃহ শূন্য। জগদীশপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ দাসীকে হিরণ্ময়ীকে ডাকিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। সে আদেশ পাইয়া প্রস্থান করিল। সে সময়ে যেখানে যেখানে হিরণ্ময়ীর থাকিবার সম্ভাবনা, সে সেই সেই স্থানে অনুসন্ধান করিল কিন্তু দেখিতে পাইল না। তৎক্ষণাৎ সে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া জগদীশপ্রসাদকে উহা জানাইল।

দাসীমুখে হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধান না পাইয়া জগদীশপ্রসাদ বিরক্ত হইয়া আপনা আপনি বলিলেন, "দেখ দেখি, ধন্বন্তরি মহাশয় আসিয়া বসিয়া রহিলেন, এমন সময়ে হিরণ্ গেল কোথা ? এমন দুরন্ত আর অবাধ্য মেয়েও ত কোথাও দেখি নাই।"

পিতার এই কথা শুনিয়া কিরণময়ী বলিলেন, "বাবা ! আমি একবার খুঁজিয়া আসি।" এই কথা বলিয়া দ্রুতপদে ধীরেন্দ্রনাথের গৃহে চলিয়া গেলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ আপনার কক্ষে বসিয়াছিলেন। তিনি কিরণময়ীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মনে মনে কি বলিলেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু মুখে যেরূপ সহাসবচনাবলি বলিয়া থাকেন, তাহাই বলিলেন। কিরণময়ী হিরণ্ময়ীকে দেখিতে না পাইয়া ধীরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হিরণ্ কি তোমার কাছে আজ আসিয়াছিল ? সে এখন কোথায়, বলিতে পার ?"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কই আমার নিকট হিরণ্ময়ী আজ আসেন নাই। তিনি যে এখন কোথায় আছেন, তাহাও বলিতে পারি না। তাহার গৃহে নাই ?"

কিরণ।—"না।"

ধীরেন্দ্র।—"কেন তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছ ?"

কিরণ।—"ধন্বন্তরি মহাশয় আসিয়া বসিয়া আছেন। ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইয়াছে ; তাই অনুসন্ধান করিতেছি।"

ধীরেন্দ্র।—"এ সময়ে যে যে স্থানে তিনি থাকেন, সে সকল স্থান দেখিয়াছ ?"

কিরণ।—"আমি দেখি নাই বটে, কিন্তু দাসী দেখিয়া আসিয়াছে, দেখা পায় নাই।"

ধীরেন্দ্র।—"তুমিও একবার নিজে খুঁজিয়া দেখ।"

কিরণ।—"তাই দেখি।" এই বলিয়া কিরণময়ী আবার বলিলেন, "ধীরেন্ ! তুমি এত কাহিল হইয়া যাইতেছ কেন ?"

ধীরেন্দ্র।—"আজ কয় দিন ধরিয়া বড় অসুখ হইয়াছে। কিছু ভাল লাগে না, আহারাদি করিতে পারি না, তাই এমন হইয়াছি।"

কিরণ।--"কি অসুখ হইয়াছে?"

ধীরেন্দ্র।—"তা' ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না।"

এইবার কিরণময়ী একটু হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "ধীরেন্! তুমি নিজে তোমার অসুখের মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছ না, কিন্তু আমি বুঝিয়াছি।"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কি অসুখ হইয়াছে বল দেখি?"

কিরণময়ী আবার একটু হাসিয়া বলিলেন, "যদি রাগ না কর, তবে বলি।"

ধীরেন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ ভাবিত হইলেন, বলিলেন, "কেন রাগ করিব, কিরণ? হিত কথা বলিলে কে কোথায় রাগ করে?"

কিরণময়ী বলিলেন, "হিরণের যে অসুখ, তোমারও তাই।"

এই কথা শুনিয়া ধীরেন্দ্রনাথ কি ভাবিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "হিরণের কি অসুখ?"

কিরণময়ী বলিলেন, "তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ না হওয়া, আর তোমারও তাহাকে না পাওয়াই অসুখ।—কেমন কি না?"

ধীরেন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন হইলেন—বিরক্তও হইলেন। বলিলেন, "কিরণ! তুমি আমাকে ওরূপ বলিয়া লজ্জিত ও দুঃখিত করিও না।"

কিরণময়ী দেখিলেন ধীরেন্দ্রনাথ চটিয়াছেন, এই জন্য আর এমন কিছু বলিলেন না। কেবল বলিলেন, "তুমি রাগ করিও না। আমি তোমাকে আরও অনেক কথা বলিব। সে সকল কথা তোমার প্রতিকূল নহে—অনুকূল। আমি তোমার শত্রু নহি। তুমি কিছুই ভাবিও না। এখন যাই, আর এক সময়ে আসিব। এখন হিরণ্ময়ী কোথায় আছে, ধরিয়া লইয়া যাই।"

চিন্তিত ধীরেন্দ্রনাথ কিছুই উত্তর করিলেন না। মনে মনে শঙ্কিত হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার উচ্ছিন্নপ্রায় অন্তর্জগতে আবার সহসা ভয়ঙ্করী ঝটিকা উপস্থিত হইল। তিনি ভাবনার উপর ভাবনায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। স্বীয় কক্ষ হইতে বাহির হইলেন না।

এ দিকে কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষ হইতে বাড়ীময় খুঁজিয়াও হিরণ্ময়ীকে দেখিতে পাইলেন না। পিতার নিকট ফিরিয়া আসিলেন। জগ-

দীশপ্রসাদ কিরণময়ীকে একাকিনী আসিতে দেখিয়া ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "কই, কিরণ! হিরণ কই?"

কিরণময়ী বলিলেন, "এত করিয়া খুঁজিয়াও কোথাও দেখিতে পাইলাম না। কোন স্থানই বাকী রাখি নাই, কিন্তু কোথাও পাইলাম না।"

এইবার জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবীদেবী চিন্তিত হইলেন। ধন্বন্তরি মহাশয়কে বসাইয়া রাখিয়া আপনারা অন্য অন্য দাসদাসীদিগকে লইয়া চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যতদূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান হইতে পারে, তাহার অণুমাত্রও শৈথিল্য হইল না, কিন্তু হিরণ্ময়ীকে পাওয়া গেল না। অনন্তর কতকগুলি লোক নন্দনকাননে, কতকগুলি ঠাকুরবাড়ীতে আর অবশিষ্ট অনেকগুলি লোক মধুপুরের প্রত্যেক বাটীতে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, তথাপি হিরণ্ময়ীকে পাওয়া গেল না। যে লোকগুলি অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিল, তাহারও দুঃখিতচিত্তে ফিরিয়া আসিল।

জগদীশপ্রসাদ জাহ্নবীদেবী ও কিরণময়ী এই বার অত্যন্ত অস্থির হইলেন। হিরণ কোথা—হিরণের কি হইল, এই কথা বাড়ীর প্রত্যেক লোকের মুখে ধ্বনিত হইতে লাগিল। সকলেই অতিশয় দুঃখিত হইল। কেহ কেহ কাঁদিতে লাগিল।

জাহ্নবীদেবী ও কিরণময়ী আর থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিতে লাগিলেন। বাড়ীতে ক্রমে ক্রমে রোদনের শব্দ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। জাহ্নবী দেবী জগদীশপ্রসাদের পায়ের উপর পড়িয়া "কই আমার হিরণ কই? ওগো, হিরণ কোথা গেল! হিরণের কি হইল!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

জগদীশপ্রসাদও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না। সনাতন ধন্বন্তরি জাহ্নবীদেবীকে কত আশ্বাস দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার মন মানিল না। জাহ্নবীর শোকবিলাপ দেখিয়া গৃহ শুদ্ধ লোকে অস্থির হইয়া উঠিল। কিরণময়ীর মুখমণ্ডল নয়নজলে ভাসিতে লাগিল। তিনি সেখানে আর থাকিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ এই রোদনশব্দে অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তাড়াতাড়ি

জগদীশপ্রসাদের নিকট আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, হিরণ্ময়ীর কক্ষ বিলাপস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

আবার জগদীশপ্রসাদ মধুপুরের প্রত্যেক বাগান ও পুষ্করিণীতে অনুসন্ধান করিতে অনেক লোক পাঠাইয়া দিলেন। আপনিও অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে আবার অনুসন্ধান করিতে গেলেন। তাঁহার সঙ্গে জাহ্নবীদেবী ও ধীরেন্দ্রনাথ চলিলেন। কিরণময়ী আপনার কক্ষে থাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে একপ্রকার বুঝিলেন যে, ধীরেন্দ্রনাথের সহিত হিরণ্ময়ীর বিবাহ হইল না বলিয়া তিনি বাটী ত্যাগ করিয়া কোথাও চলিয়া গিয়াছেন, কি আত্মঘাতিনী হইয়াছেন। কিন্তু এ কথা পিতা মাতার নিকট মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলেন না। আপনা আপনিই স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

জগদীশপ্রসাদ যখন উদ্যানের মধ্যে হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধান করিতে যান, তখন আর কএক জন ব্যক্তিও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল। জগদীশপ্রসাদ উদ্যানের এ দিক ও দিক করিয়া চারি দিক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু হিরণ্ময়ীকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তিনি যখন উত্তর দিকের প্রাচীরের দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, সেই সময় খিড়কী দরজায় তাঁহার চক্ষু পড়িল। তিনি দেখিলেন, দরজায় তালা লাগান নাই—খোলা রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ কপাট টানিলেন, কিন্তু কপাট খুলিল না। জগদীশপ্রসাদ বিস্মিত হইলেন। মালীকে ডাকাইলেন। মালী দৌড়িয়া আসিল।

এমন সময়ে ধীরেন্দ্রনাথও তথায় উপস্থিত হইলেন। বিমর্ষ ধীরেন্দ্রনাথের মূর্ত্তি আরও বিমর্ষ হইয়াছে। তাঁহার তাৎকালিক অবস্থার তুলনা হয় না। তিনি মনে মনে যে কত কি ভাবিতেছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

জগদীশপ্রসাদ মালীকে বলিলেন, "খিড়কী দরজার তালা কি হইল? তুই কি তালা বন্ধ করিস নাই?"

মালী ভীত হইল। সবিনয়ে যোড়হস্তে বলিল, "কর্ত্তা মহাশয়! আমি তালা লাগাইয়া রাখিয়াছিলাম। প্রত্যহই তালা লাগান থাকে। কালও সন্ধ্যার পূর্ব্বে এই দরজায় তালা লাগান ছিল।"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "তবে কি হইল?"

মালী পূর্ব্বের স্থায় বলিল, "আজ্ঞে, যেখানে চাবি থাকে, সেখানে আছে কি না, দেখিয়া আসি।" এই বলিয়া দৌড়িয়া লক্ষ্য স্থানে আসিল। দেখিল, চাবি নাই। অত্যন্ত চিন্তিত ও শঙ্কিত হইল। আবার দৌড়িয়া জগদীশপ্রসাদের নিকট গেল। বলিল, "যেখানে চাবি রাখি, সেখানে নাই। বোধ করি, কাল রাত্রিতে কেহ সেই চাবি আনিয়া তালা খুলিয়া লইয়াছে।"

জগদীশপ্রসাদ মালীকে বলিলেন, "প্রাচীরের উপর উঠিয়া দেখ্ দেখি, ও দিকে কি হইয়াছে। কপাট খুলিতেছে না কেন, দেখ্ দেখি।"

মালী প্রাচীরসংলগ্ন একটা বড় জামরুল গাছ বাহিয়া প্রাচীরে উঠিল। জামরুল বৃক্ষের শাখা ধরিয়া মুখ নত করিয়া দেখিয়া বলিল, "ভিতরের তালাটা বাহিরে লাগান আছে।"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "ও দিকে লাফাইয়া পড়িতে পারিবি?"

মালী অন্য সময়ে অক্ষম হইলেও এক্ষণে বলিল, "আজ্ঞে পারিব।"

"তবে ও দিকে গিয়া দেখ্ দেখি, তালাটা বন্ধ কি আটকান আছে।" জগদীশপ্রসাদ এই কথা বলিলেন।

মালী প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লম্ফনের লক্ষ্য স্থান ঠিক করিয়া ঘাসের উপর লাফাইয়া পড়িল। ধপাস্ করিয়া শব্দ হইল। ঘাসের উপর পড়িয়াও তাহার দক্ষিণ পদে আঘাত লাগিল। কিন্তু তাহার সে ব্যথার ব্যথী কে? সে আপনিই আঘাতিত স্থানে হাত বুলাইয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। কপাটের নিকট গিয়া তালা টানিল—সবলে টানিল, কিন্তু তালা খুলিল না। তখন সে কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে জগদীশপ্রসাদকে শুনাইয়া বলিল, "কর্ত্তা মশায়! তালার চাবি দেওয়া আছে। কোনমতে খুলিল না।"

এই কথা শুনিয়া জগদীশপ্রসাদ, ধীরেন্দ্রনাথ এবং আর কএক জন পুরুষ মানুষ উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাহিরে গেলেন। অনেক ঘুরিয়া যাইতে হইল, সুতরাং লক্ষ্য স্থানে পঁহুছিতে বিলম্ব হইল। যাহা হউক, তাঁহারা সেখানে গিয়া দেখিলেন, বাস্তবিক তালায় চাবি লাগান আছে। সকলে মিলিয়া রকমওয়ারি করিয়া টানাটানি করিলেন; কিন্তু তালা খুব মজবুৎ—খুলিল না। অনন্তর সকলে মিলিয়া সেই খানে চাবি খুঁজিতে লাগিলেন।

খিড়কী দরজার সম্মুখ হইতে একটি সরু রাস্তা বরাবর চলিয়া গিয়া ও দিকে একটা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত রাস্তায় মিলিত ছিল। কএক জন লোক সেই খিড়কীর রাস্তার এ দিক ও দিক করিয়া খোয়া হাঁটকাইতে লাগিল, চাবি মিলিল না। কএক জন লোক সেই রাস্তার দুই দিকের ঝোড় ঝাড় ও ঘাস হাঁটকাইতে লাগিল,—তথাপি চাবি মিলিল না। মালী বিশেষরূপে দেখিবার জন্য মড়মড় করিয়া অনেকগুলা ঘেঁটু এবং আস্‌সেওড়ার গাছ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কতকগুলাকে উৎপাটন করিয়া অন্যগুলার ঘাড়ে ফেলিয়া দিল। অনেক খুঁজিল, চাবি দেখা দিল না। তাহার অধীনস্থ মালীরাও খুঁজিতে খুঁজিতে হাল্লাক হইয়া গেল, তথাপি চাবি দেখা দিল না। জগদীশ-প্রসাদ ও ধীরেন্দ্রনাথও অনেক অনুসন্ধান করিলেন, সমস্তই পণ্ডশ্রম হইল। অনুসন্ধানের সময় কএক জনের হাতে পায়ে কাঁটা ফুটিল—রক্তও পড়িল, কিন্তু পরিশ্রম বৃথা হইল।

জগদীশপ্রসাদ আবার মালীকে বলিলেন, "যেখানে চাবি রাখিতিস্, হিরণ্ময়ী কি তাহা জানিত ?"

মালী।—"আজ্ঞে, জানিতেন। তিনি এক এক দিন সেই স্থান হইতে চাবি লইয়া ফুঁ দিয়া বাজাইতেন। আবার রাখিয়া দিতেন।"

জগদীশপ্রসাদ এই বার অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিলেন, ভাবিয়া ধীরেন্দ্র-নাথকে অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বলিলেন, "ধীরেন্দ্র! আর কোন সন্দেহ নাই; হিরণ্ময়ীই মধ্যরাত্রিতে বা শেষ রাত্রিতে এই অবান্তর দ্বার দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সেই আবার ভিতরের তালা বাহিরে লাগাইয়া দিয়াছে। হয় চাবি তার সঙ্গে আছে, নয় ত কোথাও ফেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু এখন আর এখানে বৃথা গোলযোগ করিয়া কোন ফলোদয় নাই। চল, বাড়ীর মধ্যে গিয়া শীঘ্র তাহার অনুসন্ধানের জন্য চারি দিকে লোক পাঠান যাউক। তুমি এক দিকে যাও, আমিও এক দিকে যাই। আর বিলম্ব করা উচিত নয়।" এই বলিয়া তিনি আবার বলিলেন, "হিরণ্ময়ী কেন এমন করিল! সে কোথায় গেল! তাহাকে কি আর পাইব! হা জগদীশ্বর!" এই কএকটি কথায় জগদীশপ্রসাদের বক্ষঃস্থল যেন শতধা ফাটিয়া গেল। মুখমণ্ডল অত্যন্ত বিমর্ষ হইল।

ধীরেন্দ্রনাথ কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। তিনিও যা'র পর নাই অস্থির হইয়াছেন।

অনন্তর সকলে তথা হইতে চলিয়া গেল।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্বেষণ।

জগদীশপ্রসাদ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত কর্ম্মচারীকে নিকটে ডাকাইলেন। সকলে উপস্থিত হইল। সকলেই বিষণ্ণ। অনন্তর জগদীশ-প্রসাদ সেই সকল কর্ম্মচারীর মধ্য হইতে শ্রমশীল, চতুর, অনুসন্ধানে তৎপর লোকদিগকে নানা স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। পাঠাইবার সময় কহিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি হিরণ্ময়ীকে আনিতে বা তাহার প্রকৃত সন্ধানের কথা বলিতে পারিবে, তাহাকে পাঁচ হাজার টাকা দিবেন। আদিষ্ট লোকেরা অনুসন্ধান করিতে প্রস্থান করিল।

অনন্তর তিনি ঘোষযন্ত্রবাদকের দ্বারা ঐরূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন। ঘোষযন্ত্রবাদক ঘোষযন্ত্রে আঘাত করিতে করিতে মধুপুরের প্রত্যেক পল্লীতে ঘুরিতে লাগিল। যাহারা ঘোষযন্ত্রবাদকের মর্ম্ম বুঝিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অর্থলোভে হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধানে চলিয়া গেল। কেহ কেহ কেবল দুঃখিত হইল। অল্পবয়স্ক বালকেরা ঘোষযন্ত্রবাদককে দেখিয়া মনে করিল, সে বুঝি পাঁচ হাজার টাকা লইয়া বাঁশবাজী করিবে।

দেখিতে দেখিতে মধুপুরের প্রত্যেক নর নারীর মুখে হিরণ্ময়ী-হারানর কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। যাহার যেরূপ যুক্তিশক্তি, সে সেইরূপ করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। হাটে, বাজারে, দোকানে জিনিষ পত্রের ক্রয় বিক্রয়ের সহিত এই বিষয়েরও ক্রয় বিক্রয় হইতে লাগিল। সম্মার্জ্জনী-মার্জ্জিত বটবৃক্ষতলে পুরাতন এবং অর্দ্ধচ্ছিন্ন সপের উপর বসিয়া বৃদ্ধেরা এই কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। নবযুবতীরা

পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে গিয়া, কেহ শূন্য কলসী, কেহ পূর্ণ কলসী নামাইয়া এবং কেহ বা কক্ষে ধারণ করিয়া ঈষৎ বঙ্কিমভাবে এই কথায় নানা কথার যোগ দিতে লাগিল। কৃষক এবং রাখালেরা মাঠে গিয়া এই কথার তোলাপাড়া করিতে লাগিল। যাহার মনে যাহা আসিল, সে তাহাই লইয়া এই ব্যাপারে লিপ্ত হইল। কাজেই আমাদিগকেও এই সময় বলিতে হইল,—"ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।"

জগদীশপ্রসাদ নানাস্থানে নানা জনকে পাঠাইয়া, ধীরেন্দ্রনাথকে বলিলেন "দেখ, বাপু! সহসা আমি যে সঙ্কটে পড়িয়াছি, এরূপ বোধ হয়, কাহাকেই পড়িতে হয় না। এখন তোমাকেও একটি কার্য্য করিতে হইবে। তুমিও একদিকে অনুসন্ধান করিতে প্রস্থান কর। পাথেয় লইয়া যাও।" এই বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে কতগুলি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীর জন্য মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, কিন্তু প্রকাশ করিবার পন্থা নাই।—তিনি জগদীশপ্রসাদের নিকট হইতে পাথেয় লইয়া বলিলেন, "মহাশয়! আমি হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধান করিতে অণুপরিমাণেও ত্রুটি করিব না। সঙ্কটমোচন পরমেশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা, যেন তাঁহার প্রসাদে আমি আপনার হিরণ্ময়ীকে আনিতে পারি। আমি আর বেশী বিলম্ব করিব না। তবে এক্ষণে আসি, মহাশয়!" ধীরেন্দ্রনাথ এই বলিয়া জগদীশপ্রসাদকে প্রণাম করিলেন।

"মঙ্গল হউক" বলিয়া জগদীশপ্রসাদ আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ আপনার কক্ষে গমন করিলেন। দূরপ্রস্থানের উপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন।—জগদীশপ্রসাদ যতগুলি স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছেন, ধীরেন্দ্রনাথ তদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি লইতে ইচ্ছা করিলেন। বিদেশে, বিশেষতঃ এরূপ বিপদে পড়িয়া বিদেশে যাইতে হইলে সঙ্গে বেশী টাকা কড়ি থাকা চাই। কিন্তু তিনি জগদীশপ্রসাদের নিকট তাহা চাহেন নাই। জগদীশপ্রসাদ যতগুলি স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছিলেন, তাহাতেই যথেষ্ট হইতে পারিত, তথাপি ধীরেন্দ্রনাথ আপনার সিন্দুক হইতে আরও কতকগুলি বাহির করিয়া লইতে ইচ্ছা করিলেন। যথাস্থান হইতে চাবি লইলেন,—সিন্দুক খুলিলেন, ডালা তুলিলেন, দেখিলেন,—একখানি পত্র রহিয়াছে। কৌতূহল বৃদ্ধি

হইল। তাড়াতাড়ি পত্রখানি বাহির করিয়া লইলেন। দেখিলেন, পত্রখানি তাঁহা-রই নামে লিখিত। বিস্মিত হইলেন। কে তাঁহার সিন্দুকের মধ্যে পত্র রাখিল, কে তাঁহার সিন্দুক খুলিল, প্রথমে এই ভাবনায় কতকটা চঞ্চলচিত্ত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণে সে বিষয় পরিহার করিয়া পত্রখানি পাঠ করিলেন। অত্যন্ত বিষণ্ণ হই-লেন। চিন্তার উপর চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। আবার পঠিত পত্র পড়িতে লাগিলেন,—

"প্রাণাধিক প্রিয়তম !

এই হতভাগিনী হিরণ্ময়ী তোমাকে পাইল না। ইহার আশা, ভরসা, আনন্দ প্রভৃতি সমস্তই তুমি, কিন্তু, সে সমস্তই ফুরাইল! প্রাণেশ্বর! তবে বল দেখি, আমি কি করিয়া জীবিত থাকিতে পারি? অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কোনমতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না।—বর্ষার নদী-প্রবাহ-উচ্ছ্বাসের ন্যায় আমার অনন্ত যন্ত্রণা প্রতিপলে বাড়িয়া উঠিতেছে,—আমার আর নিস্তার নাই। আমি কোনমতে আর এখানে থাকিতে পারিলাম না। চলিলাম—চিরকালের জন্য চলিলাম—চিত্তচাঞ্চল্য ও দারুণ যন্ত্রণার উপশম করিবার জন্য ভাগীরথী-গর্ভে এই হতাশ প্রাণ ও দগ্ধ শরীর বিসর্জ্জন দিতে চলিলাম! প্রাণনাথ! যদিও পিতা মাতা তোমার সহিত আমাকে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ করেন নাই বটে, কিন্তু আমি তোমাকে বহুদিন পূর্ব্বে মনে মনে বরণ করি-য়াছি। তুমিই আমার স্বামী—তুমি ব্যতীত আমার আর পতি নাই। এই জন্যই আমি প্রাণত্যাগ করিতে চলিলাম। প্রাণত্যাগ ব্যতীত এক্ষণে আমার আর কিছুই নাই। নাথ! আমি তোমার নিকট অনেক অপরাধে অপরাধিনী, এক্ষণে আমার প্রতি দয়া করিয়া সমস্ত অপরাধ ভুলিয়া যাও—ক্ষমা কর। তুমি যে আমার জন্য দুঃখিত হইয়াছ, তাহা জানি;—বড় দিদিও যে আমার নিমিত্ত অনেক করিয়াছেন, তাহাও অবিদিত নহি। কিন্তু আমার ভাগ্য-লিপির মর্ম্ম জানি না। কিন্তু না জানিয়াও, এক্ষণে জানিতে পারিয়াছি। কি?—ভাগীরথী-গর্ভে দুর্ভাগিনী হিরণ্ময়ীর মৃত্যু। হৃদয়েশ্বর! আমার শপথ, তুমি আমার জন্য আর দুঃখ করিও না;—বড় দিদিকে বিবাহ করিও।

তোমারই হতভাগিনী কিঙ্করী

হিরণ্ময়ী।"

ধীরেন্দ্রনাথ উপর্য্যুপরি এই পত্রখানি দুই বার পড়িয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন। একবার ভাবিলেন, জগদীশপ্রসাদকে এ বিষয় জানাইবেন। আবার ভাবিলেন, না, যে ভাবে পত্রখানি লিখিত হইয়াছে, ইহা কোন মতেই তাঁহাকে দেখান যাইতে পারে না। এক পত্রে প্রণয় ও মৃত্যুর কথা, সুতরাং এ পত্র এক্ষণে ধীরেন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কাহারই পাঠ করা উচিত নহে। ধীরেন্দ্রনাথ কিরণময়ীকেও ইহার বিন্দু বিসর্গ কিছুই বলিলেন না। আর বেশীক্ষণ কাল বিলম্ব না করিয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলি ও পত্রখানি সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রস্থানের সময় জগদীশপ্রসাদ কএক জন লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে বলিলেন, কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ লইলেন না। বলিলেন, "মহাশয়! আপনি যে কএক জন লোককে আমার সঙ্গে দিবেন বলিতেছেন, বরং তাহাদের প্রত্যেককে প্রত্যেক দিকে পাঠাইয়া দিন্। এক্ষণে এরূপ করিয়াই অনুসন্ধান করা উচিত।"

জগদীশপ্রসাদ তাহাই স্বীকার করিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ চলিয়া যাইবার পর, জগদীশপ্রসাদ কএক জন লোক লইয়া আর এক দিকে প্রস্থান করিলেন। পুরুষ মানুষ সম্বন্ধে বাড়ী প্রায় খালি হইয়া গেল।

জাহ্নবী দেবী, কিরণময়ী ও অন্যান্য পরিজনেরা হিরণ্ময়ীকে হারাইয়া কিরূপ অধীর হইয়া শোক পরিতাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বিপদের উপর বিপদ।

কিরণময়ীর সহিত ধীরেন্দ্রনাথের বিবাহ-ঘটনা যে, এক্ষণে স্থগিত রহিল, তাহা পাঠক মহাশয়কে বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, দেখিতে দেখিতে পাঁচ ছয় দিন গত হইল, তথাপি কেহই আসিলেন না। কে যে কোথায় গিয়া কিরূপে হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহা কেমন করিয়া জানিব। এ পর্য্যন্ত জগদীশপ্রসাদ বা ধীরেন্দ্রনাথেরও দেখা নাই।

এ দিকে কিরণময়ী হিরণ্ময়ীর জন্য এতদূর উৎকণ্ঠিত ও বিষণ্ণ হইলেন যে, তাঁহাকে দেখিয়া অশোকেরও শোকোদয় হয়। তাঁহার আর সে কান্তি নাই, সে মূর্ত্তি নাই, সে প্রাণ নাই এবং সে মন নাই। ফল কথা সুখের সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই নাই। তিনি এক্ষণে বর্ষার মেঘের ন্যায়, অমাবস্যার অন্ধকারের ন্যায়, প্রভাতের চন্দ্রের ন্যায় এবং বিকারগ্রস্ত রোগীর যন্ত্রণার ন্যায় হইলেন। আহার নিদ্রার সঙ্গে তাঁহার আর সম্পর্ক রহিল না। তিনি সর্ব্বদাই হতাশের ন্যায় আক্ষেপ করেন, উন্মাদিনীর ন্যায় রোদন করেন। কএক দিন ধরিয়া এইরূপ আক্ষেপ ও রোদন করিতে করিতে তাঁহার ভাবান্তর ঘটিল। হিরণ্ময়ীকে না দেখিয়া তাঁহার আর কিছুই ভাল লাগিল না।—হিরণ্ময়ীর প্রস্থানের সপ্তম দিনে তিনি একখানি পত্র লিখিয়া মাথার বালিসের নীচে রাখিয়া, রাত্রিকালে কোথায় চলিয়া গেলেন। এরূপ ভাবে চলিয়া গেলেন যে, কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। একে এই বিপদ, তাহার উপর আবার কিরণময়ীর বাটীপরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান, ইহা যে কি পর্য্যন্ত শোচনীয় ও বিষম ঘটনা, তাহা পাঠক মহাশয়কে বুঝাইতে হইবে না। কিরণময়ী কি অভিপ্রায়ে যে, কাহাকে কিছু না বলিয়া সকলের অলক্ষ্যে চলিয়া গেলেন, তাহার গূঢ় মর্ম্ম এখনও বুঝিতে পারিলাম না। তিনি তাঁহার প্রাণাধিকা কনিষ্ঠা ভগিনী হিরণ্ময়ীকে যার পর নাই ভালবাসিতেন বলিয়াই কি ভগিনী-বিরহে প্রাণত্যাগ করিতে গেলেন?—হিরণ্ময়ীর যে গতি, তাঁহারও কি তাহাই ঘটিল? হইতে পারে;—ঈশ্বর জানেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। সকলে গাত্রোত্থান করিল। প্রাণোপমা কনিষ্ঠা কন্যা-বিরহে যন্ত্রণাময়ী শোকমূর্ত্তি জাহ্নবী দেবীও গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি রাত্রিকালে নিদ্রা যান নাই, কেবল শয্যার এ-পাশ ও-পাশ করিয়া সময় কাটাইয়াছেন। দুর্ভাগ্যবতী জাহ্নবীর দুঃখে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। এ জাহ্নবী যেন আর সে জাহ্নবী নহেন। দেখিলে চিনিয়া উঠা দুষ্কর। হিরণ্ময়ীর বিরহে তাঁহার জীবন ধারণ করা একশেষ কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।

জাহ্নবী দেবী গাত্রোত্থানের পর যেমন তেমন করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক কিরণময়ীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য একটি দাসীকে পাঠাইলেন। দাসী কিরণময়ীর গৃহে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "তিনি

গৃহে নাই।” জাহ্নবী আর কিছু বলিলেন না। ভাবিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে কিরণময়ী তাঁহার নিকট আসিবেন।

বেলা বাড়িল, তথাপি কিরণময়ী আসিলেন না, তখন জাহ্নবী আপনি কিরণময়ীর কক্ষে গমন করিলেন। পূর্ব্বোক্ত দাসী তাঁহার হস্তধারণ করিয়া লইয়া গেল। কিরণময়ীর কক্ষ শূন্য। জাহ্নবী দেবী দুই চারি বার “কিরণ—কিরণ” বলিয়া ক্ষীণোচ্চস্বরে ডাকিলেন, কিন্তু সাড়া শব্দ পাইলেন না। তিনি বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না—কিরণময়ীর শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন। কিরণময়ীর আগমন অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অন্যমনস্কতার সহিত কিরণময়ীর মাথার বালিস্ উল্টাইয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, একখানি পত্র রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি উহা উঠাইয়া লইলেন। দেখিলেন, উহার উপরে লেখা আছে, “পরমপূজনীয়া শ্রীযুক্তা মাতা ঠাকুরাণী মহোদয়া শ্রীচরণ-কমলেষু—”। জাহ্নবী দেবী সমুৎসুকচিত্তে পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন,—

“মা!—আমি হিরণ্‌কে হারাইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। প্রত্যেক নিমেষে আমার প্রাণ, মন, শরীর অবসন্ন হইতেছে। আমি কোন মতে স্থির থাকিতে পারিতেছি না। পিতা, ধীরেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য সকলে হিরণের অনুসন্ধানের জন্য গিয়াছেন।—আমিও চলিলাম। আপনাদিগকে বলিলে যাইতে দিবেন না বলিয়াই আমি গোপনে চলিলাম। যদিও এ কার্য্য অত্যন্ত গর্হিত, কিন্তু, মা! আমি যে তোমার স্নেহের এবং আমার প্রাণের হিরণ্ময়ীকে খুঁজিতে চলিলাম। এরূপ কার্য্যে কোন দোষ নাই, বরং কর্ত্তব্যজনিত মহাপুণ্য আছে। যদি আমি হিরণ্ময়ীকে পাই, গৃহে ফিরিয়া আসিব, ~~তা নহিলে আসিব না।~~ না পাইলেও ফিরিয়া আসিব।* আপনি ভাবিবেন না। আশীর্ব্বাদ করুন যেন দুই ভগিনী এক সঙ্গে আসিয়া আপনার ক্রোড়ে উপবেশন করিতে পারি। ঈশ্বর আপনার দুশ্চিন্তা এবং আমাদের বিঘ্ন নিবারণ করুন, ইতি। আপনার স্নেহপালিতা

কিরণময়ী।”

---

* কর্ত্তিত অংশটুকু কিরণময়ীর মনের প্রকৃত ভাব, কিন্তু মাতার পাছে কোন বিপদ ঘটে, এই ভাবিয়া কর্ত্তিতাংশের পরে শেষাংশটুকু লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

জাহ্নবী দেবী এই পত্রখানি পাঠ করিয়া চমকিয়া উঠিলেন, কাঁদিয়া ফেলিলেন।

দাসী নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, সেও চমকিয়া উঠিল, বলিল, "মা ঠাকুরাণি! কি হইয়াছে?"

জাহ্নবী দেবী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে!—কিরণময়ীও কাল রাত্রিকালে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে! হায় হায়, আমার বিপদের উপর বিপদ!"

দাসী এই কথা শুনিয়া, "অ্যাঁ—সে কি! এ কি হইল!" বলিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও দুঃখিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "তিনি কোথায় গিয়াছেন?"

জাহ্নবী সরোদনে বলিলেন, "পত্রে ত লেখা আছে, হিরণ্ময়ীকে খুঁজিতে গিয়াছে। কিন্তু আমার তা'ত বিশ্বাস হয় না। কি জানি, কি ঘটিতে কি ঘটে! পোড়া বিধি রে, আমার কপালে এতও লিখেছিলি!" এই বলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। একে শরীর ও মন অস্থির হইয়াছিল, তাহার উপর এই দুর্ঘটনা। জাহ্নবী যেন জীবন্মৃতা হইলেন। পাঠক! জাহ্নবী দেবীর ন্যায় এরূপ বিপদ্‌গ্রস্তা নারী, বোধ হয়, পূর্ব্বে কখন নয়ন-গোচর করেন নাই।

দগ্ধভাগ্যা জাহ্নবীর রোদন-নিনাদে এক এক জন করিয়া বাড়ীর সমুদয় লোক সেখানে উপস্থিত হইল। সকলেই অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল—কাঁদিতে লাগিল। যদিও পত্র পাইয়া কিরণময়ীর প্রস্থানবার্ত্তার সন্দেহ রহিল না, তথাপি সকলে বাড়ীময় কিরণময়ীকে খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই হইল না।

জগদীশপ্রসাদ, ধীরেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য যাঁহারা হিরণ্ময়ীর অন্বেষণে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এই নূতন বিপদের কিছুই জানিতে পারিলেন না। যদি হিরণ্ময়ী আজিও কোন স্থলে গিয়া জীবিত থাকেন, তিনিও ইহার কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না। এক বিবাহ লইয়াই এই ভয়ঙ্কর ঘটনা দুইটি ঘটিল।

প্রাণাধিকা কন্যা দুইটিকে হারাইয়া জাহ্নবী দেবী এতদূর শোকাচ্ছন্ন ও চিন্তাজর্জ্জরিত হইলেন যে, তাঁহাকে উৎকট রোগগ্রস্ত হইতে হইল। সে রোগ হৃদ্‌রোগ, অত্যন্ত সাংঘাতিক! সনাতন ধন্বন্তরি বিশেষরূপে জাহ্নবী দেবীর চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। ক্রমশই রোগের বৃদ্ধি, ক্রমশই শরীর ক্ষয়, এবং ক্রমশই জীবনীশক্তির বিলোপ হইয়া আসিল। ধন্বন্তরি মহাশয় বুঝিতে পারিলেন, জাহ্নবী দেবী এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন না বুঝি।

রোগ এতদূর পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল যে, তদ্দ্বারা জাহ্নবী দেবী কখন অচেতন হইয়া যান, কখন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করেন, কখন আত্মঘাতিনী

হইতে যান। তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বাটীস্থ সকলেই আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু আর উপায় নাই। এক দিন ঠিক মধ্যাহ্নের পর তিনি সেই নিদারুণ হৃদরোগের অসহ্য যন্ত্রণায় এরূপ অভিভূত হইলেন যে, তাঁহার চৈতন্য, স্পন্দ, নাড়ীগতি সমস্তই বিলুপ্ত হইল। নিকটস্থ পরিচারিকারা তদ্দর্শনে ভীত হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কোন বাচনিক বা ইঙ্গিত উত্তর পাইল না। তৎক্ষণাৎ সকলে তাঁহার হস্ত পদ স্পর্শ করিয়া দেখিয়া চীৎকার শব্দে কাঁদিয়া উঠিল। পরিচারিকাদিগের রোদননিনাদে বাটীস্থ অন্যান্য ব্যক্তিরা দৌড়িয়া আসিল। পরিচারিকাদিগের মুখে সমস্ত শুনিয়া, আপনারাও ভাল করিয়া দেখিল। দেখিয়া সকলে হাহাকার করিয়া শোকবিলাপ করিতে লাগিল। সকলেরই মুখে "হায় হায়, কি হইল! গৃহিণী ঠাকুরাণী আমাদিগকে ছাড়িয়া চিরকালের জন্য চলিয়া গেলেন! এইরূপ ও অন্যরূপ নানাবিধ শোকবাক্য নিঃসৃত হইতে লাগিল। এইরূপে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। জগদীশপ্রসাদের মাতুলপুত্র প্রভৃতি সমস্ত আত্মীয়-গণ হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধানে চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং হরিহর দেওয়ান মহাশয় বাটীস্থ চারি পাঁচ জন প্রতিপালিত ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া আনিলেন। তাহারা তাঁহার আদেশে জাহ্নবীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনার্থ তদীয় দেহ লইয়া ভাগীরথী তীরে গমন করিল। সঙ্গে সঙ্গে দুই জন ভৃত্যও চলিল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মহাবিপদ।

জাহ্নবী দেবীর এই দুর্ঘটনার এক মাস পরে জগদীশপ্রসাদ সঙ্গীদিগকে লইয়া নিজ বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহারা যে কএক জন গিয়াছিলেন, সকলেই ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে হিরণ্ময়ী নাই। অনেক অনুসন্ধান করা হইয়াছিল, কিন্তু হিরণ্ময়ীর দেখা পাওয়া যায় নাই। আর যাহারা যে দিকে গিয়াছিল, তাহারা কিছু পূর্ব্বেই ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। কেবল ধীরেন্দ্রনাথ আজিও আসেন নাই।

জগদীশপ্রসাদ বাটীতে আসিয়া শুনিলেন, কিরণময়ীও হিরণ্ময়ীর অনু-সন্ধানের জন্য, কাহাকে কিছু না বলিয়া, গোপনে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন এবং কন্যা দুইটির নিদারুণ শোকে তদীয় সহধর্ম্মিণী জাহ্নবী দেবী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! জগদীশপ্রসাদ এই দুইটি অশুভকর সংবাদ শ্রবণে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। হৃদয়ের অন্তস্তল ফাটিয়া একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস বহির্গত হইল। প্রাণ মন নিরতিশয় আকুল হইয়া উঠিল। তিনি করে মস্তক চাপিয়া অধো-

মুখে ভাবিতে লাগিলেন। নয়নযুগলে অশ্রু দেখা দিল। যাহারা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল, তাহারাও অত্যন্ত বিষণ্ন হইল।

অনেকক্ষণ এইরূপে কাটিয়া গেল। অনন্তর জগদীশপ্রসাদ কিরণময়ীর লিখিত পত্রখানি পাঠ করিয়া বিমর্ষবদনে তাঁহার আত্মীয়স্বজনকে বলিলেন, "আর না—আর আমি এখানে থাকিব না। আমার দগ্ধভাগ্যের ফল এতদিনে পূর্ণাংশে ফলিল! বিধাতা আমার কপালে যে এতদূর দুর্ঘটনার বিষয় লিখিয়াছিলেন, তাহা অদ্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। হা জগদীশ্বর! তোমার মনে এই ছিল!" এই বলিয়া আবার নীরবে ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী, পিতৃস্বসা, মাতুলানীদ্বয় নিকটে আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গৃহমধ্যে আবার ক্রোন্দনধ্বনি উথলিয়া উঠিল।

জগদীশপ্রসাদ কিয়ৎকাল পরে সদুঃখে বলিতে লাগিলেন, "এ জন্মের মত মধুপুর পরিত্যাগ করিব। আমার যাহা কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে, তৎসমুদয় যথাক্রমে আমার দুই জন ভাগিনেয়, পাঁচ জন মাতুলপুত্র এবং তোমাদিগকে অংশ করিয়া দিতেছি। আমি ধীরেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত স্নেহ করি, তাহাকেও সমান অংশের এক অংশ দিব। কাগজ কলম আনয়ন কর, দেওয়ানকে ডাক, আমি এক্ষণেই এই কার্য্য সমাধা করিয়া মধুপুর পরিত্যাগ করিব। কষ্টকর জীবনের শেষ ভাগটা কাশীধামে অতিবাহিত করিব। এখানে আর থাকিব না—বড় যন্ত্রণা! আমি এক্ষণে সন্ন্যাসী, আমার তীর্থবাসই উপযুক্ত। আমি মহাপাপী, তা' নহিলে আমাকে কিজন্য এরূপ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক তাপে তাপিত হইয়া কাঁদিতে হইবে! আমার এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত তীর্থস্থান ব্যতীত এখানে হইবার নহে।" এই বলিয়া আরও কত বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তাৎকালিক আবয়বিক ও মানসিক অবস্থা দেখিলে, জগতে যে কেহই সুখী নহে, তাহাই প্রতীয়মান হয়। জগৎ যে অসহ্য যন্ত্রণার আকর, তাহা জগদীশপ্রসাদ বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলেন। জগতে মনুষ্যই যে কেবল অশেষরূপ যন্ত্রণার উপাদানে নির্ম্মিত তাহা জগদীশপ্রসাদের হৃদয়ঙ্গম হইল। মনুষ্যের বিপৎপাতের সংখ্যা যে অগণ্য, তাহা হতভাগা জগদীশপ্রসাদ দেখিতে পাইলেন। আজ জগদীশের হৃদয় যন্ত্রণার আগ্নেয় গিরি, মন শোকের বিশাল সমুদ্র। আজ জগদীশ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হতভাগ্য।

জগদীশপ্রসাদের আদেশে একজন দাসী হরিহর দেওয়ানকে ডাকিতে গিয়াছিল। যাইবার পথে সে দেওয়ানজীর দেখা পাইল। হরিহর তখন জগদীশপ্রসাদের নিকট আসিতেছিলেন। দাসী তাঁহাকে কর্ত্তা মহাশয়ের সমস্ত কথা জানাইয়া, সঙ্গে করিয়া আনিল। জগদীশপ্রসাদ হরিহর দেওয়ানকে বিষয় বিভাগ ও কাশীবাসী হইবার কথা বলিলেন। দেওয়ানজী

সমস্তই দুঃখিতচিত্তে শুনিলেন। শুনিয়া বলিলেন, "মহাশয়! বিপদের সময়, ওর নাম কি, অত উতলা হইবেন না। আপনি পরম বিজ্ঞ, আপনাকে আমার বলাই বাহুল্য। ওর নাম কি, আপনি অন্য ব্যক্তিকে বিপদের সময় কত বুঝাইয়া থাকেন, তবে নিজে কেন এত অধীর হইতেছেন?"

জগদীশ বলিলেন, "পরকে বুঝান সহজ, কিন্তু নিজেকে নিজে বুঝান বড় কঠিন। আমি আর এখানে থাকিব না—এ শ্মশানে কে থাকিতে চায়?

দেওয়ান্‌জী দেখিলেন, কর্ত্তা মহাশয় অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়াছেন। কিন্তু কোনমতে তাঁহাকে সুস্থির করিতে হইবে, তাহা না হইলে সংসারটি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "মহাশয়! আপনার মনে যাহা ভাল বলিয়া বিবেচিত, ওর নাম কি, তাহাই করুন, কিন্তু হঠাৎ এরূপ করাটা কর্ত্তব্য নহে। বিধাতার বিড়ম্বনায়, ওর নাম কি, গৃহিণী ঠাকুরাণী দেহত্যাগ করিয়াছেন, মনুষ্যে তাহার কি করিতে পারে? কিন্তু, ওর নাম কি, কিরণময়ী ত ফিরিয়া আসিবেন, লিখিয়া গিয়াছেন। আর ধীরেন্দ্রনাথ আজিও প্রত্যাগত হন নাই। ওর নাম কি, তিনিও ত হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়া আসিবেন। ওর নাম কি, তাঁহার আগমনকাল পর্য্যন্ত আপনি সুস্থির হইয়া থাকুন, তাহার পর, ওর নাম কি, কাশীবাসী হইবেন।"

জগদীশপ্রসাদ অধোমুখে দেওয়ানজীর কথাগুলি শুনিলেন। শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তাই থাকি। কিন্তু কিরণ্ হিরণকে কি আর পাইব! হা, আমি কি হতভাগ্য। স্ত্রী কন্যা সকলই হারাইলাম! হা বিধাত!" এই বলিয়া কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিলেন। আবার বলিলেন, "আচ্ছা, দেওয়ান্‌জী! আমি ধীরেন্দ্রনাথের আগমনকাল পর্য্যন্ত কষ্টেসৃষ্টে যা হউক করিয়া থাকিলাম, কিন্তু কন্যা দুইটির সুসংবাদ না পাইলে, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই করিব।"

অনন্তর হরিহর দেওয়ান্ জগদীশপ্রসাদকে স্নান আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। জগদীশ তাঁহার কথা রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু সকলই অতৃপ্তি ও অনিচ্ছার সহিত। সে দিন গত হইল, তাহার পর এক দুই করিয়া কত দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। জগদীশপ্রসাদ হতাশহৃদয়ে ধীরেন্দ্রনাথের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। হিরণ কিরণকে পাইবার আশা নাই, কেবল ধীরেন্দ্রনাথের মুখে হিরণ্ময়ীর শেষ সংবাদটি জানিবার জন্য শ্মশান সদৃশ ভবনে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ইতি প্রথম খণ্ড।

গল্পকল্পতরু—(প্রথম কুসুম)

হিরণ্ময়ী

(উপন্যাস)

[দ্বিতীয় খণ্ড]

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত।

আশুতোষ ঘোষ এবং কোম্পানি কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ]

আল্‌বার্ট প্রেস্।
৪৬নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কর্ণবালিস ষ্ট্রীট,
বাহির সিমলা,—কলিকাতা।

শ্রাবণ,—১২৮৭।

মূল্য এক টাকা।

বঙ্গসাহিত্যসমালোচনীসভাপ্রতিষ্ঠাতা

সাহিত্যজীবন

গুণিগণগুণগ্রাহী গুণিপ্রবর

শ্রীযুক্ত কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

ভাওয়ালাধিপতি মহোদয় করকমলেষু—

কুমার !

আমি পূর্ব্বে কখন গদ্যে কোন উপন্যাস-গ্রন্থ রচনা করি নাই, এক্ষণে এ বিষয়ে এই "হিরণ্ময়ী"ই আমার প্রথম সৃষ্টি। আমি অন্য কোন ভাষা-বিরচিত কোনরূপ উপন্যাসের আদ্যোপান্ত বা কোন অংশ অবলম্বন করিয়া ইহা প্রণয়ন করি নাই। আমার সামান্য কল্পনায় যেমন আসিল, তেমনি করিয়া গল্প সাজাইয়া, ইহা বিরচিত হইল; সুতরাং কি যে হইল, তাহা বলিতে পারি না। অপরের নিকট ইহা "কিছুই নয়" হইলেও, আমি আপনার নিকট সেরূপ হইবার আশা করি না। কেন না, আপনি আমার পরম উপকারী—আমি আপনার নিকট নিতান্ত উপকৃত; আপনি আমাকে সবিশেষ অনুগ্রহ করেন—আমি আপনাকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করি, সুতরাং আপনার নিকট ইহা "কিছুই নয়" হইবার নয়। এই ভরসাতেই আমি আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত আপনার করকমলে "হিরণ্ময়ী" অর্পণ করিলাম। আপনি সহৃদয় ও উদার, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিবেন।

আপনার নিতান্ত অনুগত

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

কলিকাতা।

২৭এ শ্রাবণ, ১২৮৭

গল্পকল্পতরু।

[প্রথম কুসুম]

হিরণ্ময়ী।

(উপন্যাস)

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

অরণ্যে।

হিরণ্ময়ী সেই গভীর নিশীথে পিতৃভবন হইতে নির্গত হইয়া বরাবর সম্মুখের পথ ধরিয়া যাইতে লাগিলেন। অনেক দূর চলিয়া গেলেন, কোন ব্যক্তি তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল না। শীতল সমীরণ আস্তে আস্তে চারিদিকে খেলিতেছিল। তাহার সেই খেলায় পথপার্শ্বস্থ ঝাউগাছগুলি সাঁই সাঁই করিয়া নিস্তব্ধতার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে এক এক স্থানে এক একটি বৃক্ষশাখে এক একটি পাখী পক্ষশব্দ করিয়া কিচির মিচির করিতেছিল। এক এক স্থানে ঝিল্লিকুল ঝিঁ ঝিঁ শব্দে নীরব স্থল শব্দিত করিতেছিল। এই কয়েক প্রকার শব্দ সত্ত্বেও নৈশ প্রকৃতি যেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। হিরণ্ময়ী সহসা এখানে সেখানে ভিন্নরূপ শব্দ শুনিয়া এক এক বার ভীত ও চমকিত হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু সম্মুখ মৃত্যু তাঁহাকে সে ভয় ও চমক হইতে ভরসা প্রদান করিতে লাগিল। সেই জন্যই তিনি সেই সকল শব্দের দিকে লক্ষ্য করিয়াও করিলেন না।

কি আশ্চর্য্য, যে হিরণ্ময়ী বালিকা বলিলেই হয়, সেই হিরণ্ময়ী এক্ষণে বীররমণীর ন্যায় সাহসে ভর করিয়া চলিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশীয় কত শত পুরুষে যে কার্য্য করিতে ভীত হয়, আজ কি না একটি অবলা বালিকা তাহাই করিতে লাগিলেন—গভীর নিশীথে চলিতে লাগিলেন। মানুষের যে মন একবার আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, সেই মন আবার ঘটনা-চক্রের নিষ্পীড়নে একশেষ সাহসিকতা প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমাদের বিবেচনায় ভয় কিছুই নয়—ভরসা বা সাহসও কিছুই নয়—মনের ভাবান্তর মাত্র। এক্ষণে হিরণ্ময়ীরও তাহাই হইয়াছে।

হিরণ্ময়ী বরাবর যাইতে যাইতে এতদূর অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন যে, কোন্ দিকে যাইতেছেন, তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। কতক দূর গিয়া বাম দিকে অপেক্ষাকৃত একটি অপ্রশস্ত পথ দেখিতে পাইলেন। মনে করিলেন, সেই দিক দিয়া ভাগীরথী-তীরে যাওয়া যায়। মনে করিয়াই উহা কার্য্যে পরিণত করিলেন। হিরণ্ময়ী তাঁহার মাতার সহিত পাল্কী করিয়া কএক বার ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কোন্ পথ দিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা জানিতেন না। কেবল বাটী হইতে বড় রাস্তার কিয়দ্দূর তাঁহার জানা ছিল। অদ্য রজনীতে সেই পথেরই কতক দূর আসিয়াছেন, কিন্তু তাহার পর বামে কি দক্ষিণে যাইতে হইবে, তাহা জানিতে পারিলেন না। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সেই অপ্রশস্ত পথে প্রবিষ্ট হইলেন।

সেই পথ দিয়া কতক দূর গমন করত আবার দুই দিকে দুইটি সূক্ষ্ম পথ দেখিতে পাইলেন। এইবার মহাসঙ্কট উপস্থিত,—কোন্ পথে যাইবেন, ভাবিয়া অস্থির। কোন লোক নাই যে, জিজ্ঞাসা করেন। আপনার মনকে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়া দক্ষিণ দিকের পথে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই পথটা এত বন্ধুর ও অপরিষ্কৃত যে, তাঁহাকে অনেক বার পদস্খলিত হইয়া পতিত হইতে হইয়াছিল—অনেকবার পায়ে কাঁটা ফুটিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে হিরণ্ময়ী সেই কষ্টকর বর্ত্ম পার হইয়া গ্রামের সীমান্তে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার পশ্চাৎ দিকে মধুপুর এবং সম্মুখভাগে একটা বৃহৎ মাঠ। [illegible] মধ্যস্থলে অভাগিনী হিরণ্ময়ী। পথ-অনভিজ্ঞা

হিরণ্ময়ী কিয়ৎক্ষণ সেই খানে দাঁড়াইয়া রহিলেন; ভাবিলেন, কোন্ দিকে যাইবেন?—ভাবিলেন, ভাগীরথী আরও কতদূরে? ভাবিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ঐ যে, মাঠের ঠিক ও পারে গ্রামস্থিতির অপরিস্ফুট চিহ্ন দেখা যাইতেছে, ঐ খানেই ভাগীরথী। ঐ গ্রাম ভাগীরথীর তটে স্থাপিত আছে।" এই ভাবিয়া বরাবর সমান চলিতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ী এ জীবনে একটি দিনের জন্যও এত পথ চলেন নাই। চলিবার প্রয়োজনই বা কি? কিন্তু আজ তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছে। এরূপ প্রয়োজন যেন অতি বড় শত্রুরও না হয়। এরূপ প্রয়োজনের প্রয়োজন নাই। জগৎ হইতে ইহা দূর হইয়া যাউক। কিন্তু ইহা যে যাইবার নয়! যত দিন জগতে নিরাশার খরস্রোত, মনঃকষ্টের অসহ্য ঝঞ্ঝাবাত, চিন্তার মর্ম্মভেদী নিষ্পীড়ন, শোকের অনিবার্য্য নিষ্পেষণ থাকিবে, তত দিন ব্যক্তি বিশেষের এই প্রয়োজনও থাকিয়া যাইবে—কখনই চলিয়া যাইবে না। ধরিতে গেলে সময়ে এই প্রয়োজনই একমাত্র শান্তি। তা নহিলে এই মর্ম্মচ্ছিন্না বালিকা আজ এরূপ কেন? কিন্তু তথাপি আমরা এই প্রয়োজনের নাম শুনিলে কেমন এক রকম হইয়া যাই;—মনের ভিতর, প্রাণের ভিতর যেন কি করিতে থাকে।

জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবী দেবীর প্রাণস্বরূপিণী, কিরণময়ীর নন্দনকানন-সম্ভব পারিজাত কুসুমস্বরূপিণী এবং ধীরেন্দ্রনাথের আশাস্বরূপিণী হিরণ্ময়ী সেই জনশূন্য দূরদিগন্তরেখাঙ্কিত মাঠের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত যাইয়া আর চলিতে পারিলেন না। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইল—পা-দুইটি অবশ হইল। তিনি একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিকট বসিয়া পড়িলেন। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। অবিশ্রান্ত পথ-পর্য্যটনে তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। তিনি জলপান করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইলেন, চারি দিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূরে একটি জলাশয়ের মত কি দেখিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সেই দিকে গমন করিলেন। তাঁহার তাৎ-কালিক সৌভাগ্যক্রমে সেইটি বাস্তবিক জলাশয়ই হইল, কিন্তু গ্রীষ্মকালের নিদারুণ পীড়নে বসুমতী উহার তৃতীয়াংশ জল পান করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অবশিষ্ট যে জল ছিল, তাহাও আবার পঙ্কিল, অস্বচ্ছ। তৃষ্ণাতুরা হিরণ্ময়ী তাহাই কিঞ্চিৎ পরিমাণে পান করিলেন। অতৃপ্তির সহিত পিপাসার এক

রূপ তৃপ্তিলাভ হইল। আবার চলিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে সেই দৃষ্ট গ্রামের সীমায় উপনীত হইলেন। গ্রামটি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে জঙ্গল। সেই ক্ষুদ্র গ্রামের নাম গোপালনগর। কিন্তু হিরণ্ময়ী তাহা জানিতেন না। মধুপুর হইতে গোপালনগর তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী হইবে।

হিরণ্ময়ী গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার আশা বিফল হইল। ভাগীরথী সেই গ্রামটিকে পবিত্র করেন নাই। তিনি আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াও ভাগীরথীকে দেখিতে পাইলেন না। এমন সময়ে পক্ষিকুল ডাকিয়া উঠিল। হিরণ্ময়ী দেখিলেন, আর রাত্রি নাই—উষা আসিয়াছে—পূর্ব্বদিক ঈষৎ পরিষ্কার হইয়াছে। তিনি তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়া গোপনে থাকিবার জন্য ইচ্ছা করিলেন। পাছে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায়—দেখিতে পাইয়া পরিহাস করে—পরিহাস করিয়া অত্যাচার করে, তিনি এই আশঙ্কাতেই এইরূপ ইচ্ছা করিলেন। দক্ষিণ দিকের বনের ভিতর প্রবেশ করিলেন। যতদূর পর্য্যন্ত গমন করিলে কেহই তাঁহাকে দেখিতে না পায়, তিনি ততদূর পর্য্যন্ত গমন করিলেন। এদিকে দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। লোহিত সূর্য্য পূর্ব্ব-গগনে দেখা দিলেন।

জঙ্গলের ভিতর আর প্রকৃত অন্ধকার নাই। এক্ষণে কেবল বন্য বৃক্ষ-পুঞ্জের নিবিড় শ্রেণীসঞ্জাত কৃত্রিম অন্ধকার অবস্থান কবিতে লাগিল। তাহাও আবার অত্যন্ত অপ্রগাঢ়। বন্য বৃক্ষগুলি প্রকৃতিপালিত। প্রকৃতি তাহাদিগকে আপন ইচ্ছায় যেখানে সেখানে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে। একটি বৃক্ষ আর একটি বৃক্ষের শাখার উপর আপনার শাখা স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মূল হইতে একটি বন্যলতা কাণ্ড বাহিয়া উপরে উত্থিত হইয়া, যেখানে উভয় শাখার একত্র সমাবেশ, সেইখানে সাত আট ফেরে জড়াইয়া শীর্ষ ঝুলাইতেছে। তাহার ইচ্ছা, দুইটি বৃক্ষের শাখা বরাবর এইরূপে কালক্ষেপ করিতে থাকুক্। আহা, ঔদ্ভিজ্জ্য প্রণয়ের কি সুন্দর ছবি! মানবজগতে এরূপ দৃশ্য কুত্রাপি আছে কি না সন্দেহ। এক স্থানে বাল্যকাল হইতে একটি অশ্বত্থ এবং একটি বটবৃক্ষ দেহে দেহে এরূপ

সংলগ্ন করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এক্ষণে অতি উচ্চ হইয়াও আর পৃথক হইয়া থাকিতে পারে নাই। পরস্পরের দৃঢ় চাপে পরস্পরের দেহে ক্ষত হইয়াছে, তথাপি কেহ কাহাকে ত্যাগ করিতেছে না। হিরণ্ময়ী এই দুইটি পাদপীয় দৃশ্য দেখিয়া মনে মনে কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে একটি পলাশ বৃক্ষের শাখায় বসিয়া একটি শ্যামা নানাবিধ স্বরচাতুর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক শিশ্ দিল। সেই শব্দ শুনিয়া কিঞ্চিদ্দূরস্থিত ছাতিম বৃক্ষের উপর একটি দহিয়াল্ ডাকিয়া উঠিল। অমনি এদিকে ওদিকে একটি দুইটি করিয়া নানাবিধ বিহঙ্গ নানারূপ শব্দ করিয়া উঠিল। সেই শব্দ সমূহের মধ্যে নীরস ও সরস উভয়বিধই ছিল। যাহাই হউক, বড় মনোহর শব্দ। প্রত্যহ সেই বনের মধ্যে এইরূপ নৈসর্গ-সঙ্গীতের লহরী খেলিয়া থাকে, কিন্তু কয় জন তাহা শুনিতে পায়? যাহারা এই শ্রুতিসুখকর সুমধুর শব্দ শুনে, তাহারাই আবার ইহা উচ্চারণ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা স্বাভাবিক কণ্ঠে এরূপ শব্দ করিতে পারে না, তাহাদের মধ্যে কয় জন ব্যক্তি এই সঙ্গীত-প্রস্রবণ বনভূমিতে প্রবেশ করিয়া থাকে? আজ জগদীশ—জাহ্নবীর নয়নরূপিণী জীবনবিসর্জ্জনোদ্যতা হিরণ্ময়ী সেখানে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে এ হিরণ্ময়ী সে হিরণ্ময়ী নহেন, ইহাঁর এই কর্ণও সেই কর্ণ নহে। এমন মন-ভুলান সঙ্গীতও তাঁহার কর্ণে অমৃত ঢালিতে পারিল না।

হিরণ্ময়ী সারারাত্রি জাগিয়া এবং পর্য্যটন করিয়া, অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার চক্ষুযুগল নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল, এক একটি করিয়া কএকটি হাই উঠিল, গা হাত পা মাটী মাটী করিতে লাগিল। তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। একটি ঘনপত্র তমালবৃক্ষের মূলে অঞ্চলখানি পাতিয়া শুইয়া পড়িলেন। কত কি ভাবিতে ভাবিতে নেত্র দুইটি মুদিয়া আসিল। তাঁহার চিত্তোত্থিত চিন্তাতরঙ্গ ক্রমে ক্রমে ছিন্নভিন্ন ও অসংলগ্ন হইয়া যাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই হিরণ্ময়ী ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব যন্ত্রণানাশিনী নিদ্রা এত গাঢ় হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইল যে, তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া অভিভূত রহিলেন। বাম বাহু উপাধান

হইয়াছে—দক্ষিণ বাহু যদৃচ্ছরূপে শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে—অঞ্চলের কিয়দংশ তাঁহার গাত্রোপরি আছে—কিয়দংশ মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হইতেছে। কিয়ৎ কাল পূর্ব্বে যে হিরণ্ময়ীর চক্ষু বিজন বনদৃশ্য দেখিতেছিল, যে কর্ণ বিহঙ্গ-কূজন শুনিতেছিল, এক্ষণে সে চক্ষু মুদ্রিত—কিছুই দেখিতে পাইতেছে না। এবং সে কর্ণ বধির—কিছুই শুনিতে পাইতেছে না। এক্ষণে হিরণ্ময়ীর চিত্তে নিরাশা, অভিমান, দুঃখ, মরণ-বাসনা প্রভৃতি কিছুই নাই। যতক্ষণ নিদ্রা তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিবে, ততক্ষণ হিরণ্ময়ী সুখিনী ও শান্তিময়ী থাকিবেন। পূর্ব্বদিকের সূর্য্য এখনও পূর্ব্বদিকেই আছে, তবে কি না অনেকটা উপরে উঠিয়াছে। হিরণ্ময়ী ঘুমাইতেছেন। মৃদু মৃদু নিশ্বাস পড়িতেছে। প্রভাত বায়ু তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে। প্রভাত-সূর্য্য স্থলে জলকমল ভ্রমে হিরণ্ময়ীর সুন্দর মুখমণ্ডলে প্রভাত-কিরণ ঢালিতেছে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, বৃক্ষাবলির ব্যবধানবশতঃ রবি রশ্মি সম্পূর্ণরূপে নিদ্রিতা হিরণ্ময়ীর মুখের উপর পড়িতে পারে নাই।

যে বরাঙ্গী হিরণ্ময়ী কারুকার্য্যখচিত পর্য্যঙ্কোপরি তূলগর্ভ শয্যোপকরণে শয়ন করিতেন, হায়, সেই হিরণ্ময়ী এক্ষণে বনভূমির ভিতর বৃক্ষমূলে অঞ্চল-খণ্ড পাতিয়া শুইয়া রহিয়াছেন! পাঠক! ইহাঁর এই শোচনীয় অবস্থা দেখিলে কি মনে হয়? এই মনে হয়,—"চিরদিন কভু কারো সমান না রয়।" মানুষ অদৃষ্টের ক্রীড়াপুত্তলী। অদৃষ্ট তাহাকে যেরূপ করিয়া সংসারক্ষেত্রে ঘুরাইবে, তাহাকে সেইরূপ করিয়াই ঘুরিতে হইবে। কি সাধ্য যে, এক নিমিষের শতাংশের একাংশ কালের জন্যও সে তাহার অন্যথা করিতে পারে? অদৃষ্ট চালক—মানুষ চাল্য। অদৃষ্ট যেরূপ করিয়া তাহাকে চালাইবে, তাহাকে সেইরূপ করিয়া চলিতে হইবে। আজ হিরণ্ময়ীকে সেইরূপ করিয়া চলিতে হইয়াছে। আজ অদৃষ্ট ইহাঁকে ভূতলে শুয়াইয়াছে, কি সাধ্য, ইনি তাহার অন্যথা করিতে পারেন? এখনও যে ইহাঁকে এই চিরচঞ্চল অদৃষ্টের চালনে আরও কি কি রূপে চলিতে হইবে, তাহাই বা কে জানে?

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন।

স্বপ্ন কি? কিছুই না, নিদ্রিত অবস্থায় মনের নিষ্ফল কার্য্য মাত্র। মনুষ্য জাগরণে সর্ব্বদা যাহার চিন্তা করে, নিদ্রিতাবস্থায় সময়ে সময়ে তাহার মন প্রায় তাহাই করিয়া থাকে। আমরা শুনিয়াছি স্বপ্ন-ক্রিয়ার ফল কখন কখন সত্যও হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু উহা কদাচিৎ, বেশীর ভাগই অসত্য। মন কখনই কর্ম্মশূন্য বা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারে না। কাল যেরূপ চির-কর্ম্মক্ষম, মানুষের মনও সেইরূপ। যে দিন মৃত্যু হইবে, সেই দিনই মনের কার্য্য থামিবে, কেন না মৃত ব্যক্তির সহিত মনের কোন সম্বন্ধই নাই। মানুষ মরিলে আত্মার ধ্বংস নাই, কিন্তু মনের ধ্বংস আছে কি না জানি না। জানি না কেন? জানি;—কেন না, মনও যাহা, মানুষও তাহাই। সুতরাং মানুষের ধ্বংস হইলে মনেরও তাহাই ঘটে। একটি পদার্থের নিরবয়ব অংশ মন আর সাবয়ব অংশ মানুষ—উভয়েই ভিন্নাকারে এক পদার্থ। মন এবং মানুষ উভয়েই যে এক বস্তু, দর্শনশাস্ত্র তাহার অনেক প্রমাণ দেখাইয়া দেয়। আমরা তন্মধ্যে একটির উল্লেখ করিব মাত্র। পাঠক মহাশয় তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন। এক জন মানুষকে যদি বলি যে, তোমার মন অত্যন্ত অসরল; তাহা হইলে সে মানুষও অসরল বুঝাইবে না কি? এইরূপ আর একটি মানুষকে যদি বলা যায়, তুমি বড় ভাল মানুষ; তাহা হইলে তাহার মনকেও কি ভাল বলিয়া জ্ঞান করিব না। তাই বলিতেছি যে, মন যাহা, মানুষও তাহা, মানুষ যাহা, মনও তাহা—উভয়ে ভিন্নাকারে একই বস্তু।

হিরণ্ময়ী, নিদ্রিত অবস্থায়, একটি ভয়ানক স্বপ্ন দেখিলেন। তিনি, যেন একটা পর্ব্বতের উপর হইতে, পদস্খলিত হইয়া, নিম্নস্থ সমুদ্রের জলে পড়িয়া গেলেন। ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি তাহা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। হিরণ্ময়ী দেখিলেন, ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে উদ্ধার করিবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া পর্ব্বত হইতে এক লম্ফে সমুদ্রগর্ভে পতিত হইলেন। হিরণ্ময়ী আবার দেখিলেন, এমন সময়ে একটা

উত্তালতরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে পর্ব্বতপার্শ্বস্থ ভৃগুভূমিতে তুলিয়া ফেলিল, কিন্তু তিনি ধীরেন্দ্রনাথকে আর দেখিতে পাইলেন না! ধীরেন্দ্রনাথ অগাধ সলিলে ডুবিয়া গেলেন! হিরণ্ময়ী তদ্দর্শনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন—বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। তিনি ধীরেন্দ্রনাথের বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া আবার যেমন সিন্ধুগর্ভে ঝাঁপ দিতে যাইবেন, অমনি তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

ঘুম ভাঙ্গিবামাত্রই হিরণ্ময়ী চমকিয়া উঠিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, দৃষ্ট বিষয় কিছুই নহে—স্বপ্নের চাতুরী মাত্র। কিন্তু তথাপি তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হয় ত ধীরেন্দ্রনাথ অদ্য প্রাতে তাঁহার পত্র পাইয়া মনের নিদারুণ আক্ষেপে জলে ঝাপ দিয়াছেন বা অন্য কোনরূপে আত্মক্ষতি সংসাধন করিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ কাষ্ঠ-পুত্তলীর ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন! আবার কোথা হইতে উৎকট চিন্তা আসিয়া তাঁহার অন্তঃকরণকে মুহুর্মুহু বিলোড়িত করিয়া তুলিল। হিরণ্ময়ী চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, চক্ষে যেন স্তূপীকৃত অন্ধকার আসিয়া চাপিয়া পড়িয়াছে। নয়নযুগল ছলছল করিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে তন্মধ্যে অশ্রু দেখা দিল। মুখমণ্ডল রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিল। হিরণ্ময়ী এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মনে মনে বলিলেন, "হায়, আমি কেন পত্র লিখিয়া ধীরেন্দ্রনাথের সিন্ধুকে রাখিয়া আসিলাম। এই পত্রই বুঝি আমার কাল হইল। আমি ত মরিবই, কিন্তু আমার ধীরেন্দ্রনাথের কোন বিপদ ঘটিলে সে পাপ কাহাকে অর্শিবে? আমি মহাপাপিনী—আমি পতি-ঘাতিনী। আর না; এ পাপ প্রাণ আর ক্ষণকালের জন্যও বহন করিব না। এই বনের ভিতর দিয়া বাহির হই। গ্রামের ভিতর দিয়া যাইব না। বনের ভিতর দিয়া অপথকে পথ করিয়া চলিয়া যাই। বোধ হয়, ভাগীরথী আর বেশী দূর নয়।" এইরূপ তিনি আপন মনে বিসদৃশ চিন্তা করিয়া জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ী কোথাও বৃক্ষশাখার নিম্ন দিয়া হেঁট হইয়া, কোথাও পতিত বৃক্ষ ডিঙ্গাইয়া, আবার কোথাও বা ঘুরিয়া যাইতে লাগিলেন। গভীর বিষাদে পা আর চলিতে চাহে না। বুকের ভিতর হু হু করিয়া কি যেন পুড়িয়া যাইতে লাগিল।

এ দিক সে দিক যাইতে যাইতে হিরণ্ময়ী জঙ্গলের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, একটি অপ্রশস্ত গ্রাম্য পথ রহিয়াছে। সেই পথটি গ্রাম গ্রামান্তর হইতে হিরণ্ময়ীর গত-রজনী দৃষ্ট গোপালনগরের মধ্যস্থল দিয়া বরাবর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চলিয়া গিয়াছে। গ্রাম্য গোশকটের যাতায়াতের কএকটি চক্রচিহ্ন যেন সরু সরু নালীর মত হইয়া আছে। সেই পথের দুই দিকে নানা জাতীয় বৃক্ষ। কোন বৃক্ষের পত্র, কোন বৃক্ষের কুসুম এবং কোন বৃক্ষের ফল সেই পথটির যেখানে সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে। কএকটি শ্যামলী, ধবলী গাভী ও মঙ্গলী, কালী ছাগী সেই পথটির ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া সেই সকল ভূপতিত পত্রপুষ্প ও পথিপার্শ্বজাত তৃণগুল্ম ভক্ষণ পূর্ব্বক আপন মনে গতায়াত করিতেছে। পথের কোথাও বৃক্ষচ্ছায়া—কোথাও রৌদ্র। কিছু দূরে বহুদূরবিস্তৃত ক্ষেত্রভূমি। হিরণ্ময়ী বন হইতে বহির্গত হইয়া সেই পথের ধারে একত্র বটাশ্বত্থবৃক্ষের মূলে ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর দর্শন লাভ করিলেন। গোপালনগরের পুত্রবতী নারীগণ সেই ষষ্ঠী দেবীকে বড় ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। হিরণ্ময়ী তাহার নিদর্শন পাইলেন। সেই ষষ্ঠী দেবীর হাত, পা, মুখ কিছুই নাই, কেবল এক খণ্ড প্রস্তর মাত্র। তাঁহার সেই হস্তপদশূন্য দেহখানি সিন্দূরে প্রায় আদ্যোপান্ত মণ্ডিত। তাঁহার মস্তকে ও চতুষ্পার্শ্বে শ্বেত, লোহিত, পীত বর্ণের পুষ্পাবলি শোভিত। পার্শ্বে এক খণ্ড শিলাপট্টে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত, সেই সকল গর্ত্তের ভিতর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দুগ্ধ রহিয়াছে। আজ প্রাতঃকালে কোন নবপুত্রবতী পুত্রের মঙ্গল কামনায় দুগ্ধ, পুষ্প, সিন্দূর প্রভৃতি দিয়া দেবীর পূজা দিয়া গিয়াছে।

হিরণ্ময়ী গলাঞ্চল হইয়া ষষ্ঠী দেবীকে প্রণাম করিয়া, কাতরস্বরে কহিলেন "মা ষষ্ঠি! যাহারা সৌভাগ্যবতী, তাহারাই তোমার প্রসাদে পুত্ররত্ন লাভ করিয়া থাকে, এ অভাগিনী এ জন্মে আর তোমার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিল না। মা! আর একটি নিবেদন,—দোহাই তোমার—আমার স্বামীর যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে। আমার স্বপ্ন দেখা যেন মিথ্যা হইয়া যায়। মা জগজ্জননি! এ জন্মে আর আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা হ'ল না। পরজন্মে যেন তাঁহার সাক্ষাৎ পাই। মা! তুমি অন্তর্যামিনী। তোমার অগোচর

কিছুই নাই। তুমি আমার মনের সকল কথাই জানিয়াছ। পর জন্মে তুমিই ধীরেন্দ্রনাথকে আবার আমার স্বামী করিয়া দিও। মা গো! আমি বড় দুর্ভাগ্যবতী। আমার মত অভাগিনী আর কেহই নাই। দেবী ভাগীরথীই এক্ষণে এই দুঃখিনীর দুঃখনিবারিণী।" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার আক্ষেপ ও রোদনধ্বনি কেবল ষষ্ঠী দেবী এবং পক্ষিকুলের কর্ণে প্রবেশ করিল।

হিরণ্ময়ী রোদন করিতেছেন, এমন সময়ে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক গোপালনগরের দিক হইতে সেই পথ দিয়া যাইতে লাগিল। সে ষষ্ঠী দেবীর নিকট একটি দেবাঙ্গনা সদৃশ যুবতীকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। নিকটে আসিয়া কহিল, "হ্যাঁ গা, তুমি কি এই গোপাল নগরের বৌ?"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "না গো, আমি এখানকার কেহই নই। আমার বাড়ী এখানে নয়।"

বৃদ্ধা।—"তবে কোথা তোমার বাড়ী?" হিরণ্ময়ী বৃদ্ধার কথা শুনিয়া ভাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমার বাড়ী গৌরীপুর।" হিরণ্ময়ীর পিতৃনিবাস মধুপুর হইতে চারি ক্রোশ দক্ষিণে গৌরীপুর। জগদীশপ্রসাদের বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনীর শ্বশুরালয় গৌরীপুরে ছিল। হিরণ্ময়ী তাহা জানিতেন। এক্ষণে বৃদ্ধার নিকট ভাঁড়াইয়া সেই গ্রামের নাম করিলেন। কিন্তু এই চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে তিনি এক দিনও গৌরীপুরের মাটী মাড়ান নাই। মধুপুরের নাম করিলে পাছে কোন গোলযোগ ঘটে, এই ভয়েই তিনি ভাঁড়াইলেন।

বৃদ্ধা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা আপনারা?"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "বামুন।"

"তুমি এখানে কেন?"

"মামার বাড়ী যাইব।"

"কোন্ গাঁয়ে তোমার মামার বাড়ী?"

"বিল্বগ্রাম।"

"বিল্বগ্রাম কি?"

"বেল গাঁ।"

"বেলগাঁ?"

"সে গাঁ যে এখান থেকে অনেক দূর।"

"কত দূর?"

"বার তের কোশেরও বেশী হ'বে।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "না—অত নয়।"

বৃদ্ধা বলিল, "তবু দশ এগার কোশের কম নয়।" সে এই বলিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বাপ মা আছে?"

"আছেন।"

"বিয়ে হ'য়েছে?"

"হ'য়েছে।"

"তোমার সোয়ামী কত বড়?"

"চব্বিস বছরের।"

"দেশে আছে না বিদেশে?"

"দেশেই আছেন।"

"তবে তিনি তোমাকে সঙ্গে ক'রে তোমার মামার বাড়ী নিয়ে গেল না কেন?"

"বাড়ীতে আর কেউই নাই, এই জন্যই তিনি আমার সঙ্গে আসেন নি।"

"সে কেমনতর পুরুষ? এত বড় সোমত্ত বৌকে একলা ছেড়ে দিয়েছে।"

হিরণ্ময়ী তৎক্ষণাৎ বুদ্ধি খাটাইয়া বলিলেন, "কেন একলা পাঠাইয়া দিবেন? তিনি আমাকে পাল্কী করিয়া সঙ্গে লোক দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য ক্রমে কাল রাত্রিতে এক দল ডাকাত সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। তাহারা আমাদের উপর চড়াউ হওয়াতে আমার চারি জন পাল্কীবাহক এবং এক জন সঙ্গী আমাকে পাল্কী সমেত ফেলিয়া দিয়া প্রাণভয়ে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। দস্যুরা আমার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে কিন্তু আমি কাঁদিয়া কাটিয়া পড়াতে, স্ত্রীলোক দেখিয়া প্রাণে মারে নাই, ছাড়িয়া দিয়াছে। আমি সারারাত্রি পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আজ এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন কি করি, লোক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া একাকিনীই মামার বাড়ী যাইব।"

বৃদ্ধা এই কথা শুনিয়া নানারূপ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। শেষে বলিল, "আচ্ছা, মা! তুমি যে প্রাণে বেঁচেছ, এই-ই আমার ভাগ্যি। ডাকাতেরা তোমার হাতের বালা আর গলার মুক্তর মালা কেড়ে নেয় নি? দেখ্তে পায় নি বুঝি?"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "আমি ডাকাতদের দূর থেকে দেখেই মুক্তামালা বালা এক সঙ্গে জড়াইয়া একটা গাছের তলায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলাম। তা'র পর তাহারা চলিয়া গেলে আবার এ গুলি কুড়াইয়া লইয়াছিলাম।"

বৃদ্ধা প্রশংসা করিয়া বলিল, "তোমার খুব বুদ্ধি, বাছা! বিপদের সময় বেশ ফিকির খাটিয়েছিলে।"

পাঠক মহাশয় হিরণ্ময়ীর এই বাক্‌চাতুর্য্যব্যাপার দেখিয়া কি মনে করিতেছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু আমরা হিরণ্ময়ীর সব দিক বজায় রাখিবার কৌশলের প্রশংসা করি।

বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। কত সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল। হিরণ্ময়ীর দুঃখে বৃদ্ধার অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক হইল। সে বলিল, "হ্যা দেখ, মা! তুমি যদি আমার কথা শুন, তবে বলি।"

হিরণ।—"কি বলিবে বল।"

বৃদ্ধা।—"তুমি আমার বাড়ী চল। আমি তোমাকে সেখানে দু' তিন দিন রেখে, লোক সঙ্গে দিয়ে তোমাকে তোমার মামার বাড়ী পাঠিয়ে দেব।"

এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। মনে মনে কি ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন, না বাছা! তা হ'লে অনেক বিলম্ব হইবে। আমিই এখন পথে লোক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া মামার বাড়ী যাইব।"

বৃদ্ধা এই কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিল, সে কি গা! মেয়ে লোকের এ কেমন সাহস! তুমি সোমত্ত মেয়ে হ'য়ে কেমন ক'রে এই অচেনা জায়গায় একলা যা'বে? কত রকম মন্দ মানুষ আছে; কা'র মন কি রকম, তা' কি তুমি জান? আমি জেনে শুনে তোমাকে কেমন ক'রে একলা ছেড়ে দি? এখন তুমি আমার সঙ্গে চল। তা'র পর আমি তোমাকে তোমার মামার

বাড়ী পাঠিয়ে দেব। আমি কোন মতেই তোমাকে একলা ছেড়ে দেব না। এ জায়গা ভাল নয়।"

বৃদ্ধার কথায় হিরণ্ময়ীর মনে কতকটা ভয় হইল। এ ভয় আর কিছুই নহে, পাছে কোন দুষ্ট ব্যক্তি তাঁহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করে, এই ভয়। তিনি কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। ভাবিয়া মনে মনে বলিলেন, "এখন এই বৃদ্ধার সঙ্গে যাওয়া কর্ত্তব্য, তা'র পর সুবিধাক্রমে আমার মনোবাসনা পূর্ণ করিব। আমার প্রতিজ্ঞা কখনই বিচলিত হইবে না। যতক্ষণ আমার মনে ধীরেন্দ্রনাথের সেই মনোহারিণী মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিবে, ততক্ষণ আমি দেবী ভাগীরথীকে ভুলিব না।" এই ভাবিয়া বৃদ্ধাকে বলিলেন, "হ্যাঁ দেখ, মা! তবে তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চল।"

বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীর সম্মতি প্রকাশে অতিশয় আহ্লাদিত হইল। অনন্তর উভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বহড়াগ্রামে।

ক্রমে ক্রমে উভয়ে গোপালনগরের সীমা অতিক্রম করিয়া একটা বৃহৎ মাঠ পার হইল। সেই মাঠের পর একটি গ্রাম দেখা দিল। বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে সঙ্গে লইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই গ্রামের মধ্য দিয়া বৃদ্ধার বাড়ী যাইবার পথ।

হিরণ্ময়ী পথপর্য্যটনে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া বৃদ্ধাকে বলিলেন, "ওগো, আমার পা বড় ব্যথা করিতেছে, তুমি এই খানে খানিক বস না।"

বৃদ্ধা সম্মতা হইল। সে তখন হিরণ্ময়ীকে লইয়া একটি পুষ্করিণীর ঘাটে উপস্থিত হইল। পুষ্করিণীটি ক্ষুদ্র। তাহার জলে পানা পড়িয়াছে। জল ভাল নহে, কিন্তু তথাপি তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য ছিল। সেই পুষ্করিণীর চারিধারে কতকগুলি ছোট বড় গাছ ছিল। পাণিকৌড়ী, মাছরাঙ্গা

পাখীরা সেই সকল গাছে বসিয়া জলের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে দুই একটা পাণিকৌড়ী এবং মাছরাঙ্গা অসবল হইয়া পুষ্করিণীর জলে ডুব পাড়িয়া সরল পুঁটী শিকার করিতেছিল। পুষ্করিণীর ঘাটটি ক্ষুদ্র, তাও আবার ভাঙ্গাচোরা। উহার নিম্নভাগ অত্যন্ত জীর্ণ হওয়াতে গ্রামের লোকেরা তালগাছ কাটিয়া ধাপ করিয়া দিয়াছিল।

ঘাটের পার্শ্বভাগে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ দীর্ঘ দীর্ঘ শাখা বিস্তার করিয়া ছায়া করিয়াছিল। বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে লইয়া ছায়াযুক্ত স্থানে উপবেশন করিল। বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীর মুখের দিকে এবং হিরণ্ময়ী পুষ্করিণীর জলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

এমন সময়ে তিনটি স্ত্রীলোক কলসীকক্ষে তথায় উপস্থিত হইল। তাহারা সহসা হিরণ্ময়ীকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। তাহারা রমণী হইয়া হিরণ্ময়ীর ন্যায় রমণী কখনও দৃষ্টিগোচর করে নাই, এইজন্য তাহাদের এত বিস্ময়। তিন জনে হিরণ্ময়ীর মুখের দিকে ছয়টি চক্ষু নিশ্চল ভাবে রাখিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী এক এক বার তাহাদের দিকে আবার এক এক বার জলের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। কোন কথা কহিলেন না।

এ দিকে এই ব্যাপার হইতেছে, ও দিকে বৃদ্ধা অনন্যমনে একটি কাপড়ের পুঁটলী খুলিয়া আবার গুছাইয়া বাঁধিতে লাগিল। তাহার পুঁটলীর ভিতর তিন খানি ছিন্ন মলিন বস্ত্র, চারি আনার পয়সা, ছয় খানি বাতাসা এবং একটি পানের পেতে ছিল। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে বৃদ্ধার পুঁটলী মোচন-বন্ধন কার্য্য সমাপ্ত হইল।

ইত্যবসরে সেই তিনটি স্ত্রীলোকের মধ্য হইতে একজন বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা, বাছা! এই মেয়েটি তোমার কে হয়?" বৃদ্ধা বলিল, "এ মেয়েটি আমার বোন্‌ঝি, বাছা!"

হিরণ্ময়ী এবার অধোমুখী হইলেন।

প্রশ্নকারিণী স্ত্রীলোকটি বলিল, "তোমার বোনের খুব সৌভাগ্যি, তা' নৈলে এমন সাক্ষেৎ লক্ষ্মী তা'র মেয়ে হ'য়ে জন্মায়। এমন মেয়ে বড় মানুষের ঘরেও পেরায় দেখা যায় না।"

দ্বিতীয় রমণী বলিল, “আহা, যেন এক খানি ভগবতী ঠাক্‌রুণের ছবি! এমন রূপ ত কখন দেখিনি, বোন্!”

তৃতীয় রমণী বলিল, “মুখ খানি ত নয়, যেন চাঁদ খানি। কেমন নাক, কেমন চোক, কেমন গোলগাল গাল, কেমন ভুরু, কেমন ঠোঁট দুখানি। আহা, একটি পান দিয়ে মুখ খানি ঢেকে রাখা যায়।”

তাহারা তিন জনে এইরূপে হিরণ্ময়ীর প্রশংসা করিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী বৃদ্ধার কৌশল ও গ্রামবাসিনীদিগের প্রশংসায় কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। তাঁহার সেই ভাবনার মধ্যে এই কথাটিও ছিল,—“বৃদ্ধা বড় বুদ্ধিমতী।”

গ্রামবাসিনী রমণীত্রয় যে কার্য্য সংসাধন করিতে পুষ্করিণীতে আসিয়াছিল, হিরণ্ময়ীকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহা ভুলিয়া গেল। তাহারা স্ব স্ব কলসী ভূতলে রক্ষা করিয়া তথায় উপবিষ্ট হইল।

এইবার হিরণ্ময়ী তাহাদিগের মধ্যে এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্যাঁ গা, এই গ্রামের নাম কি?”

জিজ্ঞাসিতা স্ত্রীলোকটি বলিল, “চণ্ডীপুর।” হিরণ্ময়ী আর কিছু বলিলেন না। তিনি পূর্ব্বে কখন এ গ্রামের নাম শুনেন নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে বলিল, “বেলা বড় বেড়ে উঠ্‌ল; চল, আর গৌণ ক'রে কাজ নেই।”

হিরণ্ময়ী বলিলেন, “তবে চল।”

অনন্তর বৃদ্ধা গ্রামের তিনটি স্ত্রীলোককে “আসি গো মায়েরা” বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। হিরণ্ময়ীও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে গ্রামবাসিনী নারীত্রয় হিণ্ময়ীর রূপ সম্বন্ধে আরও কত প্রশংসা করিতে করিতে জল লইয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে সঙ্গে করিয়া এ মাঠ দিয়া, সে গ্রাম দিয়া, ও বাগান দিয়া যাইতে লাগিল। হিরণ্ময়ী বৃদ্ধার অনুমতি লইয়া আরও কএক স্থানে খানিক খানিক বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

অনন্তর উভয়ে আর একটি গ্রামে প্রবেশ করিল। মধুপুর হইতে এই গ্রাম অনেক দূর।

হিরণ্ময়ী সেই গ্রামের নিকট আসিয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা, এ গাঁয়ের নাম কি?"

বৃদ্ধা হাসিয়া উত্তর করিল, "ও মা! এ গাঁয়ের নাম বহড়া। এই গাঁয়েই আমার বাড়ী। তোমাকে আর হেঁটে হেঁটে পায়ের ব্যথা ভোগ কত্তে হবে না।" এই বলিয়া সে হিরণ্ময়ীকে সঙ্গে লইয়া গ্রামের পার্শ্ব দিয়া যাইতে লাগিল। এক্ষণে বেলা তৃতীয় প্রহর হইয়াছে।

বহড়া গ্রামটি অতি ক্ষুদ্র। চল্লিশ খানির অধিক লোকালয় নাই। তাহাও আবার তৃণাচ্ছাদিত ও অপরিষ্কৃত। এই চল্লিশ খানি গৃহের মধ্যে অধিকাংশই কুটীর, দশ বার খানি গৃহ অপেক্ষাকৃত বড়। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে সকলেই দরিদ্র। তাহার মধ্যেও আবার অধিকাংশ নীচ জাতীয়। গ্রামবাসীদিগের সম্পত্তির মধ্যে কএকটা ডোবা পুকুর। কতকগুলা খর্জ্জুর ও তালবৃক্ষ। এই গ্রামের শিউলিরা এই দুই জাতীয় বৃক্ষ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া থাকে। কাহার কাহার কএকটা করিয়া গরু বাছুর ছাগল মহিষ ও দুই এক খানা ধানজমীও আছে। গ্রামের বাহিরে কিঞ্চিদ্দূরে একটি বড় পুষ্করিণী। উহার চতুষ্পার্শ্বের পাড় উচ্চ। সেই পাড়ের উপর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া এত তালবৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে যে, দূর হইতে দেখিলে একটি গোছাল তালবন বলিয়া ভ্রম জন্মে। পুষ্করিণীর জল অতিশয় পরিষ্কার। জলে মীনবংশেরও খুব বাড়াবাড়ি। বহড়া গ্রামের লোকেরা এই পুষ্করিণীর জল পান করিয়া থাকে। এই পুষ্করিণীর নাম তালপুকুর। কোন্ সময়ে কোন্ ব্যক্তি যে এই পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিল, তাহা বহড়া গ্রামের কেহই জানে না। তথাকার অজ্ঞ লোকেরা বলে, 'এই পুষ্করিণীতে একটা যক্ষ বাস করে। তাহার অনেক ঘড়া টাকা আছে। সে এক এক দিন পাড়ের উপর টাকা বিছাইয়া রাখে। হঠাৎ কোন লোক লোভে পড়িয়া সেই টাকাগুলি লইতে আসিলে সেগুলা পুঁটি মাছের মত তড়াক্ তড়াক্ করিয়া জলে লাফাইয়া পড়ে। পড়িবার সময় ঝন্ ঝন্ করিয়া শব্দ হয়। আর কে আসিয়া সে লোককে জলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলে।'

বহড়া গ্রামের চতুর্দ্দিকে মাঠ। প্রায় এক ক্রোশের মধ্যে অন্য কোন গ্রাম নাই। মাঠের মধ্যে অনেক লোকের ক্ষেত্র ছিল। সেই সকল ক্ষেত্রে ধান্য, কলাই, প্রভৃতি নানাবিধ ফসল উৎপন্ন হইত।

যে বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে সঙ্গে করিয়া বহড়া গ্রামে উপনীত হইল, তাহার বাড়ী গ্রামের সর্ব্ব পশ্চিমে অবস্থিত। বাড়ীর মধ্যে সর্ব্ব সমেত তিনখানি তৃণাচ্ছাদিত গৃহ। পার্শ্বে রন্ধনকুটীর। গৃহ তিনখানি পুরাতন, সুতরাং চালের উপরিভাগের কোন কোন স্থানে ছিদ্র হইয়া গিয়াছিল। গৃহের দেওয়ালগুলি ফাটা। রন্ধনকুটীরটি একপ্রকার যবেস্থবে রক্ষা পাইতেছিল। কিন্তু বৃদ্ধার প্রাঙ্গনটি বেশ পরিস্কৃত। সে বাটীতে অবস্থিতি করিবার সময় প্রত্যহ গোময় ও মৃত্তিকা দিয়া প্রাঙ্গন লেপন করিত। প্রাঙ্গনের মধ্যে উত্তরদিকে দুইটি পেয়ারা এবং পূর্ব্বদিকে একটি আম্রবৃক্ষ ছিল। বৃদ্ধার কপালে পেয়ারা ফল ফলিত, কিন্তু সে কখন বাড়ীর আম্র ভক্ষণ করিতে পায় নাই। তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ আম্রবৃক্ষটিতে একটি বৎসরও আম্র ফলে নাই। কিন্তু সে ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া আশায় পড়িয়া আম্রবৃক্ষটিকে অন্ন প্রস্তুতের যোগাড় করিয়া লয় নাই। বৃদ্ধার আশাই সেই আমগাছটির জীবন, নহিলে কোন দিন তাহাকে তাহার রন্ধনশালার চুল্লীতে ভস্ম হইতে হইত।

বৃদ্ধার সহিত হিরণ্ময়ী তাহার বাটীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বাড়ীর চারিদিকে রাঙচিতা ও বাঘাভেরাণ্ডার বেড়া দেওয়া আছে। হিরণ্ময়ী উপবেশন করিবার পূর্ব্বে বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি বেড়ার ধারে গিয়া রাঙচিতার কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া তাহার আঠা বাহির করিল। পথে আসিবার সময় হিরণ্ময়ীর পায়ে হুঁছট লাগিয়া ও কাঁটা বিধিয়া যে যে স্থানে ক্ষত হইয়াছিল, সে সেই সেই স্থানে আঠা লাগাইয়া দিল। জ্বালা করিতে লাগিল, কিন্তু হিরণ্ময়ী সহ্য করিয়া রহিলেন।

অনন্তর বৃদ্ধা যে গৃহে অবস্থান করে, তাহার দ্বার বদ্ধ তালা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, অনতিবিলম্বে একখানি ছেঁড়া খেজুর চাটাই আনিয়া দাওয়ার উপর বিছাইয়া দিয়া হিরণ্ময়ীকে বলিল, "ব'স' মা। এখানে বেশ বাতাস বই'ছে। এর পর ঘরে বিছানা ক'রে দেব। খানিক গড়ালে পায়ের ব্যথা সেরে যা'বে।"

হিরণ্ময়ী উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিয়া একবার ভাবিলেন, "অবস্থার ন্যায় বহুরূপিনী আর কিছুই নাই।" এই চিন্তার সহিত তাঁহার মনে পিত্রালয়, বৃদ্ধার সামান্য গৃহ, কারুকার্য্য খচিত পশমী উপবেশনবাস ও খর্জ্জূরপত্র বিনির্ম্মিত ছিন্ন চাটাই তাহার মনে যুগপৎ উদয় হইল। তিনি ধীরে ধীরে একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আবার মনে মনে বলিলেন, "এখন আমার সকলই সমান। অল্প সময়ের মধ্যেই আমার অবস্থার আর ইতর বিশেষ থাকিবে না।" মনে মনে এই কথার আন্দোলন করিয়া হঠাৎ অস্ফুটস্বরে আপনা আপনি বলিয়া ফেলিলেন, "ভাগীরথী কোন্ দিকে ?"

বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীর অনতিদূরে বসিয়া মলিন অঞ্চলে নিজের মুখে বাতাস দিতেছিল। হিরণ্ময়ীর এই কথাটি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে তৎক্ষণাৎ বলিল, ভাগীরথীর কথা কেন বল্‌ছ মা ?"

হিরণ্ময়ী তৎক্ষণাৎ মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "ভাগীরথীতে স্নান করিব।"

বৃদ্ধা তাহাই বিশ্বাস করিয়া হাসিয়া বলিল, "বাছা ! তুই পাগল না কি ! ভাগীরথী যে এখান থেকে পনর ষোল কোশ পূবে। তা' আজ ত আর অবেলায় নাওয়া ভাল নয়, কাল শঙ্করীনদীতে নেও। সে নদী এ গাঁ থেকে দু' কোশ উত্তরে। আমি কাল সকালবেলা তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যা'ব। আমিও নদীতে অনেক দিন নাই নি—দু'জনেই নাইব।"

হিরণ্ময়ী ভাগীরথীর দূরত্ব শ্রবণ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে কিসের ভাব উদয় হইল, কিন্তু বৃদ্ধা পাছে জানিতে পারে, এই ভয়ে আত্মসম্বরণ করিলেন। এতক্ষণ পরে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "তাই ত, আমি কোথায় আসিয়া পড়িলাম। শুনিয়াছিলাম, আমাদের গ্রাম হইতে পাঁচ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী, কিন্তু বৃদ্ধা বলিতেছে, এখান থেকে পনর ষোল ক্রোশ পূর্ব্বে। তবে কি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না ? কে বলিল হইবে না ? ভাল, ভাগীরথীই আমার ভাগ্যে নাই, কিন্তু বৃদ্ধার উল্লিখিত শঙ্করী নদীই এবার আমার আশ্রয় ! আমি তাহারই জলে দেহ বিসর্জ্জন করিব। আমার

প্রতিজ্ঞা—হতাশের শেষ আশা অবশ্যই পূরিবে। বিধাতা যাহার জীবনের সমস্ত আশা ভরসা সুখ নষ্ট করিয়াছে, অবশ্য তাহার যন্ত্রণা বিনাশ করিবার জন্য নানা উপায় করিয়া রাখিয়াছে। মরিবার অনেক উপায় আছে—অগ্নি, বিষ, অস্ত্র, জল! আরও অনেক আছে।" মনে মনে এই বলিয়া গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে মনে মনে ঠিক করিলেন, "বৃদ্ধা নিদ্রিতা হইলে আমি আজিই রাত্রিকালে শঙ্করীনদীতে ডুবিয়া মরিব। আমি এতক্ষণ কোন্ কালে মরিতাম, কেবল গঙ্গালাভের আশায়, অন্য উপায় অবলম্বন করি নাই, কিন্তু এ পাপিনীকে কেন পতিতোদ্ধারিণী ভাগীরথীর করুণা হইবে? আমি এতক্ষণে বুঝিলাম, কাল রাত্রিকালে পথ ভ্রান্ত হইয়া বিপরীত দিকে আসিয়াছিলাম। তা' যাই হউক, শঙ্করীই আমার আশ্রয়।"

বৃদ্ধা অনেকক্ষণ ধরিয়া হিরণ্ময়ীকে নীরব থাকিতে দেখিয়া বলিল, "হ্যা দেখ বাছা! বেলা শেষ হ'য়ে এল, আর মিছে ব'সে থেকে কি হ'বে, মুখ হাত পা ধোও। আমি তোমার ফলারের যোগাড় করে দি।"

হিরণ্ময়ী বিমর্ষ চিত্তে বলিলেন, "আমার আদপেই কিছু খেতে ইচ্ছা নেই। এর পর যদি ক্ষুধা হয়, তবে তোমাকে বলিব।"

বৃদ্ধা বলিল, "সে কি? কিছু না খেলে হ'বে কেন? এখন যা' পার তাই খাও, শেষে রেতে খেও আবার।" এই বলিয়া আহার করাইবার জন্য আরও কতরূপ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

হিরণ্ময়ী দেখিলেন বৃদ্ধা, কোন মতে ছাড়িল না, সুতরাং স্বীকৃত হইলেন। বৃদ্ধা জল আনিয়া দিল, হিরণ্ময়ী হস্ত পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিলেন। অনন্তর বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীর ফলাহারে আয়োজনের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে গমন করিল।

ইত্যবসরে হিরণ্ময়ী ভাবিতে লাগিলেন—তিনি পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা মনে মনে চিন্তা করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, কিন্তু বৃদ্ধা আসিয়া পাছে দেখিতে পায়, এই আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ নয়ন মার্জ্জন করিয়া আত্মসম্বরণ করিলেন। নেত্র নিমীলন করিয়া একবার ভাবিলেন, "এই বৃদ্ধা আমাকে মাতার ন্যায় স্নেহ করিতেছে। এ বৃদ্ধা কে? ইহার নাম কি? কি জাতি?—কিছুই জানি না। যা' হউক আসিলে

জিজ্ঞাসা করিব। এ আমার প্রতি যেরূপ দয়া প্রকাশ করিতেছে, আমি তাহার কিঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা দেখাইব। আমার হস্তে বলয় আছে, গলায় মুক্তার মালা আছে, এই গুলি খুলিয়া ইহার নিকট রাখি। আজ রাত্রিকালে অমনি অমনি চলিয়া যাইব, এগুলি ইহার হইবে। এই ভিন্ন অন্য রূপে এক্ষণে কৃতজ্ঞতা দেখাইবার উপায় নাই।”

হিরণ্ময়ী মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে বৃদ্ধা তথায় প্রত্যাগত হইল। তাহার অঞ্চলে চিঁড়া মুড়কী, হস্তে দধি গুড়।

অনন্তর বৃদ্ধা গৃহ মধ্য হইতে একখানি ছোট খোরা এবং এক ঘটী জল আনিয়া হিরণ্ময়ীর সম্মুখে রক্ষা করিল। বলিল, “হ্যা দেখ, মা! এ গাঁ তেমন নয়—গরিবের গাঁ। এখানে ভাল জিনিষ কিছুই নেই।—এই চিঁড়ে মুড়কীও কত খোঁজ করে এনেছি। তুমি দই গুড় দিয়ে যেমন পার, চিঁড়ে মুড়কী মেখে খাও।”

হিরণ্ময়ী কি করেন, অগত্যা তাহাই করিলেন। বলা বাহুল্য যে তিনি পাঁচ সাত গ্রাসের বেশী খাইতে পারিলেন না। আহা, যে হিরণ্ময়ী সর্ব্বোৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন, ক্ষীর সর নবনী খাইতেও ইচ্ছা করিতেন না, বিধাতা সেই হিরণ্ময়ীর মুখে এই দারিদ্রভোগ্য খাদ্যসামগ্রী প্রদান করিলেন।

আহারের পর বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে গৃহের মধ্যে লইয়া, গিয়া একটি সামান্য শয্যায় শয়ন করাইল। নিজ পার্শ্বে বসিয়া তাহার গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিল পা টিপিয়া দিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধা শুনিবে কেন? পাঠক মহাশয়! আপনাকে বলা বাহুল্য যে হিরণ্ময়ী এই বৃদ্ধার সেবা শুশ্রূষা ও দয়ায় মোহিত হইলেন। যদিও এততেও তাঁহার আভ্যন্তরিক যন্ত্রনার উপশম হইল না কিন্তু তিনি কিয়ৎকালের জন্য বাহ্য যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন। বাস্তবিক বৃদ্ধার দয়ার সীমা নাই। আজ বৃদ্ধা, মাতা—হিরণ্ময়ী, কন্যা। এইরূপে সময় কাটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ভয়ঙ্কর ঘটনা।

সন্ধ্যা আগতা দেখিয়া বৃদ্ধা একটা জলপূর্ণ ভাণ্ড হইতে একটি মৃণ্ময় প্রদীপ উত্তোলন পূর্ব্বক একখানি ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডে মুছিল, প্রদীপে বর্ত্তিকা বসাইল, কিঞ্চিৎ তৈল দিল। তাহার পর রন্ধনশালায় গিয়া উনান হইতে একখানা পোড়া ঘুঁটে বাহির করিয়া একটা দেশালাই জ্বালিল। সেই আলোকে প্রদীপটি জ্বালিয়া লইল। রন্ধনশালার দেওয়ালে একটা কঞ্চির গোঁজে একটা আধভাঙ্গা ধুচুনী টাঙ্গান ছিল, বৃদ্ধা বাম হস্তে সেইটি ধরিয়া দক্ষিণ হস্তস্থ প্রদীপটি তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া আস্তে আস্তে সদর দরজায়, বাটীস্থ অন্য দুই খানি কুঠরীতে আলোক দেখাইয়া শেষে আপনার গৃহে দেখাইল, ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিল। অনন্তর গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একটি জবুতবু গোছের দেরুখায় প্রদীপটি রাখিয়া দিল। গৃহ অন্ধকারের হাত এড়াইল। বৃদ্ধার রন্ধনশালায় তাহার কোন আত্মীয় দিবসে রন্ধনাদি করিয়াছিল তাই এখনও অগ্নি ছিল।

বহড়া গ্রামের সান্ধ্য চিত্রটি বড় সাদাসিধা। রাখালেরা সবৎসা গাভীদল লইয়া ফিরিয়া আসিল। রাখালরমণীগণ পুরুষদিগের সাহায্যার্থ অবিলম্বে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া স্ব স্ব স্থানে গাভীদিগকে বাঁধিতে লাগিল। রাখালেরাও সেই কার্য্যে যোগ দিল। গাই বাঁধা চুকিয়া গেল। যে সকল লোক দুগ্ধ-দোহন-কার্য্যে তৎপর, তাহারা দোহন পাত্র লইয়া গাভীদিগের দুগ্ধ দোহন করিতে আরম্ভ করিল। স্ত্রীলোকেরা পার্শ্বে বসিয়া, কেহ বা দাঁড়াইয়া, গোবৎসকে গ্রেপ্তার করিয়া রাখিল। বৎসগণ হাত ছাড়াইবার জন্য বল প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিল না বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। যে গাভী স্থির হইয়া দুগ্ধ দান করিতে নারাজ, তাহার পশ্চাৎ ভাগের পদদ্বয়ে ছাঁদন দড়ির বেড় দেওয়া হইল;— গাভী নিরুপায়, কেবল মধ্যে মধ্যে হম্বা হম্বা শব্দে, কি জানি কাহাকে ডাকিতে লাগিল। তাহার বৎস

সেই সময় একবার প্রাণপণে বল প্রকাশ করিয়া ধৃতকারিনীর হাত ছাড়াইবার জন্য লম্ফত্যাগ করিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার গ্রেপ্তার হইল। গোশালার এক কোণে বসিয়া কোন গোপস্ত্রী একটি প্রদীপ জ্বালিয়া একখানা খড়কাটা বঁটি লইয়া ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ করিয়া খড় কাটিতে লাগিল।

এদিকে কৃষকগণ সে দিনের ক্ষেত্রকর্ম্ম সারিয়া হলস্কন্ধে স্ব স্ব বলদ লইয়া ফিরিয়া আসিল। কেহ হলাদি যথাস্থানে রক্ষা করিতে লাগিল, কেহ বা বলদগুলিকে বিছালি, ভুষি, তৈলকীট্ট ইত্যাদি ভোজ্য প্রদান করিল।

গ্রামের দুই চারি গৃহে শঙ্খধ্বনি হইল, কিন্তু একটিও গৃহে দেবতার আরতির মাঙ্গল্যযন্ত্রের বাদ্য শ্রুতিগোচর হইল না, তাহার কারণ এ গ্রামে তেমন লোকও নাই, তেমন দেবতাও নাই। তবে তা যাই হোক, কিন্তু একটি বাড়ীতে হরিলুট হইয়া গেল। হরির প্রসাদিত বাতাসা লুণ্ঠনকারীদিগেব মধ্যে সকলেরই মুখে 'হরিবোল হরিবোল' শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইল, কিন্তু ভূতল হইতে অনেকের হস্তে বর্ষিত বাতাসা উঠিল না। হরি ইহাদিগের নালিশ শুনিবেন কি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বহড়া গ্রামের অধিবাসীরা বড় দরিদ্র। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা দিবসে রন্ধন করে, তাহারা রাত্রিকালে জলসিক্ত অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে, আর যাহারা দিবসে অবকাশ পায় না, তাহারা এই সন্ধার সময় খাটিয়া আসিয়া রন্ধন কার্য্য আরম্ভ করে, প্রাতে পর্য্যুসিতান্ন ভক্ষণ করিয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতে যথা তথা চলিয়া যায়। সেইরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক। তাহারা এক্ষণে চুলা জ্বালিয়া হাঁড়ি চড়াইয়া দিল। গ্রামের চারি দিক হইতেই ধূম উত্থিত হইতে লাগিল ঘুঁটে ধুয়ার গন্ধে গ্রাম ভরিয়া গেল।

তালপুকুরের পাড়ে শৃগালদল সময় পাইয়া কুক্কুরদলকে গালি দিতে লাগিল। কিন্তু কুক্কুরদল ও নাছোড়বান্দা, তাহারাও কতক দূর দৌড়িয়া গিয়া ঊর্দ্ধমুখে খেউ খেউ ভেউ ভেউ করিয়া দশকথা শুনাইয়া দিল।

অনন্তর বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে—গৃহ মধ্যে রাখিয়া পুনর্ব্বার রন্ধনশালায় গমন করিল। সেখানে আব একটা দীপ জ্বালিয়া একটা মেটে পাথরে কতকগুলি জলসিক্ত অন্ন লইয়া ভক্ষন করিল। ব্যঞ্জনের মধ্যে বার্ত্তাকুদগ্ধ, কাঁচা লঙ্কা ও লবণ। দরিদ্রা ইহাতেই ভোজন সুখ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল।

এতক্ষণ হিরণ্ময়ী একাকিনী বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন। সেই আলো-কান্ধকারমিশ্রিত গৃহমধ্যে তাঁহার সেই বিষাদ মূর্ত্তি! মধ্যে মধ্যে এক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস বহির্গত হইয়া অল্পদূর স্থিত প্রদীপশিখাকে বিকম্পিত করিতেছিল।

বৃদ্ধা আহারান্তে পুনর্ব্বার হিরণ্ময়ীর নিকট আসিল। সে তাঁহাকে অন্য-মনস্কা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কি ভাব্‌ছ মা?"

হিরণ্ময়ী প্রকৃতিস্থা হইয়া বলিলেন, "না গো, কিছুই ভাবিতেছি না—চুপ করিয়া বসিয়া আছি।"

বৃদ্ধা।—"ঘুম পাইয়াছে কি?"

হিরণ।—"না।"

বৃদ্ধা।—"তবে তুই একটা রূপ্‌কথা (উপকথা) শুন্‌বে কি?" বৃদ্ধার এরূপ বলিবার কারণ এই যে, যদি ইহাতে হিরণ্ময়ীর চিন্তাকুলিত চিত্ত পরিবর্ত্তিত হয়।

হিরণ্ময়ী ইহাতে ইচ্ছা না থাকিলেও উপকারিণীর কথা-লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না।

বৃদ্ধা বাঘ, ভাল্লুক, রাক্ষস, রাজা, রাণী, রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র প্রভৃতি কত-রূপ উপকথা আরম্ভ করিল, কিন্তু হিরণ্ময়ী অন্যমনস্কতার সহিত কতক শুনিলেন, কতক শুনিলেন না। বৃদ্ধা মনে করিল, হিরণ্ময়ী সমস্তই শুনিতে-ছেন। অনন্তর বৃদ্ধার "আমার কথাটি ফুরা'ল, নটে গাছটি মুড়া'ল" হইয়া গেল।

অবকাশ পইয়া এইবার হিরণ্ময়ী বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, তোমার নাম কি? তোমরা আপনারা?"

বৃদ্ধা বলিল, "আমার নাম মঙ্গলা—আমরা গোয়ালা।"

হিরণ।—"তোমার আর কে আছে?"

বৃদ্ধা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল, "আর মা, এ পোড়াকপালীর আর কেউ নেই। কেবল পোড়া যমই আছে।"

হিরণ্ময়ী বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, বলিলেন, "আর দুঃখ করিয়া কি করিবে বল। বিধাতার ইচ্ছা কে লঙ্ঘন করিতে

পারে? জগতের কার্য্যই এই।” তবে হিরণ্ময়ি! তুমি কেন সুগভীর দুঃখ সাগরে ডুবিয়া শঙ্করী নদীতে ডুবিতে সঙ্কল্প করিয়াছ? বুঝিয়াছি, মানুষ দুঃখের সময় পরকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু নিজের দুঃখ উপশম করিতে সক্ষম হয় না। ইহা বিধাতার ইচ্ছা জগতের কার্য্য।

কিয়ৎক্ষণ পরে হিরণ্ময়ী আবার বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্যাঁ গা, তবে কে আজ তোমার অন্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল?”

বৃদ্ধা।—“এই গাঁয়ে আমার এক ঘর জ্ঞেয়াৎ আছে। সে বাড়ীর একটি মেয়ে, সম্পর্কে আমার নাৎনী হয়। আমি যখন বাটী থাকি না, তখন সেই রান্না টান্না করে রাখে, আপনিও খায় আব বাড়ী আগ্লায়।”

হিরণ।—“যা হউক্, তবু তোমার অনেটা উপকার হয়।”

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কথোপকথন হইবার পর হিরণ্ময়ী বলিলেন,“হ্যা দেখ, আমার এই বালা দু'গাছা আর মুক্তার মালা তোমার কাছে রাখিয়া দাও।”

বৃদ্ধা।—“আমিও তাই তোমাকে বল্‌ব বল্‌ব মনে কচ্ছিলেম। এ জায়গাটা বড় ভাল নয়, কার মনে কি আছে, তা জানি না। তা দাও, আমি এখন আমার কাছে গোপনে রেখে দি'। যখন তুমি মামার বাড়ী যা'বে, তখন তোমার আঁচলে বেঁধে দিব। হাতে গলায় প'রে পথে যেও না।

হিরণ্ময়ী হস্ত হইতে বালা ও কণ্ঠ হইতে মালা উন্মোচন করিয়া বৃদ্ধার করে অর্পণ করিলেন। বৃদ্ধা উহা হস্তে লইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, “এমন দামী জিনিষ, এও কি মেয়ে ছেলের একলা পরে পথে যেতে আস্তে আছে?”

হিরণ।—“তুমি আমার প্রতি যেরূপ দয়া দেখাইতেছ, আমি তার কিছুই করিতে পারিলাম না, কিন্তু এ উপকার আমি কখন ভুলিব না।”

বৃদ্ধা।—“সে কি, বাছা! এ আর উপকার কি? এখন তোমায় ভালয় ভালয় তোমার মামার বাড়ী পাঠা'তে পাল্লেই আমার আশা মিটে।”

হিরণ্ময়ী কোন উত্তর করিলেন না।

বৃদ্ধা আবার বলিল, “রাত বেড়ে উঠছে। চল এখন তোমাকে পাশের ঘরে শুইয়ে রেখে আসিগে।” এই বলিয়া হিরণ্ময়ীকে লইয়া পার্শ্বস্থ গৃহে গমন করিল।

সেই গৃহে বৃদ্ধা একটি বিছানা পাতিয়া একটি বালিস রক্ষা করিল। সে গৃহের কপাট নাই, কিন্তু ছেঁচা বাঁশের আগড় আছে।

বৃদ্ধা তথায় হিরণ্ময়ীকে রাখিয়া আবার নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিল। সিকায় একটি হাঁড়ি ঝুলিতেছিল, সে সেইটি পাড়িয়া তন্মধ্য হইতে চারিখানি বাতাসা বাহির করিল। অনন্তর রন্ধনশালায় গিয়া, একটি দুদ আওটাইবার হাঁড়ি হইতে এক বাটী দুগ্ধ লইল। পুনর্ব্বার আপনার গৃহে আসিল। অনন্তর সেই দুগ্ধে দুই খানা বাতাসা ডুবাইয়া দিল। তাহার পর সেই দুগ্ধপূর্ণ বাটী ও অবশিষ্ট দুই খানি বাতাসা লইয়া হিরণ্ময়ীর গৃহে প্রবেশ করিল।

হিরণ্ময়ী শুইয়াছিলেন, বৃদ্ধাকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "আবার এ সব কেন? আমি আর কিছুই খাইতে পারিব না। তুমি ইহা নিজে খাও। আমায় দিয়া কেন বৃথা নষ্ট কর।"

বৃদ্ধা বলিল, "বাছা! রেতে কি উপোস থাক্‌তে আছে? আচ্ছা, এখন না খাও, একটু পরে খেও, কেমন্?"

হিরণ।—"তা' আমি বল্‌তে পারি না।"

বৃদ্ধা।—"না, খেতেই হবে।"

হিরণ।—"আচ্ছা খাইব।" এ কথা অনিচ্ছায় বলিলেন।

বৃদ্ধা।—"আমার দিব্যি ক'রে বল,—খা'বে।"

হিরণ্ময়ী উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিলেন, "যা পারি, খাইব, কিন্তু সব পারিব না।"

বৃদ্ধা।—"ফাঁকি দিবে না ত?"

হিরণ।—"সত্য বলিতেছি,—তোমার দিব্য করিয়া বলিতেছি, খাইব। তুমি আমার যেরূপ উপকার করিতেছ, আমি তোমার কথা কখনই লঙ্ঘন করিব না।"

বৃদ্ধা।—"তবে এখন আমি শুইগে। যদি রেতে উঠ, তবে আমাকে এই ঘর থেকে ডেক। ঘুমিয়ে প'ড় না—দুদ্‌টুকু আর বাতাসা দুখানি খেও' আমি এখন তোমার ঘরের আগড় ভেজিয়ে দিয়ে শুইগে যাই।"

বৃদ্ধা আপনার গৃহে গমন করিয়া শয়ন করিল।

এদিকে বিপুল ঐশ্বর্য্যশালীর কন্যা হিরণ্ময়ী সামান্যা দীনদরিদ্রের দুর্ভাগ্যবতী তনয়ার ন্যায় একাকিনী সেই কদর্য্য গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি ছিন্ন মাদুরের উপর অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখখানি বৈমর্ষ্যে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কপালে, গালে, হস্তে, পদে এক একটা সূক্ষ্মশুণ্ড মশক বসিয়া রক্তশোষণ করিতেছে, কিন্তু তাঁহার শরীর যেন অসাড়—কষ্টের লেশমাত্রও অনুভূত হইতেছে না। হিরণ্ময়ীর বিলয়োন্মুখ আশা ভরসার সহিত প্রদীপটিও নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিল।

হিরণ্ময়ী তদ্দর্শনে তাড়াতাড়ি করিয়া অঙ্গীকৃত দুগ্ধের কিয়দংশমাত্র পান করিলেন। একেবারেই পান করিবার ইচ্ছা ছিল না, কেবল শপথের ভয়ে যৎকিঞ্চিৎ পান করিলেন। বাতাসা দুইখানা স্পর্শও করিলেন না। পাছে বৃদ্ধা দেখিতে পাইলে দুঃখিত হয়, এই জন্য দুইখানা বাতাসা এবং অনেকটা দুগ্ধ গৃহের একটা ক্ষুদ্র জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন।

পুনর্ব্বার মাদুরের উপর উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিতে লাগিলেন। নিদ্রা আসিল, আর বসিতে পারিলেন না। আস্তে আস্তে শয়ন করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রগাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে মধ্যরাত্রি অতীত হইয়া গেল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ।—প্রকৃতির যোগসাধনের সময়, সুতরাং তিনিও নিস্তব্ধ। এক্ষণে সংসার-নদের তুমুল কোলাহলপূর্ণ তরঙ্গসজ্ঘ কিয়ৎক্ষণের জন্য নীরব হইয়া অনন্ত অসীম অগাধ কালসমুদ্রে মিশিতে লাগিল। যদি কেহ যুগপৎ ভয় ও ভক্তির দৃশ্য দেখিতে ইচ্ছা করে, তবে ইহাই সেই দৃশ্য।

বৃদ্ধা আপন গৃহে শয়ন করিয়াছিল। সে এক্ষণে একবার শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। হিরণ্ময়ী যে গৃহে শয়ন করিয়া আছেন, সে সেই গৃহের দ্বারদেশে গিয়া, "ওগা—ওগো মা—ওগো—ও বাছা" বলিয়া ডাকিল, কিন্তু হিরণ্ময়ীর সাড়াশব্দ পাইল না। আমাদের বোধ হয়, হিরণ্ময়ী পথশ্রমে ও অনাহারে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছেন। বৃদ্ধা! এক্ষণে তুমি আর দুঃখিনীকে জাগাইও না।—সূর্য্যোদয় হইতে দাও, তখন ডাকিও।

বৃদ্ধা আর ডাকিল না বটে,কিন্তু আগড় ঠেলিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশকরিল। গৃহ অন্ধকার। দীপবর্ত্তিকার সমস্তই পুড়িয়া গিয়াছে—প্রদীপে তৈলের গন্ধও নাই।

বৃদ্ধা গৃহমধ্যে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, যেখানে হিরণ্ময়ী শয়ানা আছেন, সেইখানে উপস্থিত হইল। আস্তে আস্তে হিরণ্ময়ীর গাত্রে হস্ত দিয়া ডাকিতে লাগিল—সাড়া পাইল না। ঠেলিতে লাগিল—তথাপি সাড়া পাইল না। গ্রীবায় হস্ত দিয়া উঠাইয়া বসাইতে চেষ্টা করিল, তথাপি হিরণ্ময়ীর সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে এতদবস্থ দেখিয়া কি ভাবিল। ভাবিয়াই তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বাহিরে চলিয়া আসিল। আসিবার সময় তাহার মুখে অস্পষ্টভাবে শুনা গেল,—"হ'য়ে গেছে।"

অনন্তর বৃদ্ধা তথা হইতে চলিয়া গিয়া তৃতীয় গৃহটির মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে প্রবিষ্ট হইয়া "ও ভোলা! ওরে লখে" বলিয়া কাহাদিগকে ডাকিল। বৃদ্ধার আহ্বানে দুই জন যুবা গাত্রোত্থান করিয়া "কি মা?—হ'য়ে গেছে কি?" এই কথা বলিল।

বৃদ্ধা বলিল, "হ'য়ে গেছে; এখন তোরা শিগ্গীর শিগ্গীর মড়াটাকে নিয়ে শঙ্করী নদীতে ফেলে দিয়ে আয়। আড়াই পহর রাত উৎরে গেছে।"

ভোলা এবং লখে এই বৃদ্ধার পুত্র। উহাদের আকার প্রকার দেখিলে দর্শকের মনে আপনা আপনি ভয়ের উদ্রেক হয়। ভোলা বড় এবং লখে ছোট। ইহাদের রূপগুণের কথা বেশী করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। পাঠক মহাশয়! যদি কখন বিকটমূর্ত্তি লেঠেল দেখিয়া থাকেন, তবে ইহাদিগকেও ঠিক্ সেইরূপ বলিয়া ধরিয়া লউন্।

ভোলা বৃদ্ধাকে বলিল, "হ্যা দেখ্ মা! আজ তুই আমাদেরকে ঘরে থাক্তে ব'লে যে রকম রোজগারের যোগাড়টা করে দিলি, তা আমরা আর কি বল্ব। আমরা রোজ রোজই লাঠি হাতে ক'রে, মুখে কালি মেখে, রেতের বেলা পথের ধারে ব'সে থাকি; সময়ে সময়ে দু একটা রাহীকে মেরে ফেলে যা' কিছু টাকা কড়ি কাপড় চোপড় পাই, তা ত তুই সকলই জানিস্। কিন্তু আজ তুই যে, কি শুভক্ষণেই ঐ মেয়েটাকে হাত করেছিলি যা হোক। এত দিন ধরে আমরা দু'জনে দু শ আড়াই শ লোককে ঠেঙিয়ে মেরে যা কর্ত্তে পারিনি, তুই তা আজ একটাকে মেরে কল্লি।"

ভোলা এই কথা বলিলে, তিন জনেরই মুখে হাসি দেখা দিল।

লখে বলিল, "হাঁ মা! হীরের বালা আর মতির মালা ত বেশ ক'রে রেখেছিস্? দেখিস্ বেটি! যেন আবার চোরের উপর বাটপাড়ি না হয়।"

লখের কথা শুনিয়া ভোলা বলিল, "ওরে বোকা! আজও কি তোর ঘটে বুদ্ধি সুদ্ধি জম্‌লো না। ওরে, মার বুদ্ধি আর পরামর্শমতেই ত আমরা ঠেঙাড়ের কাজ শিখে দিন গুজ্‌রোন্ কচ্চি, কিন্তু বল্ দেখি, সেই দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত আমরা কি কখন কোন বিপদে পড়েছি?"

লখে।—"মার আশীর্ব্বাদে তা' ত পড়িনি, দাদা!"

ভোলা।—"তবে বল্ দেখি, আমাদের মা-র বুদ্ধি কি সামান্যি। ওর কাছ থেকে আবার চোরে কার্দ্দানি ফলা'বে?"

উভয়ের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতে দেখিয়া বৃদ্ধা বলিল, "ওরে, তোরা আর মিছে গোলমাল ক'রে সময় কাটাস্ নে। মড়াটাকে ফেলে দিয়ে এসে, তা'র পর যা হয় করিস্—বলিস্।"

বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়া ভোলা ও লখে আর কালবিলম্ব করিল না। তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত উভয়ে হিরণ্ময়ীর গৃহে গমন করিল। আবার তিন জনে বিশেষ করিয়া হিরণ্ময়ীকে নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল। তখনও তাহাদের সন্দেহের কোন কারণ লক্ষিত হইল না। অনন্তর ভোলা ও লখে হিরণ্ময়ীকে স্কন্ধে লইয়া তথা হইতে শঙ্করী নদীতে প্রস্থান করিল। এই দুইজন দস্যু অতি দ্রুতবেগে অল্প সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া শঙ্করীর স্রোতে সুবর্ণপ্রতিমা ভাসাইয়া দিল।

এ দিকে দস্যুজননী রাক্ষসীস্বরূপা বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে ভাসাইতে পাঠাইয়া দিয়া, আপনার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দীপালোকে হিরণ্মীর প্রদত্ত মুক্তামালা ও হীরকমণ্ডিত সুবর্ণবলয় বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিল। অন্তরে আর আনন্দ ধরিল না। আশা আসিয়া তাহাকে কত পন্থাই দেখাইতে লাগিল।

পাঠক! এই ভণ্ডতপস্বিনী কপটচারিণী পাপীয়সী বৃদ্ধাকে দেখিয়া আপনি কি মনে করিতেছেন? হিরণ্ময়ীর সহিত ইহার প্রথম সাক্ষাৎ এবং এই ঘটনা দেখিয়া ইহাকে কি বলিতে ইচ্ছা হয়?—রাক্ষসী। লোকে বলে কবিরা কল্পনা করিয়া রাক্ষস ও রাক্ষসীর সৃষ্টি করেন, কিন্তু আমরা বলি

তাহা নয়, তাঁহাদের বর্ণিত রাক্ষস রাক্ষসী এই মনুষ্য সমাজেই অহর্নিশ রহিয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত এই বৃদ্ধা ও ইহার দুই পুত্র।

অভাগ্যবতী হিরণ্ময়ীর এই পরিণাম যে এমন হইবে, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। তিনি আজ রাত্রিকালে শঙ্করী নদীতে স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিবার চেষ্টায় ছিলেন বটে, কিন্তু বৃদ্ধাই যে তাঁহাকে দুগ্ধের সহিত বিষ মিশাইয়া পান করিতে দিয়া হত্যা করিবে এবং শঙ্করীতে ভাসাইয়া দিবে, ইহা তাঁহার চিন্তার বহির্ভূত ছিল। এই লোমহর্ষণ ঘটনায় বৃদ্ধা সুখী, তাহার পুত্রদ্বয় সুখী, অবস্থানুসারে হিরণ্ময়ীও সুখী, কিন্তু আমরা তাহার বিপরীত। কিন্তু কি করিব, নিয়তির নিয়ম কে লঙ্ঘন করিতে পারে? তা যা হউক, আমরা এই নিষ্ঠুরা বৃদ্ধা এবং ইহার নিষ্ঠুর পুত্রদ্বয়ের অচিরে মৃত্যু কামনা করি। এই তিন জন না মরিলে, আরও যে কত লোক অকালে প্রাণত্যাগ করিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

দুরাত্মা ভোলা ও লখে হিরণ্ময়ীকে ভাসাইয়া দিয়া অবিলম্বে গৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহারা কিরূপ করিয়া এই কার্য্য সমাধা করিয়া আসিল, বৃদ্ধার নিকট তাহা আনুপূর্ব্বিক বলিল।

যে অলঙ্কারের জন্য হিরণ্ময়ী শঙ্করীর জলে বিসর্জ্জিত হইলেন, সেই অলঙ্কার এক্ষণে বৃদ্ধা ও তাহার পুত্রদ্বয়ের হস্তে পর্য্যায়ক্রমে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরীক্ষিত হইতে লাগিল।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

শঙ্করী নদী।

বহড়া গ্রামের ক্রোশ দুই উত্তরে শঙ্করী নদী, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই নদী খুব বিস্তৃত নহে। ইহার জল পরিষ্কার এবং সুস্বাদু। ইহার উভয় তীরে সৈকতভূমি, তাহার পর তটভূমি। রাত্রিকালে ইহার শোভা অতি মনোহারিণী। উভয় তটের কোন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম, কোথাও বা শস্যক্ষেত্র। এক্ষণে শঙ্করীর স্রোত অনাঘাতিত হইয়া আপন

মনে চলিয়া যাইতেছে। সেই স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া অভাগী হিরণ্ময়ীর অপূর্ব্ব দেহও চলিয়া যাইতেছে। কতকগুলি পদ্মপুষ্প একত্রে ভাসিয়া গেলে যেরূপ দেখায়, একা হিরণ্ময়ীর দেহযষ্টিও সেইরূপ দেখাইতেছে। ক্রমে ক্রমে সময় চলিয়া গেল, যে স্থানের স্রোতে হিরণ্ময়ী বিসর্জ্জিত হইয়াছিলেন, সেই স্রোত চলিয়া গেল এবং তদুপরি ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার দেহও চলিয়া গেল। নৈশ প্রকৃতি নীরবে হিরণ্ময়ীর ভাসমান দেহ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু হিরণ্ময়ী কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

শঙ্করী নদীর অবিরামগতি-স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া হিরণ্ময়ীর দেহ বহুদূর চলিয়া গেল। বায়ুর সঞ্চারে উহা সমানভাবে না গিয়া একটু একটু করিয়া বাঁকিয়া যাইতে লাগিল। বাঁকিয়া যাইতে যাইতে একস্থলে সৈকত-ভূমিতে সংলগ্ন হইয়া গেল— আর যাইতে পারিল না। সেই স্থানে আটক পড়িয়া বায়ুসঞ্চালিতজলকম্পনে মৃদু মৃদু দুলিতে লাগিল। হিরণ্ময়ীর পরি-হিত সিক্ত বস্ত্রখানির কিয়দংশ শরীরে এবং কিয়দংশ জলে অর্দ্ধমগ্ন হইয়া রহিল।

যতক্ষণ ভোগ, ততক্ষণ যোগ। কিন্তু ভোগ ফুরাইলেই বিয়োগ ঘটে। এই কালরাত্রিরও তাহাই ঘটিল। কএক ঘণ্টার জন্য ভূগোলের পূর্ব্বাংশের সহিত তাহার বিয়োগ সঙ্ঘটিত হইল। সে পূর্ব্বদিক ছাড়িয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া গেল। ওদিকে পূর্ব্বাকাশে উষা ললাটে প্রভাতমণি বসাইয়া নয়ন উন্মীলন করিল। সূর্য্যোদয়ের এখনও বিলম্ব আছে।

এমন সময়ে সহসা কিঞ্চিদ্দূরে মনুষ্যকণ্ঠের শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। কতকগুলি লোক যেন কি বলিতে বলিতে আসিতেছে। দূরত্ব নিবন্ধন তাহাদের উচ্চারিত কথার অর্থ স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল না, কেবল মধ্যে মধ্যে দুই তিন বার 'লুঠ—টাকা—আমার—বর্সা" এইরূপ কএকটি কথা অসংলগ্নভাবে শুনা গেল।

ক্রমে দেখা গেল যে, চৌদ্দ পনর জন ইতরজাতীয় লোক আসিতেছে। তাহাদের হস্তে অস্ত্রশস্ত্র অর্থ ও অলঙ্কার রহিয়াছে। তাহাদের আকার প্রকার ও সেই সকল দ্রব্য দেখিয়া, তাহাদিগকে দস্যু বলিয়া বোধ হইল। তাহারা আরও কিছুদূর আসিয়া পরস্পরে বলিল, "হা দেখ্, নিধে! আর ত

যাবার সুবিদে দেখ্চিনে। ভোর হ'য়ে এসেচে। এখন ত আর ঠিকানায় যাবার যো নেই। এক কাজ করা যাক্;—ঐ জঙ্গলটার ভিতর গিয়ে লুকিয়ে থাকি গে চল্। দিনের বেলা ওখানে থেকে, আবার রেতের বেলা ঠিকানায় যাব, কেমন?"

আর একজন বলিল, "তা বই ত আর উপায় দেখ্চিনে। চল, শীগ্গীর শীগ্গীর চল।"

এই বলিয়া সকলে দ্রুতপদে আসিতে লাগিল। এমন সময় সহসা একজন বিস্ময়সহকারে বলিয়া উঠিল, "ওরে ওটা কি?"

আর একজন বলিল, "কই রে?"

প্রশ্নকারী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ যে রে।"

অপর একজন ব্যক্তি দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "একটা মড়া বুঝি ধারে আট্কে ভাস্চে। চল চল, যদি ওটা নৌকাডুবি হ'য়ে ম'রে থাকে, তবে ওর গায়ে গয়না টয়না আছে—খুলে নিগে চল্।" এই বলিয়া সকলে দ্রুত-পদে তটসংলগ্না হিরণ্ময়ীর নিকট উপস্থিত হইল। সকলে বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিল। এমন সময়ে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "ওরে এ স্ত্রীলোকটা মরে নি এখনও। এই দেখ্, একটু একটু নড়্ছে—না?"

আর ব্যক্তি দেখিয়া বলিল, "ঠিক্ বলেছিস, ভাই! নড়্ছে বটে। এক কাজ করি আয়;—একে জল থেকে তুলে নিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করা যা'ক্।" এই বলিয়া দুই তিন ব্যক্তি আস্তে আস্তে হিরণ্ময়ীকে জল হইতে উত্তোলন করিয়া তীরে রক্ষা করিল। নাসিকায় হস্ত দিয়া দেখিল, অতি সূক্ষ্মভাবে নিশ্বাস বহিতেছে। কিন্তু হিরণ্ময়ী এখনও এতদূর চৈতন্যহীনা যে, বাহিরে কি কি হইতেছে, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। এদিকে, তাঁহার অন্তরের ভিতর কি কি হইতেছে, তাহা বাহিরের লোকেরাও বুঝিতে পারিতেছে না।

অনন্তর সেই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বিষচিকিৎসক ছিল। সে ব্যক্তি কএক প্রকার টোট্কা টুট্কিও জানিত। সে হিরণ্ময়ীর তাৎকালিক আকার ও অবস্থা দেখিয়া বলিল, "এই স্ত্রীলোকটি বিষে এমন হ'য়েছে।" এই বলিয়া দ্রুতপদে সৈকতভূমি হইতে তটে আরোহণ করিয়া দুই প্রকার

লতা আনিল। উহার মধ্যে একপ্রকার লতার পাতা নিঙড়াইয়া হিরণ্ময়ীর মুখে রস দিল। অল্পক্ষণ পরেই হিরণ্ময়ীর বমন হইল। এই বমনের সময় তাঁহার যে কষ্টানুভব হইয়াছিল, তাহা তাঁহার আকার ইঙ্গিতে বুঝা গেল। অনন্তর দ্বিতীয় প্রকার পাতার রস মুখমধ্যে প্রদত্ত হইলে, সেই যন্ত্রণার উপশম বোধ হইল।

অনন্তর সেই সকল ব্যক্তি সেখানে আর ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া, হিরণ্ময়ীকে ধরাধরি করত পূর্ব্বকথিত জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে তাহারা মনোমত নিভৃতস্থান বাছিয়া লইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। সকলে মিলিয়া বিশেষরূপে বিপন্না হিরণ্ময়ীর সেবা শুশ্রূষা করিতে ক্রটি করিল না। সেই সকল ব্যক্তি যে দস্যু, পাঠক মহাশয়কে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে কথা এই, তাহারা হিরণ্ময়ীকে কি উদ্দেশে সুস্থ করিল?—তাহা বলিতে পারি না। এ দিকে সূর্য্যোদয় হইল। সূর্য্যালোকে দেখা গেল, যেখানে দস্যুরা হিরণ্ময়ীকে দেখিতে পাইয়াছিল, তথাকার বালুকাভূমিতে দুই প্রকার ছিন্ন লতা ও মনুষ্যপদের অনেকগুলি চিহ্ন বিশৃঙ্খলভাবে পড়িয়া রহিয়াছে।

ষটচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বীরচাঁদ।

বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। যে জঙ্গলের মধ্যে দস্যুরা হিরণ্ময়ীকে লইয়া অবস্থান করিতেছে, উহা এক্ষণে নূতনভাব ধারণ করিয়াছে। উহার চতুষ্পার্শ নীরব। কেবল মধ্যে মধ্যে 'ফটিক জল' বলিয়া দুই একটা চাতক পক্ষী ডাকিতেছে। তাহাদের আহূত 'ফটিকজল' তত মিষ্ট না হউক, কিন্তু তাহাদের কণ্ঠস্বর তদপেক্ষা শতগুণে মিষ্ট।

এমন সময়ে সেই জঙ্গলের অপর দিকে পাঁচ ছয় জন লোককে দেখা গেল। উহারা কাহারা?—উল্লিখিত দস্যুদলের পাঁচ ছয় জন লোক। উহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি বলিল, "হ্যা দেখ, কেনা! এই মেয়েলোকটা বলচে

কি যে, ওর মামার বাড়ী বেলগাঁয়ে। ও সেখানে যাচ্ছিল। এমন সময় একটা বুড়ী মাগী ওকে তা'র বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল। সে ওকে রাত্তিরে একটা ঘরে শুইয়ে রেখেছিল, ও-ও ঘুমিয়ে পড়েছিল, এমন সময়ে আমরা ওকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি।" এই কথা শুনিয়া সকলে একবার হাসিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "তা' ও বল্‌তে পারে, কেন না ও কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চে না। আর আমাদের দেখে ওর এরূপ সন্দেহও হ'তে পারে। তা যাই হৌক্, আমি ওর ভাবগতিক দেখে সমস্তই বুঝ্‌তে পেরেছি। ও কোথাও জালে পড়েছিল, কিন্তু এখন ভগবানের ইচ্ছেয় আমাদের হাতেই জাল ছিঁড়েচে। ভাই ছুঁড়ী কি সুন্দরী! আমার ইচ্ছে হয়, ওকে বিয়ে করি।"

তৃতীয় ব্যক্তি হাস্য করিয়া বলিল, "তোর ইচ্ছে হয়, আর আমাদের বুঝি হয় না?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি হাসিয়া বলিল, "সকলের ইচ্ছে সকলের মনেই থেকে গেল। সর্দ্দার বল্‌ছে কি গুরু ঠাকুরের হাতে ওকে দেবে। অন্য কারো ট্যাফোঁ করবার যো নেই।"

চতুর্থ ব্যক্তি বলিল, "কাজেই।"

পঞ্চম ব্যক্তি বলিল, "ওরে, যা হ'বার নয়, তা'র ভাবনা ভেবে মচ্চিস্ কেন? তা'র চেয়ে আমরা ছুঁড়ীটেকে আশ মিটিয়ে, চোক জুড়িয়ে দেখি গে চল।"

চতুর্থ ব্যক্তি আবার বলিল, "কাজেই।"

অনন্তর তাহারা দলে গিয়া মিশিল।

এ দিকে দস্যুদিগের সর্দ্দার কএকখানি লুণ্ঠিত বস্ত্র বিছাইয়া তাহার উপর হিরণ্ময়ীকে শুয়াইয়া রাখিয়াছে। হিরণ্ময়ী এখনও উঠিয়া বসিতে পারিতে-ছেন না। তিনি এই সকল লোককে দেখিয়া মনে মনে কত কি আন্দোলন করিতেছেন—কত কি ভাবিতেছেন। সে আন্দোলনের—সে ভাবনার সীমা নাই। তিনি ভয়ে ও লজ্জায় চক্ষু উন্মীলন করিতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে তাঁহার নিমীলিত চক্ষুযুগল হইতে কএক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

দস্যুসর্দ্দার নীরবে বসিয়া হিরণ্ময়ীর এই অশ্রুপাত দর্শন করিল। দলস্থ অপরাপর দস্যুগণও ইহা দেখিল। উহাদের মধ্যে দুই জন ব্যক্তি জনান্তিকে এতৎ সম্বন্ধে কি বলা কওয়া করিল। উহাদের নাম কেনারাম ও নিধিরাম।

দস্যুসর্দ্দারের নাম বীরচাঁদ। সে ব্যক্তি যদিও দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন ও শরীরকে ঘৃণিত এবং পাপলিপ্ত করিতেছে বটে, কিন্তু তাহার অধীনস্থ দস্যুদিগের অপেক্ষা তাহার হৃদয় উদার। সেই হৃদয়ে অসৎ বৃত্তির সহিত সৎবৃত্তিও সমানরূপে আধিপত্য করিতেছে। বীরচাঁদের হৃদয় অধিক সময় মন্দের দিকে গাড়াইয়া পড়িলেও, এক এক সময় ভালর দিকে এরূপ ভাবে ঢলিয়া পড়ে যে, তখন তাহাকে অতিবড় শত্রুরও আলিঙ্গন ও মুক্ত-কণ্ঠে ধন্যবাদ প্রদান করিতে হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে। অদ্যকার হিরণ্ময়ী-সংক্রান্ত ঘটনা দেখিয়া আমরা বীরচাঁদের সমস্ত দোষ ও অসৎ কার্য্য বিস্মৃত হইলাম। চেতনরহিতা ও মৃত্যুমুখপতনোন্মুখী হিরণ্ময়ীকে যে ব্যক্তি ঔষধি-লতা-পত্রের রস দিয়াছিল, সে এই বীরচাঁদ। যে ব্যক্তির ভয়ে অপর পাপাত্মা দস্যুরা হিরণ্ময়ীর প্রতি অসদাচার প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইতেছে না, সে এই বীরচাঁদ। হিরণ্ময়ী পিতার নিকট পীড়িতা কন্যার ন্যায় যে ব্যক্তির সম্মুখভাগে বিস্তৃত বস্ত্রগুলির উপর শুইয়া আছেন, সেও এই বীরচাঁদ।

বীরচাঁদের বয়ঃক্রম এক্ষণে পঞ্চাশ বৎসর হইবে। এত বয়স হইলেও, আজিও ইহার শরীরে পঞ্চবিংশ বা ত্রিংশবর্ষীয় বলিষ্ঠ যুবার ন্যায় শক্তি রহি-য়াছে। ইহার আকার প্রকার দেখিয়া ইহাকে কেহ দস্যু বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না। ফলকথা বীরচাঁদ একজন অপূর্ব্ব দস্যু। এরূপ দস্যু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। বীরচাঁদ সময়ে দস্যু—সময়ে দয়ালু।

বীরচাঁদ হিরণ্ময়ীকে বলিল, "বাছা ? কেন তুমি আমার কাছে থেকেও এত ভয় পাচ্চ ? যখন তুমি আমার কাছে আছ, তখন তোমায় কা'র সাধ্যি যে কিছু বলে ? তোমার কোন ভয় নেই। আজ থেকে তুমি আমার ধর্ম্ম-মেয়ে। বল, ঠিক্ ক'রে বল, তোমার বাড়ী কোথা ? তোমার কে আছে ? তোমার নাম কি ? আমা হ'তে তোমার মঙ্গল বই অমঙ্গল হ'বে না।"

হিরণ্ময়ী দস্যুসর্দ্দার বীরচাঁদের আশ্বস্ত কথাগুলি শুনিয়া ভাবিলেন, "যদি আমি ইহাকে আমার প্রকৃত বিষয় না বলি, তবে এ ব্যক্তি দুঃখিত হইবে,

কিন্তু বলিলে পাছে আমি বিপদে পড়ি। পাছে বিপদে পড়ি কেন, সত্য-সত্যই বিপদে পড়িবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এখনি হয় ত এ ব্যক্তি আমার পিতা মাতার নিকট আমাকে লইয়া যাইবে। আমি কোনমতে ইহার হাত এড়াইতে পারিব না। সুতরাং আমি মনের কথা, বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও, বলিতে পারিব না।" তিনি মনে মনে এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া নীরব রহিলেন।

বীরচাঁদ উত্তরের আশা করিয়া অনেক ক্ষণ বসিয়া রহিল, কিন্তু হতাশ হইল। তখন সে আবার বলিল, "হ্যাঁ মা! তুই কি সত্যি সত্যিই আমাকে শত্রু ঠাওরালি?" এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া আবার বলিল, "আচ্ছা, বাছা! এখন তুই ভয় পেয়ে আমার কাছে তোর মনের কথা খুল্‌লিনে, বুঝ্‌তে পেরেছি। পরে বলিস্, আমি তোকে তোর আপনার লোকের কাছে নিজে গিয়ে রেখে আস্‌ব।"

এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী মনে মনে কহিলেন, "সর্ব্বনাশ! যা ভেবেছি, তাই। ভাগ্যে মনের কথা খুলিনি। এই লোকটি ডাকাত হইয়াও আজ আমার প্রতি যেরূপ আচরণ করিতেছে, ইহা দেখিয়া, আমি ইহাকে এবং ইহার সঙ্গীদিগকে যেরূপ ভাবিয়াছিলাম, তাহা সত্য নয় বোধ হয়। কেননা ইহারা যদি নিদ্রিতাবস্থায় আমাকে সেই বৃদ্ধার বাটী হইতে ধরিয়া আনিবে, তবে এখন এই লোকটি আমাকে এত স্নেহ করিতেছে কেন?" তিনি মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া কিয়ৎক্ষণ আবার কি ভাবিলেন। ভাবিয়া আবার মনে মনে বলিলেন, "এখনও আমি তলাইয়া কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আচ্ছা, আবার ইহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক।" এই ভাবিয়া তিনি আস্তে আস্তে বলিলেন, "হ্যাঁ গা! কেন তোমরা আমাকে নিদ্রিতাবস্থায় বৃদ্ধার বাড়ী হইতে গোপনে লইয়া আসিলে? তোমাদের মনস্থ কি? আমাকে লইয়া কি করিবে? আমার কাছে ত কিছুই নেই যে, তোমরা লইবে।"

হিরণ্ময়ীর এই কথা শুনিয়া বীরচাঁদ বলিল, "আবার, বাছা! সেই কথা? আমরা ত তোমাকে গোপনে চুরি ক'রে আনিনি। তুমি শঙ্করীনদীর ধারে ভাস্‌ছিলে। তোমার পেটে বিষ ছিল। আমি তা ওষুদ দে বার ক'রে

তোমাকে আরাম ক'রেছি। তুমি বিষে বেহুঁস্—এমন কি মর মর ছিলে ব'লে আগের ব্যাপার কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চ না; তাই আমাদের উপর সন্দেহ কচ্চ। ভাল, বল দেখি,—তুমি আপ্‌নি বিষ খেয়েছিলে, না কেউ তোমাকে খাইয়েছিল? যে বুড়ীর কথা বল্‌ছ, সে কে? তা'র বাড়ী কোথা?"

হিরণ্ময়ী এইবার মনে মনে কতকটা বুঝিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধাই অলঙ্কারের লোভে তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিবার চেষ্টায় শঙ্করীনদীতে ফেলিয়া দিয়াছিল। তিনি এই কথা আভাসে আভাসে বুঝিলেন, কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিতে পারিলেন না। তাহা পারিবারও উপায় নাই। যাহা হউক, এখন দস্যুদিগের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ সন্দেহ রহিল না। তবে কি কতকটা রহিল? হাঁ, তা রহিল। কেননা তিনি এখনও সমস্ত ব্যাপার তলাইয়া বুঝিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "ওগো, সে বুড়ীর বাড়ী বহড়া গ্রামে, তা'র নাম মঙ্গলা। আর আমি কিছুই জানি না। বীরচাঁদের মনে বহড়া ও মঙ্গলা নাম দুইটি জাগিয়া রহিল। সে উহা কএক বার মনে মনে আবৃত্তি করিয়া লইল।

বীরচাঁদ আবার বলিল, "বাছা! কিছু খেতে ইচ্ছে হ'চ্চে কি?"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "না—আমার শরীর এখনও অত্যন্ত অসুস্থ, কিছুই খাইব না।"

বীরচাঁদ বলিল, "তাই ত। আর একটা ওষুদের গাছ এখানে দেখ্‌তে পাচ্চি নে, তা পেলে এখনি তোমার শরীর আরও চাঙ্গা করে দিতেম। যা' হোক, এর পর সেরে যাবে—আর কোন ভয় নেই।"

এ দিকে ক্রমে ক্রমে বেলা শেষ হইয়া আসিতে লাগিল। দস্যুদের নিকট ছোলা ছিল। উহারা তাহারই কিছু কিছু খাইয়া এক প্রকার পিত্ত রক্ষা করিল।

অনন্তর বীরচাঁদ তিন-চারি জন অনুচরকে একটি ডুলী প্রস্তুত করিতে আদেশ দিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ জঙ্গল হইতে বাঁশ কাটিয়া মোটামুটী করিয়া একটী ডুলী তৈয়ার করিল।

এ দিকে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। ক্রমে ক্রমে স্তরের পর স্তর বাঁধিয়া অন্ধকার দেখা দিল, কিন্তু তাহার গর্ভস্থ বৃক্ষ লতা প্রভৃতি আর

স্পষ্টরূপে দেখা দিল না। কিন্তু এক দিকে অন্ধকার পরাজয় স্বীকার করিল। সে কোন্ দিকে?—উপর দিকে। উপর দিকে কি?—না হীরক-বিনিন্দিত শত শত উজ্জ্বল নক্ষত্র, অন্ধকারের স্তরীকৃত আবরণ ভেদ করিয়া ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। নিশাকরের এখনও দেখা নাই। লম্পট পুরুষ যেমন সারারাত্রি বাহিরে বাহিরে থাকিয়া ভোরে পত্নীর নিকট আসিয়া দেখা দেয়, নিশামণিও আজ তেমনি করিয়া রজনীকে দেখা দিবেন।

অনন্তর দস্যুগণ আপন আপন অস্ত্র শস্ত্র ও লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিবার আয়োজন করিতে লাগিল। বীরচাঁদের আদেশে হিরণ্ময়ীর নিকট ডুলী আনীত হইল। বীরচাঁদ হিরণ্ময়ীকে তন্মধ্যে শয়ন করাইয়া লইয়া যাইবার জন্য নিজে প্রস্তুত হইল। হিরণ্ময়ী তদ্দর্শনে কি ভাবিতে লাগিলেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যখন দেখিলেন যে, বীরচাঁদ নিশ্চয়ই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে, তখন তিনি ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ওগো, তোমরা আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে? আমি যাইব না। আমাকে এইখানে রাখিয়া যাও।"

বীরচাঁদ বলিল, "বাছা! তুই নিতান্ত নির্ব্বোধ। এই অন্ধকার রাত্তিরে তুই এখানে একলা থাক্‌বি? তাও কি কখন হয়? এখন এই ডুলীতে শুয়ে আমার সঙ্গে চ, আমার সঙ্গীরা ডুলী বয়ে নিয়ে যাবে।"

হিরণ।—"কোথা লইয়া যাইবে?"

বীর।—"আমরা যে খানে থাকি, সেই খানে।"

হিরণ।—"কেন?"

বীর।—"কোন ভয় নেই।"

হিরণ।—"তবু বল না কেন?"

বীর।—"আমি তোমাকে আমার আপনার মেয়ের মত ভালবাসি ব'লে।"

হিরণ্ময়ী আর কোন কথা কহিলেন না। নীরবে ডুলীর মধ্যে শয়ন করিলেন। কিন্তু মনে মনে যে কত কি ভাবিতে লাগিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

অনন্তর দুই জন দস্যু ডুলী স্কন্ধে করিল এবং বীরচাঁদ ডুলীর পার্শ্বে দাঁড়াইল, তাহার পর সকলে "জয় কালী" বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

খনিগর্ভে মণি।

বীরচাঁদ প্রভৃতি দস্যুগণ হিরণ্ময়ীকে লইয়া সেই ঘোর অন্ধকার রজনীতে ক্রমাগত চলিয়া দশ বার ক্রোশ পথ অতিক্রম করিল। অনন্তর তাহারা অজয় নদের দক্ষিণতটে উপনীত হইয়া বরাবর নদের ধারে পশ্চিম দিকে আরও পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিয়া এক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। এক্ষণে যামিনী যামিনীনাথকে দেখিতে পাইয়া অন্তর্ভেদী পরিহাস-চ্ছলে কপট হাসি হাসিতে লাগিলেন। যামিনীনাথও সেই পরিহাসে অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জায় নিষ্প্রভ হইতে লাগিলেন। খুব হইয়াছে—যেমন কর্ম্ম, তেম্নি ফল!

এমন সময়ে গাছের ডালে কাক ডাকিয়া উঠিল। তখন রজনী ও রজনীপতি চন্দ্রদেব প্রণয়-কলহ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম দিকে গমন করিতে লাগিলেন। কেন?—কারণ কি? কারণ এমন কিছু নয়, তবে কি না উষা তাঁহাদের কলহে জাগিয়াছেন, এখনি আসিয়া ভৎর্সনা করিবেন, এই কারণেই উভয়ে ঝগড়া করিতে করিতে পশ্চিমদিকে চলিলেন। আবার কাকগুলা কা কা করিয়া উঠিল। সারারাত্রি হিম খাইয়া কাকগুলার গলায় সর্দ্দি বসিয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহারা ভোরের বেলা ভাঙা গলায় ভাঙা স্বরে কা কা করিয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে এক একটি করিয়া আরও কত রকম পাখী ডাকিতে লাগিল। প্রভাতবায়ু বিহঙ্গকণ্ঠের সেই সুমধুর ধ্বনি-লহরী বহিয়া নিদ্রিত মানবগণের কর্ণে ঢালিতে লাগিল। তাহাতে কেহ জাগিয়া উঠিল আবার কেহ পাশ ফিরিয়া ঘুমাইল।

বীরচাঁদ স্বীয় অনুচরগণ ও হিরণ্ময়ীকে লইয়া যেস্থানে উপস্থিত হইল, উহা শ্মশান। নিকটে কোন গ্রাম নাই, কিন্তু বহুদূর ব্যাপিয়া অজয় নদের তটে একটা অরণ্য রহিয়াছে। পক্ষিগণ এই অরণ্যের ভিতর হইতেই ভোর ডাক ডাকিয়া উঠিয়াছিল, এখনও ডাকিতেছে। সেই শ্মশানেরর অবিদূরে

এ দিক ও দিক করিয়া বার চৌদ্দ খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খড়ো ঘর। সেই ঘর-গুলির কোন বিলি-ব্যবস্থা নাই—সকল গুলিই যেন বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থিত। বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, ঠিক অরণ্যের সীমান্তে যে একখানি ঘর দেখা যায়, উহাই অপরাপর গুলির অপেক্ষা কতকটা সৌষ্ঠবসম্পন্ন। কিন্তু সেই ঘরটি, পরিবার লইয়া থাকিবার মত ঘর নহে, যেন কোন সন্ন্যাসী বা উদাসীনের ঘর বলিয়া বোধ হয়।

বার তের খানি ঘরের সর্ব্ব-পশ্চাতে যে ঘর খানি, বীরচাঁদ হিরণ্ময়ীকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। বীরচাঁদের আদেশে ভূতলে ডুলী রক্ষিত হইল। হিরণ্ময়ী তন্মধ্য হইতে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া একপার্শ্বে অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বীরচাঁদ ব্যতীত কএক জন দস্যু সতৃষ্ণ নয়নে হিরণ্ময়ীর মুখের দিকে চাহিতে লাগিল, কিন্তু হিরণ্ময়ী অবগুণ্ঠনবতী।

কিয়ৎক্ষণ পরে বীরচাঁদ আঁপন গৃহের দাওয়ার উপর হিরণ্ময়ীকে বসাইয়া সমভিব্যাহারী দস্যুগণকে লইয়া কতকটা দূরে গেল। হিবণ্ময়ী দাওয়ার উপর একাকিনী বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রুপাত হইতে লাগিল।

এ দিকে বীরচাঁদ নিভৃতস্থলে দস্যুগণকে অনুচ্চস্বরে বলিল, "হ্যা দেখ্, তোরা এই মেয়েটিকে আন্‌বার কথা কারো কাছে বলিস্ নি। এমন কি, গুরুঠাকুরও যেন এ ব্যাপার না জান্‌তে পারে।"

এই কথা শুনিয়া এক জন দস্যু বলিল, "তুমি যে এ কথা সকলকে জানাতে বারণ কচ্চ, এর কারণ কি, সর্দ্দার?"

বীর।—"হাজার হৌক তোদের বয়সের সঙ্গে বুদ্ধি সুদ্ধিও কম। একটা কথার দশটা মানে বুঝ্‌তে এখনও তোদের ঢের দেরি আছে।"

সেই দস্যু আবার বলিল, "আছে বলেই ত জিগ্‌গেস্ কচ্চি গো।" এ কথা এরূপ ভাবে বলা হইল যে, তাহাতে কোন পরিহাসের লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়িল। বুদ্ধিমান বীরচাঁদ তাহা ভাবে বুঝিয়া লইল, কিন্তু সময় মত ঠিক উত্তর না দিয়া মনের কথা মনে চাপিয়া রাখিল। কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "ভদ্দরঘরের মেয়েকে খুব সাবধানে রাখ্‌তে হয় রে, বুঝ্‌লি? বিশেষত এ মেয়েটি বিদেশীর বিপদগেরস্ত, আবার এর সঙ্গে আপনার কোন নোক নেই।"

বীরচাঁদের কথা শুনিয়া সে এবং অপর এক জন দস্যু বলিল, "যা বলচ, সর্দ্দার! তা ঠিক্। আমরা তোমার এ কথা মঞ্জুর করি। আচ্ছা, আমরা এ কথা কারো কাছেই পেরকাশ করব না।"

বীর।—"সকলে মা কালীর দিব্যি ক'রে বল্।"

দস্যুগণ।—"মা কালীর দিব্যি।"

বীরচাঁদ তাহাদের এই দিব্য শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল।

অনন্তর দস্যুগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। এ দিকে সূর্য্যদেবও উদয়-গিরির চূড়ায় দেখা দিলেন।

আবার বীরচাঁদ হিরণ্ময়ীর নিকট উপস্থিত হইল। হিরণ্ময়ী বীরচাঁদের দাওয়ার উপর একাকিনী বসিয়া অগাধ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আছেন। প্রতি নিমেষে তাঁহার অন্তঃকরণে নানারূপ চিন্তা, আশঙ্কা, সন্দেহ, কষ্ট প্রভৃতি সমুত্থিত হইয়া তাঁহাকে অতিশয় অস্থির করিয়া তুলিতেছে। বলা বাহুল্য যে, তিনি এইরূপ অসহনীয় অবস্থায় থাকিয়া, সে সময়ে রোদন করিতেছিলেন।

বীরচাঁদ নিকটে গিয়া, হিরণ্ময়ীর দুঃখে দুঃখিত হইল। তাঁহার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাছা! তুমি কাঁদচ কেন? তোমার কোন ভয় নেই। যতক্ষণ বীরচাঁদ বেঁচে আছে, ততক্ষণ তুমি তোমার বাপের বাড়ীতে আছ, এম্নি মনে কর। তুমি আমাকে তোমার শত্রু ব'লে আকুল হয়ো না। একটু স্থির হও, কিছু খাও, তার পর আমি তোমাকে অনেকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করব, তুমিও তা'র ঠিক্ ঠিক্ উত্তর দিও।" বীরচাঁদ এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চলিয়া গিয়া, কতকগুলি চিঁড়া মুড়্কী ও কতকটা দুগ্ধ আনিল। সে হিরণ্ময়ীকে উহা খাইতে অত্যন্ত অনুরোধ করিল। হিরণ্ময়ীও তাহার উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া, উক্ত তিন দ্রব্য একত্র মিশাইয়া, কিঞ্চিৎ খাইলেন। অনন্তর বীরচাঁদ হিরণ্ময়ীকে আপনার গৃহের মধ্যে গোপনে রাখিল। যে কয় জন জানে, তদ্ব্যতীত আর কেহ যাহাতে না জানিতে পারে, সে সেইরূপ করিয়া তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিল। বলিল, "দেখ, মা! তুমি ঘরের বাইরে যেও না।"

হিরণ্ময়ী তাহাই স্বীকার করিলেন।

অনন্তর বীরচাঁদ কার্য্য সারিয়া, তথা হইতে চলিয়া গেল। যেখানে অধীনস্থ দস্যুগণ অবস্থান করিতেছে, সে সেথানে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা এতক্ষণ তাহারই অপেক্ষা করিতেছিল, এক্ষণে তাহাকে পাইয়া সকলে মিলিয়া সেই সকল লুণ্ঠিত দ্রব্যের যথাযথ অংশ করিয়া লইল। অংশ করা শেষ হইলে পর, বীরচাঁদ তথা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়, আবার এক বার বলিয়া আসিল, "দেখিস্ রে, তোদের পেট যেন মেয়ে মানুষের পেট্ হয় না। খুব সাবধান!—খুব সাবধান! মেয়েটির কথা কারু কাছে বলিস্ নি।"

তাহারা সকলে মিলিয়া বলিল, "সে কি কথা, সর্দ্দার! তুমি বার বার যে বিষয় আমাদের চেপে রাখ্‌তে বল্‌চ, আমরা কি, সে কথা কখন পের্‌কাশ কর্‌তে পারি? তোমার কোন চিন্তে নেই।"

অনন্তর বীরচাঁদ তথা হইতে চলিয়া গেল। ও দিকে দুই জন দস্যু বীরচাঁদ ও হিরণ্ময়ী সম্বন্ধে গোপনে কি বলা কওয়া করিতে লাগিল, তাহা বুঝিতে পারা গেল না।

এ দিকে হিরণ্ময়ী বীরচাঁদের গৃহমধ্যে একাকিনী বসিয়া ভাবিতেছিলেন, এক এক বার অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে বলিতেছিলেন, "হায়, আমি কি হত-ভাগিনী! আমার মত স্ত্রীলোক যেন এ পৃথিবীতে আর কখন না জন্মায়! আমার আশা ভরসা সমস্তই পুড়িয়া ছাই হইল, কিন্তু হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণা-নল কোন্ মতে নিবিল না! কেনই বা নিবিবে? ছাইচাপা আগুন কখন কি নিবে? আমার এ মনের আগুন, সেই ছাইচাপা থাকিয়া ক্রমশই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। উঃ, আর যে সহিতে পারি না। বৃদ্ধা আমাকে বিষ খাওয়াইয়াছিল, বেশ করিয়াছিল, কিন্তু এ হতভাগিনী তাতেও মরিল না। মৃত্যুও কি আমাকে মহাপাপিনী বলিয়া উদ্গার করিয়া ফেলিয়া দিল! হায় হায়! এখনও আমার কপালে যে কত কষ্ট আছে, তা জগদীশ্বরই জানেন। তা যাই হউক, আমি যে আর জীবন-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না! আমার মৃত্যু বই যে আর গতি মুক্তি নাই! আমি কি মরিতে পারিব না? আমাকে কি চিরকাল এই যন্ত্রণানলে পুড়িতে হইবে? না, তা হইবে না। আজই রাত্রিকালে আমি এ পাপপ্রাণ পরিত্যাগ করিব। আসিবার

সময় আমি এই স্থানের অতি নিকটেই এক নদী দেখিয়াছি, আজ রজনীতে সেই নদীই আমার চিরবিশ্রামের স্থল হইবে। আমি পুণ্যসলিলা ভাগীরথীতে মরিতে পারিলাম না। শঙ্করী নদীতে মরিয়াও বাঁচিয়া উঠিলাম, কিন্তু এবার নিশ্চয়ই এই নদীতে ঝাঁপ দিব। এখন দিন; চারি দিকে লোক জন, কাজেই আমাকে চুপ্ করিয়া এই ঘরের ভিতর থাকিতে হইল। কিন্তু আজ রাত্রিকালে এই চিরযন্ত্রণাময়ী হিরণ্ময়ী সকল জ্বালা জুড়াইবেই জুড়াইবে।" এই বলিয়া তিনি উদাসিনীর ন্যায় কি ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে বীরচাঁদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্মশান।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে শ্মশানের কথা বলা হইয়াছে, এই পরিচ্ছেদে তাহার বিষয় আরও কিছু বিশদরূপে বলা উচিত হইতেছে।

অজয় নদের দক্ষিণ তটে সেই ভীষণ শ্মশান অবস্থিত। তাহার সেই অগাধগম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া জীবন্ত ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, মৃত ব্যক্তি পর্য্যন্তও যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। চতুর্দ্দিকে দূরব্যাপিনী বালুকা রাশি ধূ ধূ করিতেছে। তদুপরি প্রভাতসূর্য্যের ঈষদুষ্ণ-কিরণ-লহরী গড়াইয়া পড়িতেছে। ওদিকে আবার অজয়ের চিরচলন্ত স্রোত শ্মশানভূমির অন্তা-রেখা ধৌত করিয়া আপন মনে গড়াইয়া যাইতেছে। যে ব্যক্তি মানবজগতের মর্ম্মতল পর্য্যন্ত ভেদ করিয়াছে, সেও আজ প্রভাতে এই শ্মশান দেখিয়া উদাসচিত্তে অনন্ত চিন্তাসাগরের অনন্ত স্রোতে পড়িয়া গড়াইয়া যাইতেছে। বিশ্বনাট্যশালার যবনিকাস্বরূপ এই শ্মশান। মানুষ ভূমিষ্ঠ হইবার দিবস হইতে নানারূপ দৃশ্যপট পরিবর্ত্তন করিয়া নানাবিধ অভিনয় করিতে থাকে, কিন্তু এই স্থানে তাহার রঙ্গভৌমিক রঙ্গলীলা পরিসমাপ্ত হইয়া যবনিকা পতন হয়। এই যবনিকার বহির্ভাগে যে কি আছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে যে যাহা বলে, তাহা তাহার কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এই শ্মশানের যেখানে সেখানে চিতা, অঙ্গার, দগ্ধকাষ্ঠ, ছিন্ন কন্থা ও ছিন্ন বস্ত্র, ভগ্ন শঙ্খভূষণ, লৌহভূষণ, ভগ্ন খট্টা, কঙ্কাল, খর্পর, ভগ্নাস্থি প্রভৃতি বিশৃঙ্খলভাবে পড়িয়া আছে। এই সকল পদার্থ অন্য স্থানে, এখানে একটি আবার সহস্র হস্ত দূরে একটি করিয়া পড়িয়া থাকিলে, হৃদয়ে যে ভাবের উদ্রেক হইত, কিন্তু এখানে সে ভাবের তেমন কিছু উপলব্ধি হয় না। যেখানে যে বস্তু থাকিলে অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠে, এই শ্মশানেই তাহা লক্ষিত হইয়া থাকে। শ্মশানের মৃত্তিকা তোমার আমার শরীর, বায়ু তোমার আমার নিশ্বাস এবং ভাব তোমার আমার জীবন। আমাদের যাহা কিছু, তৎসমস্তই এই শ্মশানের। শ্মশান ভিন্ন আমাদের এবং আমরা ভিন্ন শ্মশানের কিছুই নাই। তুমি যত পুণ্য সঞ্চয় কর না কেন, কিন্তু এই স্থানে তোমাকে আসিতেই হইবে। আমি যত পাপ করি না কেন, কিন্তু আমাকেও এই স্থানে উপস্থিত হইতেই হইবে। তুমি আস্তিক আর আমি নাস্তিক, কিন্তু আমাদের উভয়কেই এই স্থির-গম্ভীর শ্মশানের আশ্রয় লইতেই হইবে। শ্মশান ব্যতীত আমাদের কিছুই নাই। সাহসীর সাহস, ভয়ার্ত্তের ভয়, বীরের বীরত্ব, কাপুরুষের কাপুরুষত্ব, বলীর বল দুর্ব্বলের দৌর্ব্বল্য, প্রেমিকের প্রেম, সুখীর সুখ, দুঃখীর দুঃখ, সুস্থের স্বাস্থ্য, পীড়িতের পীড়া, সমস্তই স্ব স্ব অধিকারীর সহিত এই প্রেত-ভূমিতে একত্রীভূত হয়। অহো, কি অপূর্ব্ব রঙ্গভূমি!—কি ভীষণ স্থান!—কি মহাশিক্ষার মহাচিত্র!

তুমি রাজা, আমি প্রজা, সুতরাং এখন তোমাতে আমাতে ভিন্ন ভাব রহিয়াছে, কিন্তু কিছু দিন পরে এই শ্মশানে আর তাহা থাকিবে না। এখানে তুমিও যে—আমিও সে। এখানে বৈষম্যের প্রবেশাধিকার নিষেধ। কেবল সাম্যেরই একাধিপত্য। পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনোরাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বৈষম্য যতই কেন তেজঃ প্রকাশ করুক্ না, কিন্তু এই মহা-স্থানের অবারিত তোরণসীমায় কোনরূপ বৈষম্যের গর্ব্ব খাটিবে না। যেরূপ ধর্ম্মের নিকট অধর্ম্মের পরাজয়, সেইরূপ এখানে সাম্যের নিকট বৈষম্যের সর্ব্বস্বান্ত হইবেই হইবে। এই অনন্ত বিশ্বমণ্ডলের মধ্যে সকলেই যে এক সমান, তাহার প্রমাণস্থল এই মহাশ্মশান। যদি তুমি আমার কথার

বিশ্বাস না কর, তবে একবার এই শ্মশানবক্ষে নিমীলিত নেত্রে দাঁড়াইয়া ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে এখনি জানিতে পারিবে, কে যেন অলক্ষিত ভাবে আসিয়া তোমার কর্ণে জলদগম্ভীর স্বরে বলিবে—"জগতের সমস্তই এক, সুতরাং সমান।" ভাই! তখন তুমি আমাকে তোমার একজন বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিবে।

এই অজয়নদতীরস্থিত শ্মশানে ভৈরবানন্দ নামে একজন কাপালিক বাস করিতেন।

ঊনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

ভৈরবানন্দ কাপালিক।

ভৈরবানন্দ কাপালিক জ্ঞানানন্দ কাপালিকের শিষ্য। জ্ঞানানন্দ কাপালিক বহুকাল হইতে এই শ্মশানে যোগসাধন করিতেন। তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। এমন কি, তিনি তন্ত্রোক্ত বিধিব্যবস্থানুসারে অনেক অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইতে এবং অনেকের অত্যুৎকট রোগ বিনাশ করিতে পারিতেন। তাঁহার এতাদৃশী ক্ষমতা দর্শনে অত্রস্থ সকলেই তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা ও ভক্তি করিত। তিনি একশত এগার বৎসর পৃথিবীর ও আপনার হ্রাসবৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তনাদি দর্শন করিয়া আপন ইচ্ছায় অজয় নদের গর্ভে দণ্ডায়মান থাকিয়া, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

ভৈরবানন্দ কাপালিক, জ্ঞানানন্দের মৃত্যুর দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে, তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। জ্ঞানানন্দ আরও কএক বৎসর জীবিত থাকিলে ভৈরবানন্দের জ্ঞানশিক্ষার সবিশেষ উপায় হইত, কিন্তু দুই তিন বৎসরে তেমন কিছুই হয় নাই—অতি অল্প স্বল্পই হইয়াছিল। তথাপি লোকে ইঁহাকে একজন দেবসদৃশ তান্ত্রিকের শিষ্য বলিয়া ভক্তি করিতে ত্রুটি করিত না। এই শ্মশান ভৈরবানন্দের যোগপীঠ এবং পূর্ব্বে যে মঠসদৃশ কুটির কথা বলিয়াছি, উহা ইঁহার বিশ্রাম স্থান।

এক্ষণে প্রাতঃকাল। ভৈরবানন্দ স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। ইনি একজন বলিষ্ঠ যুবা। বয়ঃক্রম আজিও ত্রিংশবর্ষ স্পর্শ করে নাই। ইনি কখন রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র, কখন গৈরিকরঞ্জিত সূত্রবাস পরিধান করিয়া থাকেন। অদ্য পট্টবসন পরিধান করিয়াছেন। কপালে সিন্দূরের তিনটি রেখা; গলদেশে, বাহুমূলে ও মণিবন্ধে সুন্দর রুদ্রাক্ষের মালা; মস্তকে ভ্রমরকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ; চক্ষুযুগল রক্তবর্ণ; মুখমণ্ডলে নাতিদীর্ঘ ও নাতিহ্রস্ব শ্মশ্রুভার এবং গোঁফ। স্কন্ধদেশে যজ্ঞসূত্র বিলম্বিত রহিয়াছে।

ভৈরবানন্দ শ্মশানে উপস্থিত হইয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানে একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিছাইয়া উপবেশন করিলেন। ঘৃত, চন্দন, পুষ্প, জল ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি শক্তিপূজার উপকরণগুলি সম্মুখভাগে রক্ষা করিলেন। অনন্তর যোগসাধনের উপক্রম করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে বীরচাঁদের দলভুক্ত দুই জন দস্যু তাঁহার নিকট আসিয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া দূরে দণ্ডায়মান রহিল। ভৈরবানন্দ তাহাদিগকে বসিতে বলিয়া, আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন সেই দস্যুদ্বয় উপবেশন করিয়া, তাঁহাকে ধীরে ধীরে বলিল, "দেখুন, ঠাকুর মশাই! একটি কথা বল্‌ব, কিন্তু ভয়ে বল্‌তে পাচ্চিনি।"

ভৈরবানন্দ বলিলেন, "কাহার ভয়?"

প্রথম দস্যু বলিল, "সর্দ্দারের।"

ভৈরবানন্দ।—"বীরচাঁদের?"

উভয়ে।—"আজ্ঞে।"

ভৈ।—"কোন ভয় নেই, তোরা বল্। আমাকে কোন কথা বলিলে বীরচাঁদ রাগ করিবে না। সে আমাকে বড় ভক্তি করে।"

প্রথম দস্যু কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "আজ্ঞে, তা জানি; তবে কি না সে বড়রাগী, পাছে কি কত্তে কি করে। তা যা হৌক, আপনকার ভালর কথা বল্‌লে যদিও আমাদের কোন অমঙ্গল ঘটে—ঘটুক।" সে এই কথা বলিয়া, তাহার সঙ্গীর কর্ণমূলে ফুস্ ফুস্ করিয়া একটি কি কথা বলিল।

তখন প্রথম দস্যু চারি দিকে দুই তিন বার তাকাইয়া দেখিয়া বলিল, "ঠাকুর মশাই! আপুনি বলেছিলে যে, কি এক রকম যোগ কর্‌বার তরে একটি খুব সুন্দরী যুবতী মেয়ে নোক চাই। তা আমরা এত দিন ধ'রে খুজে খুজে আজ পেয়েছি।"

এই কথা শুনিয়া ভৈরবানন্দের কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "সে যুবতীটিকে কোথা পেলি? এখন সে কোথায় আছে?"

দ্বিতীয় দস্যু।—"শঙ্করী নদীতে তাকে পেয়েছি। সে বিষে জর জর মর মর হয়ে ভাস্‌ছিল। এখন্ বেশ সেরে উঠেছে। এখন্ সে সদ্দারের ঘরে আছে। সদ্দার তাকে গোপনে রেখেছে আর আপনকারকে তার কথা বল্‌তে আমাদের বারণ করেছে।"

ভৈ।—"বীরচাঁদ তাকে কেন গোপনে রেখেছে?"

দ্বিতীয় দস্যু।—"সে নিজে গিয়ে তাকে তার বাপের না মামার বাড়ী রেখে আস্‌বে।"

ভৈ।—"আচ্ছা, তা যেন হইল, কিন্তু সে আমাকে এ কথা বলিতে কেন বারণ করিয়াছে?" এই কথাগুলি উচ্চারণ করিবার সময় ভৈরবানন্দের মুখমণ্ডলে ঈষৎ ক্রোধের আবির্ভাব হইল।

প্রথম দস্যু।—"তবু আপুনি বল কি না সদ্দার আপনকাকে ভক্তি করে। বল্‌তে কি, সদ্দার তেমন নোক নয়, ঠাকুর মশাই।"

ভৈরবানন্দ কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিতে লাগিলেন। এই দুই জন দস্যুর মুখে এই কথা শুনিবার পূর্ব্বে তাঁহার যেরূপ ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, এখন্ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এক্ষণে তাঁহার অন্তঃকরণে দুইটি কুপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল।—তন্মধ্যে একটি ক্রোধ—বীরচাঁদের উপর এবং অপরটি লোভ—যুবতী লাভের।

ভৈরবানন্দের চিত্ত ক্রোধ এবং লোভে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তাঁহাকে প্রকৃত ভৈরবানন্দ বলিয়া বোধ হইল। অনন্তর তিনি কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে বলিলেন, "হাঁ দেখ, তোরা এক কাজ কর। সেই যুবতীকে আমার নিকট লইয়া আয়।"

এই কথা শুনিয়া দস্যুদ্বয় কিঞ্চিৎ ভীত হইল। বলিল, "সদ্দার থাক্‌তে,

কেমন ক'রে তাকে এখানে আন্‌ব?—সর্দ্দার জান্‌তে পার্‌লে আমাদের সর্ব্বনাশ ঘট্‌বে!"

তখন ভৈরবানন্দ কি এক মৎলব ঠাওরাইলেন। ঠাওরাইয়া বলিে "হ্যা দেখ, তোরা অবিলম্বে বীরচাঁদকে আমার কাছে ডাকিয়া আন্। ত তাহাকে কৌশল করিয়া অনেক দূরে পাঠাইয়া দিতেছি। তাহার আ- আর ফিরিয়া আসিবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। তোরা এই সুযোে তাহার গৃহ হইতে সেই যুবতীকে আমার নিকট অনায়াসে আনিতে পারিবি অথচ কোন গোলযোগ ঘটিবে না।"

দস্যুদ্বয় এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইল। তৎক্ষণাৎ তথা হইতে উভয়ে বীরচাঁদের নিকট প্রস্থান করিল। এই দুই জন দস্যু সেই নি আর কেনা। হিরণ্ময়ীর উপর ইহাদের মন্দ অভিপ্রায় ছিল, কেবল বীর চাঁদের ভয়ে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই বলিয়াই তাহার উপর এ ক্রোধ ও প্রতিহিংসা। এক্ষণে ইহারা বীরচাঁদকে অপদস্থ ও জব্দ করিবার অভিপ্রায়েই অন্য উপায় না দেখিয়া ভৈরবানন্দের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে। ঢলিয়া পড়িবার বিশেষ কারণ এই যে, ভৈরবানন্দ কাপালিক বীরচাঁদ প্রভৃতি দস্যুদিগের গুরু। তাহারা ভৈরবানন্দের গুরু জ্ঞানানন্দের স্থাপিত কালী-দেবীর উপাসক। তাহারা যখন কোথাও ডাকাইতি করিতে যাইত, তখন সেই কালীর পূজা করিয়া ভৈরবানন্দের আজ্ঞা লইয়া শুভযাত্রা করিত। ভৈরবানন্দ কালী ঠাকুরাণীর প্রসাদে দস্যুদিগের নিকট হইতে পূজা দক্ষিণা ও দর্শনীর হিসাবে অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সেই সকল অর্থ তাঁহার কালীবাড়ীর ভূগর্ভে কলসপূর্ণ হইয়া প্রোথিত ছিল।

দস্যুদ্বয় চলিয়া গেলে, ভৈরবানন্দ মনে মনে এই কথাগুলি বলিলেন, "এত দিন পরে আমার যোগসাধনের প্রকৃত পথ পরিষ্কৃত হইল। তন্ত্রে লিখিত আছে, একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যুবতীকে সম্মুখে বসাইয়া, কামবৃত্তিকে বশীভূত করত লক্ষ জপ করিতে পারিলে সিদ্ধ হওয়া যায়। তখন অনায়াসে অলৌকিক কার্য্য সাধন ও উৎকট রোগসমূহের প্রতীকার করা যাইতে পারে। এক্ষণে আমি তাহাই করিতে চেষ্টা করিব। বীরচাঁদ আমার প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া সেই যুবতীকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। সে নির্ব্বোধ, তাই

প করিয়াছে। যাই হউক, তাহার নিকট চাহিলে, সে যুবতীকে ছাড়িবে বোধ হয়। সুতরাং কৌশল করিয়া তাহার গৃহ হইতে যুবতীকে আনিতে ল।” তিনি এইরূপ আরও কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে বীরচাঁদের সহিত পুনর্ব্বার নিধে ও কেনা তথায় উপস্থিত ইল। বীরচাঁদ আসিয়াই ভৈরবানন্দকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি-টে দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন ভৈরবানন্দ বলিলেন, “হ্যাঁ দেখ, বীরচাঁদ! তোমাকে একটা কাজ করিতে হইবে।”

বীর।—“আজ্ঞে করুন।”

ভৈ।—“তুমি এখন স্নানাহার করিয়া অবিলম্বে মাহেশ্বরীপুর গমন কর।”

বীর।—“কি দরকার, প্রভু!”

ভৈ।—“আমি কাল শেষ রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, কে যেন আমাকে বলিল, ‘ভৈরবানন্দ! তুমি কল্য প্রাতে তোমার প্রধান সেবক বীরচাঁদকে মাহেশ্বরীপুরের মাহেশ্বরীর দেবীর নিকট পাঠাইয়া দিয়া, তাঁহার স্নানজল ও সিন্দুর আনাইয়া পান ও কপালে ধারণ কর। তাহা হইলে তোমার অবিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি হইবে।’”

বীরচাঁদ এই কথাগুলি স্থির হইয়া শুনিল। শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, “প্রভু! আর কাকেও পাঠা’লে কি হ’বে না?”

ভৈরবানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আরে, পাগল! তোকেই যেতে বলেছে যে।”

বীরচাঁদ মনে মনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। গভীর চিন্তা আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। সে মনে মনে ভাবিল, “তাই ত, কি করি, মেয়েটিকে তাদের বাড়ীতে রেখে আস্‌বার আগে কি করেই যাই। আবার না গেলেও গুরুদেব রাগ কর্‌বেন। বিশেষত স্বপ্নের কথা কেমন করেই বা লঙ্ঘন করি। মাহেশ্বরীপুর এখান থেকে অনেক দূর। এখন গেলে আজ আর ফির্‌তে পার্‌ব না—সেই কাল সকাল বেলা। যাই হোক, মেয়েটিকে খুব গোপনে সাবধান ক’রে রেখে যাই। মা কালীই তাকে রক্ষে কর্‌বেন।”

বীরচাঁদ এইরূপ ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, তবে আমি শীগগীর শীগগীর নেয়ে খেয়ে নি গিয়ে।"

ভৈ।—"আচ্ছা, যাও। বিলম্ব করিও না।"

বীরচাঁদ ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিল।

বীরচাঁদ প্রস্থান করিলে পর, নিধে আহ্লাদিত ও চমৎকৃত হইয়া ভৈরবানন্দকে বলিল, "ঠাকুর মশাই! আপনকার ধন্যি বুদ্ধি যা হৌক্।"

কেনা এই কথায় সায় দিল।

অনন্তর ভৈরবানন্দ বলিলেন, "হ্যা দেখ্, তোরা সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পরেই সেই যুবতীকে আমার নিকট আন্‌বি। অন্য লোক জন যেন জান্‌তে না পারে।"

নিধে তৎক্ষণাৎ বলিল, "আজ্ঞে, তা আবার বল্‌তে? খুব সাবধানে না আন্‌লে কেউ যদি দেখ্‌তে পায়, তা হ'লে সদ্দার জান্‌তে পার্‌বে। সে জান্‌তে পার্‌লেই আমাদের বিপদ।"

ভৈ।—"আচ্ছা, কিরূপ গোপনে তাহাকে আনিবি?"

এবার কেনা উত্তর দিল, "ঠাকুর মশাই! আমি এক ফিকির জানি। সেই ফিকির খাটিয়ে আমি তাকে আন্‌ব। এমন্ কি—সেও চিন্‌তে পার্‌বে না।"

ভৈ।—"ভাল ভাল, দেখিস্, খুব সাবধান।"

কেনা।—"তবে এখন্ আমরা খাই দাই গে আর এ বিষয়ের সন্ধান রাখিগে।"

ভৈ।—"আচ্ছা, যা।"

দস্যুদ্বয় ভৈরবানন্দ কাপালিককে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

অনন্তর ভৈরবানন্দ যোগ করিতে বসিলেন। কিন্তু আজিকার যোগে তাঁহার সুযোগ কি দুর্যোগ ঘটিল, তাহা বলিতে পারি না। ভৈরবানন্দের চিত্ত আজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, চঞ্চল এবং কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ক্রমে ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিল। ওদিকে বীরচাঁদ হিরণ্ময়ীকে এক প্রকার বুঝাইয়া, সাবধানে থাকিতে বলিয়া প্রস্থান করিল। আর এ দিকে ভৈরবানন্দ যোগসমাপনান্তে যোগপীঠ পরিত্যাগ করিয়া আশ্রমে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

কালীবাড়ী।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা আসিল। আকাশে তারা হাসিল, অজয়নদের জলে প্রতিবিম্ব ভাসিল। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

এদিকে হিরণ্ময়ী একাকিনী বীরচাঁদের গৃহে বসিয়া আছেন। নানারূপ আশঙ্কায় তাঁহার আপাদমস্তক কাঁপিতেছে—মর্ম্মের পরতে পরতে যন্ত্রণা ভীষণরূপে নৃত্য করিতেছে। এতাদৃশ ভীষণ অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও তিনি আপনার অভীষ্ট সাধনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে ভাবিয়াছিলেন, রাত্রিকালে অজয়ের জলে ঝাঁপ দিবেন। এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত। তিনি মনে মনে নানারূপ চিন্তা ও কল্পনা করিয়া গৃহ হইতে যেমন বহির্গত হইয়া কএক পদ অগ্রসর হইলেন, অমনি পশ্চাদ্ভাগ হইতে সহসা দুই জন লোক বস্ত্র দিয়া তাঁহার চক্ষু বাঁধিয়া, মুখ চাপিয়া ধরিল। তিনি ভয়ে চীৎকার করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না—চীৎকার শব্দ বাহির হইল না। চক্ষু আবদ্ধ হওয়াতে ধৃতকারী ব্যক্তিদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন না। কেবল ঘোরতর ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেলেন।

সেই দুই জন লোক তাঁহাকে কোলপাঁজা করিয়া অজয় নদের একটি নির্জ্জন দেশে লইয়া যাইতে লাগিল। এরূপ করিয়া লইয়া যাওয়াতে তাহাদের মনে যে, কোন দুরভিসন্ধি ছিল, তাহা প্রকাশ পাইল। কিন্তু হিরণ্ময়ী সৌভাগ্যক্রমে সেই দুরাত্মাদের দুরভিসন্ধির হাত এড়াইলেন। সহসা সেখানে অপর একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল।

আগন্তুক ব্যক্তি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, তোরা ইহাকে লইয়া এদিকে যাইতেছিস্ কেন? আমার কাছে না লইয়া যাইয়া এদিকে লইয়া যাইবার কারণ কি?"

তাহার এই কথা শুনিয়া, সেই দুই জন ব্যক্তির মধ্য হইতে একজন কৌশল খাটাইয়া বলিল, "আড়ালে আড়ালে না নিয়ে গেলে, যদি কেউ

দেক্‌তে পায়, তবেই ত মুস্কিল, তাই এদিক্‌ দিয়েই আপনকার কাছে এঁকে নিয়ে যাচ্ছিলেম।”

আগন্তুক ব্যক্তি তাহাই বিশ্বাস করিল।

অনন্তর তিন জনে হিরণ্ময়ীকে লইয়া অতি শীঘ্র তথা হইয়া চলিয়া গেল। অপর কেহ তাহা দেখিতে পাইল না।

এই নির্ম্মম ব্যক্তিদের হস্তে পড়িয়া হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে যে কিরূপ ঘাত প্রতিঘাত হইতে লাগিল, তাহা খুলিয়া বলিতে পারে, এমন্ লোক এই পৃথিবীতে নাই। হা হতভাগিনি হিরণ্ময়ি! তোর কপালে এতও ছিল। হায়, কি অশুভক্ষণেই তুই বাড়ী ছাড়িয়াছিলি! জগদীশ্বর! বিপন্না হিরণ্‌কে রক্ষা কর। তুমি বই এখন ইহার আর কেহই নাই।

কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে আগন্তুক ব্যক্তি বলিল, “হ্যা দেখ্‌ নিধে। হ্যা দেখ্‌ কেনা! তোরা একে নিয়ে আমার সঙ্গে বরাবর কালীবাড়ী চল্।”

এই আগন্তুক ব্যক্তিই ভৈরবানন্দ কাপালিক।

উভয়ে বলিল, “যে আজ্ঞে!” কিন্তু মনে মনে বলিতে লাগিল, “ঠাকুর মশাই! তুমি হঠাৎ এখানে এসে আমাদেরকে আশায় বঞ্চিত ক’রে ফেল্লে। যা হ’ক্‌, যার কপালে যা আছে, সে তা ভোগ কর্‌বেই কর্‌বে।”

অনন্তর তিন জনে হিরণ্ময়ীকে লইয়া কিয়দ্দূর গমন করত একটা বনের ভিতর প্রবেশ করিল। সেই অরণ্য অজয় নদের তীরে বহুদূর ব্যাপিয়া অবস্থিত। তিন জনে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কিয়দ্দূর গমন করত একস্থানে দাঁড়াইল। সেই স্থানের চারি দিকেই ঝোপ। ভৈরবানন্দ আপন কটিদেশ হইতে দশটি চাবি বাহির করিয়া বামহস্তে রক্ষা করিলেন। দক্ষিণ হস্তে তথাকার ভূমি হইতে কতকগুলা ডাল পালা ঘাস পাতা সরাইয়া ফেলিলেন। তাহার পর সেই দশটা চাবিতে দশটা বড় বড় তালা খুলিলেন। খুলিয়া একটা চতুষ্কোণাকার কপাটপট্ট তুলিয়া ফেল্লিলেন। উহা তুলিবামাত্র তন্মধ্যে একটি সুড়ঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইল। ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যভাগ সাধারণতঃ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এক্ষণে আবার রাত্রিকাল বশতঃ উহা আরও গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হইয়া রহিয়াছে।

ভৈরবানন্দ সর্ব্বপ্রথমে সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি দীপ জ্বালি-

লেন। তাহার পর সেই আলোক ধরিয়া দুরাত্মা নিধে এবং কেনা হিরণ্ময়ীকে লইয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। উপরের কপাট পড়িল।

সেই সুড়ঙ্গের সর্ব্বশেষের দিকে কালীদেবীর গৃহ। সেই গৃহের মধ্যে একটি বৃহৎ পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। ঐ মূর্ত্তিকে 'দস্যুকালী' বা 'ডাকাতে কালী' বলিয়া অভিহিত করিলে অত্যুক্তি হয় না। মূর্ত্তিটি দেখিলে হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে। আবক্ষলম্বিত সুদীর্ঘ করাল রসনা। উহা ছাগ, মেষ, মহিষ, এমন কি নররক্তেও মধ্যে মধ্যে রঞ্জিত হইয়া থাকে। রসনার উপরিভাগে সুতীক্ষ্ণ বিকট দশনশ্রেণী। বড় বড় গোলাকার চক্ষুযুগল যেন ঘূরিতেছে। আবার ললাট-চক্ষু হইতে যেন অগ্নিশিখা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সুদীর্ঘ নাসিকা। আলুলায়িত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি দেহ বর্ণের সহিত মিশ্রিত হইয়া অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়াছে। মূর্ত্তিটি নগ্না—কেবল কটিতটে প্রকৃত অস্থিমালা, একটির পর একটি করিয়া গায়ে গায়ে ঝুলিতেছে। কণ্ঠদেশ হইতে পাদপর্য্যন্ত প্রকৃত নরমুণ্ডমালা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সেই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি চতুর্ভুজবিশিষ্টা। ঊর্দ্ধদ্বিভুজে দুই খানি সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ এবং নিম্নদ্বিভুজে দুইটা বড় বড় প্রকৃত নরমুণ্ড। কটিতটবেষ্টিত নরহস্তশ্রেণীতে এবং বক্ষোলম্বিত ও করধৃত নরমুণ্ডগুলিতে এক্ষণে আর মাংস, বসা, চর্ম্ম নাই—কেবল কঙ্কালসার হইয়া আছে। কালীর পদতলে ভূতনাথ ভৈরবের শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। তাহাতে অস্থি-ভূষণসমূহ সজ্জিত রহিয়াছে। সেই উভয় মূর্ত্তির একত্র সমাবেশ দর্শনে দর্শকের মনে সাক্ষাৎ বিশ্বসংহারীর সহিত বিশ্বসংহারিণীর ছায়া জাগিয়া উঠে।

কালীর গৃহের দুই পার্শ্বে আরও চারি খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ। কালীর সম্মুখে একটি বৃহৎ যূপকাষ্ঠ (হাড়িকাঠ) প্রোথিত আছে। উহার চতুঃপার্শ্বে শোণিতরেখাবলী অঙ্কিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই হাড়িকাঠে অনেক মেষ, মহিষ, ছাগ ও মনুষ্য নিহত হইয়াছে। কালীর গৃহের মধ্যে সুরা-গন্ধের সহিত রক্তচন্দনরঞ্জিত রক্তজবার সুগন্ধ মিশ্রিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভরিয়া আছে। কালীর সম্মুখে একটি পিত্তলনির্ম্মিত ঘট। উহার উপরিভাগে আম্রশাখার উপর একটি নারিকেল স্থাপিত আছে। এতদ্ব্যতীত দস্যুপ্রথানু-যায়ী শক্তিপূজার অন্যান্য উপকরণসমূহ এদিকে ওদিকে সংরক্ষিত আছে।

ভৈরবানন্দ হিরণ্ময়ীকে লইয়া একটি গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুই জন দস্যুও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তথায় হিরণ্ময়ীর নয়নবন্ধনী উন্মোচিত হইল। তিনি প্রথম দৃষ্টিপাতে সেই তিন জনকে দেখিয়া ভয়ে ও লজ্জায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া ভৈরবানন্দ "ভয় নেই—ভয় নেই" বলিয়া অনবরত আশ্বাস দিতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ী যে, নিধে ও কেনাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, তাহা যেন ঠিক করিতে করিতেও কৃতকার্য্য হইলেন না—ঘোর ধাঁধা লাগিয়া গেল। তাঁহার চক্ষে ভৈরবানন্দ কাপালিক যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ বোধ হইল।

হিরণ্ময়ী ক্রমে ক্রমে এতদূর ভীত ও বিহ্বল হইলেন যে, তাঁহার আত্মা-পুরুষ পর্য্যন্ত শুকাইয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গে দর দর ধারে স্বেদোদ্গম হইতে লাগিল—ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল—প্রাণ যেন আন্ চান্ করিতে লাগিল। তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। তিনি ভুমিতলে পড়িবামাত্রই একজন দস্যু অন্য গৃহ হইতে জল আনিল। অপর জন বাতাস করিতে লাগিল। ভৈরবানন্দও আস্তে আস্তে বাতাস করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল ধরিয়া মুখে জল প্রয়োগ করিতে করিতে হিরণ্ময়ীর চেতনা হইল। তিনি অত্যন্ত ভয়ব্যাকুলচিত্তে কাঁদিতে লাগিলেন।

ভৈরবানন্দ তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। হিরণ্ময়ীর কর্ণে কাহারই সান্ত্বনাবাক্য স্থান পাইল না। তখন ভৈরবানন্দ মনে মনে ঠিক্ করিলেন যে, "এক্ষণে ইহার সহিত কোন কথা কওয়ায় ফল নাই। এক্ষণে এই যুবতী নিতান্ত ভীত হইয়াছে। কল্য আবার আসিয়া ইহাকে বুঝাইব। যাই হ'ক, এই রমণী হইতেই আমার বিশেষরূপে যোগ-সাধন হইবে।" এই ভাবিয়া তিনি সঙ্গীদ্বয়কে কানে কানে বলিলেন, "এখন্ আমরা এখান থেকে যাই চল্। কেন না, এই যুবতী আমাদিগকে দেখিয়া যার পর নাই ভয় পাইতেছে। আমি আবার কাল আসিয়া ইহাকে বুঝাইব।"

তাহারা ভৈরবানন্দের কথায় সায় দিল। অনন্তর তিন জনে হিরণ্ময়ীকে ত্যাগ করিয়া, কালীর হস্ত হইতে কৃপাণ এবং গৃহস্থিত অন্যান্য অস্ত্রগুলি

লইয়া, সুড়ঙ্গ হইতে বহির্গত হইল। পাছে হিরণ্ময়ী আত্মঘাতিনী হন, এই জন্য তাহারা তথায় কোন অস্ত্র রাখিল না। বিশেষতঃ যে গৃহে হিরণ্ময়ীকে রাখা হইয়াছিল, সে গৃহের মধ্যে কিছু খাদ্য দ্রব্য ব্যতীত, অপর কোন দ্রব্যই রাখা হইল না। বাহির হইতে হিরণ্ময়ীর গৃহের কপাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কালীর গৃহের আলোক হিরণ্ময়ীর গৃহকপাট দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

এ দিকে ভৈরবানন্দ প্রভৃতি তিন ব্যক্তি সুড়ঙ্গের বাহিরে আসিয়া পূর্ব্ববৎ দ্বার রুদ্ধ করিয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় তাহারা আস্তে আস্তে পরস্পরে কত কি কথা কহিতে লাগিল। ভৈরবানন্দ কাপালিক মনে মনে একবার বলিলেন, "এই সুন্দরী কি অপ্সরা? এ কি আমার হইবে?"

একপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

মনের ভাব।

নিধে এবং কেনা কি বলা কওয়া করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেল। ভৈরবানন্দ আপনার মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আজ তাঁহার অন্তঃকরণে অন্য ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি আর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। এক একবার ভাবিতে লাগিলেন, "যাই—আর একবার সেই সুন্দরীকে দেখিয়া আসি। এখন আর নিধে কেনা নাই, আমি একাকী গিয়া সেই অপূর্ব্ব রূপসীর মনোহর রূপ দর্শন করি। আমি তাহাকে দেখিবার পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম যে, কামবৃত্তিকে বশীভূত করিয়া, তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া যোগসাধন করিব, কিন্তু এক্ষণে তাহার বিপরীত হইয়া উঠিল। কেন এমন হইল? কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। আমি আজিও বিবাহ করি নাই। মনে করিয়াছিলাম আজীবন কৌমারাবস্থায় থাকিয়া যোগসাধন করিব। কিন্তু আজ আমার সে কল্পনা কার্য্যকরী হইল না দেখিতেছি। সেই সুন্দরীকে দেখিয়া অবধি আমার অন্তঃকরণ

তাহার প্রেমলাভের জন্য সমুৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। আজ আমার একে আর হইল। হাজার কেন চেষ্টা কর না, কিন্তু এক এক সময়ে মন কোন কথাই মানে না, সে আপনার ইচ্ছায় কার্য্য করিয়া থাকে। আজ আমার মনও তাহাই। আমার যে এরূপ ভাবান্তর হইবে, তাহা কখন স্বপ্নেও দেখি নাই। যাই হউক, আমার যা হয় হইবে, কিন্তু আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। আমি নিধের মুখে শুনিয়াছি, সেই যুবতী ব্রাহ্মণ-কন্যা, তা ভালই হইয়াছে, আমার তাহাকে বিবাহ করিবার কোন অসুবিধা নাই। আমি তাহাকে বিবাহ করিব। পূর্ব্বে আমাব বিশ্বাস ছিল যে, আমি যে পথের পথিক, তাহাতে বিবাহ করিলে যোগসাধনের ব্যাঘাত ঘটিবে। কিন্তু এখন আমার সে বিশ্বাস আর দাঁড়াইবার স্থান পাইল না। এখন বুঝিয়াছি, বিবাহ না করিয়া, যোগসাধন হয় না। সুতরাং আমাব বিবাহ করা কর্ত্তব্য। সেই যুবতীকে বিবাহ করিয়া, আমার আশাকে চরিতার্থ করিব। কপালে যা থাকে, তাহাই হইবে।''

ভৈরবানন্দ এইরূপ কত কি ভাবিতে লাগিলেন, কিন্তু মঠ ছাড়িয়া পুনর্ব্বার একাকী কালীবাড়ী গেলেন না। নানাচিন্তায় রাত্রি প্রভাত হইল। তিনি একটিবারও নিদ্রার দেখা পাইলেন না।

অনন্তর তিনি যথাবিধি স্নানাদি করিয়া পূর্ব্ববৎ শ্মশানে যাইবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। কিন্তু মনে আর সে ভাব নাই—এখন নূতন ভাব—যুবতী লাভের ভাব। তিনি অন্তরে বাহিরে কেবল সেই সুড়ঙ্গস্থিতা যুবতীকে দেখিতে লাগিলেন। মন আর কিছুতেই অন্য দিকে ফিরিল না। সুতরাং যোগদ্রব্যসংগ্রহের কতকটা উলটাপালটা হইয়া গেল।

ভৈরবানন্দ শ্মশানে যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে কেনা ও নিধে তাঁহার নিকট আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

ভৈরবানন্দ আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কেনা বলিল, "ঠাকুর মশাই! সর্দ্দার কি ফিরে এসেছে?" এই কথা বলিয়া চারি দিকে চাহিতে লাগিল।

ভৈ।—"না এখনো ফিরিয়া আসে নাই, কিন্তু প্রায় তাহার আসিবার সময় হইয়াছে। তোরা এখন্ এখান হইতে চলিয়া যা।"

কেনা।—"যে আজ্ঞে, কিন্তু দোহাই আপনার, আমরা যে, এ কাজটার যোগাড় ক'রে দিয়েছি, এ কথা যেন সদ্দার জান্‌তে না পারে। আর বেশি বল্‌ব কি ?"

ভৈ।—"কোন চিন্তা বা ভয় নাই।" হাসিয়া এই কথা বলিলেন।

কেনা ও নিধে তখন তাহাদের ঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম করিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিল।

আরও কিয়ৎকাল গত হইল।

তাহার পর বীরচাঁদ মাহেশ্বরী দেবীর স্নানজল ও সিন্দূর আনিয়া ভৈরবানন্দের নিকট উপস্থিত হইল। ভৈরবানন্দ স্নানজল পান ও সিন্দূর কপালে ধারণ করিলেন। পরে বীরচাঁদকে বিদায় দিয়া শ্মশানে গমন করিলেন।

বীরচাঁদ তাড়াতাড়ি আপনার গৃহের দিকে চলিয়া গেল। তাহার চিত্ত হিরণ্ময়ীর জন্য অত্যন্ত অস্থির। কেবল কখন্ দেখি, কখন্ দেখি, এইরূপ মনোভাব। সে কাপালিকের মঠ হইতে বরাবর আসিয়া আপনার গৃহের দ্বারদেশে আসিয়াই "কেমন আছ মা" বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। দেখিল ঘরখানি শূন্য পড়িয়া আছে।

শূন্যগৃহ দেখিবামাত্রই, বীরচাঁদের মন চমকিয়া উঠিল। হঠাৎ কি এক চিন্তা আসিয়া সেই চমকিত চিত্তকে আরও অধীর করিয়া তুলিল। বীরচাঁদ ঘরের চারি দিক বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়াও হিরণ্ময়ীকে পাইল না। তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া চারি দিক খুঁজিতে লাগিল, তথাপি হিরণ্ময়ীকে পাওয়া গেল না। এইবার বীরচাঁদের বীরহৃদয়ে গভীর চিন্তাসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে আর এক নিমিষের জন্যও স্থির হইতে পারিল না। হিরণ্ময়ীকে অল্প সময়ের মধ্যে দেখিয়া দস্যু বীরচাঁদের হৃদয় যে, আজ জগদীশপ্রসাদের হৃদয়ের ন্যায় হইবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। বীরচাঁদ হিরণ্ময়ীকে না পাইয়া যেন প্রাণের কি এক অমূল্য রত্ন হারাইয়া ফেলিল। তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও বিশুষ্ক হইয়া গেল। কাহাকে যে কি বলিবে, তাহাও ঠিক করিতে পারিল না। অবশেষে তাড়াতাড়ি তাহার অনুচর দস্যুদের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে, তোরা সেই মেয়েটিকে

এদিকে কোথাও আস্‌তে দেখেছিস্? সে যে ঘরে নেই—কোথা গেল—দেখেছিস্?"

এই দস্যুদের মধ্যে কেনা ও নিধে ছিল না। তখন বীরচাঁদের মনে তাহাদের অস্তিত্বেরও উদয় হইল না, সুতরাং তাহাদের খোঁজও পড়িল না।

জিজ্ঞাসিত দস্যুগণ বীরচাঁদের এই দুঃখমিশ্রিত বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল। সে যে হিরণ্ময়ীর জন্য এতদূর বিচলিত হইবে, তাহা তাহারা একবারও ভাবে নাই। কেন না তাঁহাদের চিত্ত স্বতন্ত্র।

তাহারা বীরচাঁদকে বলিল, "কই, সর্দ্দার! আমরা ত তাকে দেখিনি। সে ত তোমার ঘরেই ছিল। আমরা তোমার কাছ থেকে এসে অবধি আর ওদিকে যাই নি।"

বীরচাঁদ আরও দুঃখিত হইল। বলিল, "তাই ত, কিছু যে বুঝতে পাচ্চি নি।"

একজন দস্যু বলিল, "আচ্ছা, সর্দ্দার! তুমি কি কাল রাত্তিরে ঘরে ছিলে না?"

বীর।—"আরে আহাম্মক! তা থাক্‌লে কি আর এমন হয়। কাল যে আমি দিনের বেলা থেকে বাড়ী ছাড়া।"

উক্ত দস্যু।—"কোথা গিয়েছিলে?"

বীর।—"ঠাকুর মশায়ের তরে মাহেশ্বরী পুরের মাহেশ্বরী দেবীর চানজল আর সিঁদূর আন্‌তে গিয়েছিনু। এই কতক্ষণ ঘরে এসেছি।" এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। আবার বলিল, "তোরা আমার সঙ্গে আয়, ভাল ক'রে খোঁজ করি।"

অনন্তর সকলে মিলিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ অতীত হইয়া গেল, কিন্তু সুফল ফলিল না। সুতরাং কেবল বীরচাঁদেরই নিরাশা দ্বিগুণিত হইল। সে কিয়ৎকাল কি ভাবিয়া, দস্যুগণকে বিদায় দিয়া, পুনর্ব্বার আপনার গৃহে ফিরিয়া আসিল।

এবার বীরচাঁদের নিরাশ বদনমণ্ডলে গাঢ়তর বিষাদ প্রস্ফুট হইল। অবশেষে সেই বিষাদের ফল অশ্রুতে পরিণত হইয়া আসিল। বোধ হয়, বীরচাঁদ পূর্ব্বে আর কখন কাঁদে নাই। আজ হিরণ্ময়ীর শোক তাহাকে

কাঁদাইল। পরের জন্য দস্যুনয়নের অশ্রু যে, কি অপূর্ব্ব পদার্থ, তাহা আজ বীরচাঁদের চক্ষে দেখা গেল। যাহাকে যে ভাল বাসে—স্নেহ করে, তাহাকে সে যদি না পায়, তাহা হইলে সে যে, একপ্রকার জীবন্মৃত হইয়া পড়ে, তাহার দৃষ্টান্ত বীরচাঁদ। যে নিষ্ঠুর হইয়া কত লোককে নিহত, ও আহত করিয়াছে, সে আজ একটি পরবালিকার জন্য কাঁদিয়া ফেলিল, ইহা কি সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয়? দস্যুহৃদয়ে যে এত দয়া—এত স্নেহ—এত সহানুভূতি, ইহা তোমার আমার স্বপ্নেরও অগোচর। বীরচাঁদের ন্যায় দস্যুকে কাহার না পূজা করিতে ইচ্ছা হয়?

বীরচাঁদ আরও কএকবার এদিক ওদিক করিয়া অনুসন্ধান করিল, কিন্তু হিরণ্ময়ীকে পাইল না। তখন কি ভাবিয়া গৃহ হইতে চলিয়া গেল। সারাদিন আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না।

দ্বিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

যেমন কর্ম্ম—তেম্নি ফল।

সমস্ত দিন দিবাকর আকাশে আকাশে ঘুরিয়া অস্ত হইলেন। পক্ষিগণ কিচিমিচি করিয়া 'দিবা অবসান হ'ল' বলিয়া স্ব স্ব নীড়ে উড়িয়া বসিল। অজয়নদের তট ও তটস্থ অরণ্যাদি ক্রমে ক্রমে ঈষৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। সন্ধ্যা জলো কালি ঢালিয়া দিবার পর রজনী ঘন কালি ঢালিতে আরম্ভ করিল। সে কালিতে ভূতলস্থ সমুদয় পদার্থ ডুবিয়া গেল। কেবল উপরে কতকগুলি ফেণবিন্দুস্বরূপ নক্ষত্র ভাসিয়া রহিল। নিম্নে স্তরে স্তরে অন্ধকার। দেখিতে দেখিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া আসিল।

এমন সময়ে অজয়নদের তটের অবিদূরে একটি গৃহে আলোক দেখা গেল। সেই আলোক উক্ত গৃহের একটি দেওয়ালের ছিদ্র দিয়া বাহিরে আসিতেছিল। গৃহের মধ্যে দুই জন লোক কত কি কথা কহিতেছে। মধ্যে মধ্যে অসংলগ্ন ভাবে ও বিকৃতস্বরে গান গাহিতেছে। তাহাদের বসিবার আসন একখানা ছেঁড়া মাদুর। সম্মুখে সুরাপাত্র ও শল্যদগ্ধ মাংস। উহাদের

মধ্যে একজন সুরা ঢালিয়া অপরকে দিতেছে আর আপনিও পান করিতেছে আবার মধ্যে মধ্যে কথা কহিতেছে, গান গাহিতেছে। কিন্তু তাহাদের গৃহের কপাট ভিতর হইতে আবদ্ধ রহিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের সেই সামান্য গৃহ ও ছেঁড়া মাদুর যেন স্বর্গ ও স্বর্গের সিংহাসন। এবং তাহারা যেন স্বর্গের দেবতা হইয়া সুরানন্দ ভোগ করিতেছে। ক্রমে আনন্দের বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস নাই।

তাহারা গৃহের ভিতরে এইরূপ করিতেছে, এদিকে বাহিরে কে একজন লোক কান পাতিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, সে যেন উৎসুকচিত্তে তাহাদের কথাগুলি শুনিতেছে। এক একবার দেওয়ালের ছিদ্র দিয়া ভিতরের ব্যাপার দেখিতেছে।

এমন সময়ে সহসা গৃহের ভিতর হইতে শুনা গেল, "কেমন, কেনারাম! সদ্দার শালা খুব জব্দ হ'য়েছে।"

কেনা।—"নিধিরাম! জব্দ ব'লে জব্দ, শালা আজ সারাদিন চরকীর মত ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু আমরা যে তা'র সব্বনাশ করেছি, তা শালা জান্‌তে পারেনি।" সে এই বলিয়া হিহি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নিধি।—"ঠাকুর মশাই ভাগ্যে ছিল, তা নইলে শালাকে কি জব্দ কত্তে পাত্তুম্?"

কেনা।—"ভগবান্ আমাদের মা বাপ্।"

নিধি।—"দেখ্ দেখি, ভাই! আমরা ছুঁড়ীটেকে হাত কর্‌ব মনে কল্লুম্, না শালা কোত্থেকে এসে বাগ্‌ড়া দিলে। শালা আবার তাকে ধম্মমেয়ে ব'লে ডাকে। ওর বাবার মেয়ে।"

কেনা।—"ওর বাবার বাবার তস্যি বাবার মেয়ে।" এই কথা বলিয়া উভয়ে হাসিয়া উঠিল।

নিধি।—"দেখি এখন শালার ধম্মমেয়েই বা কি করে আর শালাই বা কি ক'রে। এখন সে ছুঁড়ীটে ঠাকুর মশাইর হাতে পড়েছে।"

কেনা।—"ঠাকুর মশাইর কপাল জোর।"

নিধি।—"তা ত আমাদের হতেই।"

কেনা।—"তা তার দুবার করে বলতে?"

নিধি।—"দেখ্, কেনা! এইবার ভাই, আমরা ঠাকুর মশাইর খুব পিরিও-পাত্তর হ'ব।"

কেনা।—"ঠাকুর মশাইর খুব চালাক বুদ্ধি। কেমন ফাঁকি দে সদ্দারকে মাহেশ্বরীপুর পাঠিয়েছিল।"

এই কথা বলিয়া আবার উভয়ে হিহি করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর তাহারা এ সম্বন্ধে আর কোন কথা কহিল না। অন্য কথা পাড়িল।

তাহাদের গৃহের বহির্ভাগে যে ব্যক্তি উৎকর্ণ হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছিল, সে এই কথোপকথনের আদ্যোপান্ত শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু কোনরূপ সাড়াশব্দ প্রকাশ করিল না। সে আর সেখানে দাঁড়াইয়া কালবিলম্ব করিল না। বিদ্যুতের ন্যায় কোথায় চলিয়া গেল।

আবার অল্পকাল পরেই সে ব্যক্তি উল্লিখিত স্থানে ফিরিয়া আসিল। এখন তাহার মূর্ত্তি নূতন অথচ ভয়ানক। তাহাকে দেখিলে যেন সাক্ষাৎ যমদূত বলিয়া বিশ্বাস হয়। এক্ষণে তাহার মুখমণ্ডলের সমস্ত ভাগ কালি-মাখা; দক্ষিণ হস্তে একখানি শাণিত ছোরা; চক্ষুযুগল আরক্ত ও ক্রোধ-বিস্ফারিত। কঠিন দন্ত অনবরত অধর দংশন করিতেছে। প্রবল নিশ্বাসের বেগে বিশাল বক্ষ এক একবার স্ফীত হইতেছে। শিরস্থিত বিঘত-পরিমিত কেশরাশির কতকগুলি পশ্চাতে, কতকগুলি দুই পার্শ্বে আর কতকগুলি কপাল বাহিয়া মুখের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সহসা এ ব্যক্তির এই ভয়ঙ্কর সংহার-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবার উদ্দেশ্য কি?

এবারেও এ ব্যক্তি পূর্ব্বস্থানে একবার দাঁড়াইয়া কি শুনিল—ছিদ্র দিয়া ভিতরে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে ঐ গৃহের আবদ্ধ দ্বারের বাহিরে গিয়া অপর একজন লোকের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া গৃহমধ্যস্থ দুই জন লোকের নাম ধরিয়া ডাকিল। তাহার ডাক শুনিয়া ভিতর হইতে এক জন বলিল, "কেরে, চন্দুরে না কি?"

বাহিরের ব্যক্তি উত্তর দিল, "হুঁ।"

ভিতর হইতে এক ব্যক্তি বলিল, "এতক্ষণ কোথা ছিলি, শালা! আয় আয়, যথা লাভ,—শেষটাই তোর কপালে আছে।" এই বলিয়া টলিতে টলিতে উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

দ্বার খুলিবামাত্রই তাহাদের আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল। উভয়েই অত্যন্ত ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিল—দুই একবার অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। কি বলিবে বলিবে মনে করিল, কিন্তু জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া গেল। উভয়ে এতক্ষণ ধরিয়া যে আনন্দ উপভোগ করিতেছিল, তাহা কোথায় মিলাইয়া গেল। দুই জনেই পলায়ন করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দ্বারদেশে যমদূত।

বাহিরের ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই সেই দুই জনকে বলে আক্রমণ করিল। পুনঃ পুনঃ সুতীক্ষ্ণ ছোরার আঘাতে উভয়েরই বক্ষ কর্ণ উদর বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। শোণিতের স্রোত ফুটিয়া ছুটিল। তখন উভয়ে ভূতলে পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতে লাগিল।

হত্যাকারী সেই সময় কেবল একবার বলিল, "অবিশ্বাসী পিশাচ! তোদের যেমন কর্ম্ম—তেম্নি ফল। আজ তোরা যাকে জব্দ কত্তে চেষ্টা করেছিস, যে বিশ্বাসীকে একটি মেয়ের মনে অবিশ্বাসী ক'রে তুলেছিস্, এ সেই বীরচাঁদ—তোদের যম।" এই বলিয়া আবার সেই দুই জন আহত পাপাত্মাকে ছোরার আঘাত করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই দস্যু নিধিরাম ও কেনারামের পঞ্চত্বলাভ হইল।

উহাদিগকে হত্যা করিয়া, বীরচাঁদ রক্তলিপ্ত দেহে ছোরা লইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় গৃহের আলোক নিবাইয়া দিল। সে যে তখন কোথায় গেল, তাহার অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। নিধে ও কেনার নিহত দেহ অন্ধকার গৃহে পড়িয়া রহিল।

ত্রিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর আগত হইয়াছে। এক্ষণে অজয়নদের তীরে মনুষ্যকণ্ঠের কোন সাড়াশব্দ নাই। শৃগালদল শবমাংস খাইয়া, মন খুলিয়া কবিওয়ালাদের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিতেছে, কতকটা কৃতকার্য্যও হইতেছে। দূরে কুক্কুরগণ, তাহাদের কবি-গাওনা, কোন কাজেরই নয়, বলিয়া

পাচাঁলী বা হাফ্-আখড়াই গাওনার আখ্ড়া দিতেছে। বৃক্ষশাখায় পূর্ণেন্দু-বিনিন্দিতচক্রবদন পেচক শ্রোতা হইয়া, শৃগাল ও কুক্কুর উভয় দলকেই বাহবা দিতেছে। আবার এখানে সেখানে ঝিঁঝিঁপোকা খাদে রাগ রাগিণী ভাঁজিতেছে। সঙ্গীতচর্চ্চার মহাধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে অজয়নদের তটে একটি অশ্বত্থবৃক্ষতলে একটি যুবা উপবিষ্ট হইয়া কি ভাবিতেছেন। তাহার আকার প্রকার দেখিলে, যেন তাহাকে কি একটি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন বলিয়া বোধ হয়। যুবা অজয়ের জলের উপর স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া, নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন। অজয়ের জল কোথা হইতে আসিয়া, কোথা চলিয়া যাইতেছে ;—গতির বিরাম নাই, শ্রান্তি নাই। সেইরূপ যুবার চিন্তারও বিরাম নাই, শ্রান্তি নাই। সেই চিন্তা কোথা হইতে আসিয়া,কাহাকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়া যাইতেছে—আবার ঘুরিয়া আসিতেছে—আবার চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু অজয়ের জলের সহিত উক্ত যুবকের চিন্তার এ বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও আর একটি বিষয়ে নাই। সে সাদৃশ্য অজয়ের জল কেন, কাহারই সহিত হইবার নহে। সেটি কি ?—না, লক্ষ্য-পদার্থ ব্যতীত জগৎসংসারকে বিস্মৃত হইয়া যাওয়া। অজয়ের জল তাহা পারে নাই। কেননা উহা এক দিয়া আসিবার সময় অবধি অপর দিকে যাইবার সময় পর্য্যন্ত বালুকাকণা, খড়কুটা, ফুল প্রভৃতি নানাবিধ সামগ্রী ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু যুবকের চিন্তায় তাহা নাই; উহা কেবল প্রবল বেগে লক্ষ্যের দিকেই ছুটিতেছে—অন্য কোন পদার্থই স্পর্শ করিতেছে না। উভয়ের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ।

যুবকের নয়নসম্মুখে অজয়ের জল নাচিতেছে, যুবা উহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। যুবার কর্ণে অজয়-জলের অস্ফুট কুলু কুলু ধ্বনি আসিতেছে, যুবা উহা শুনিয়াও শুনিতেছেন না। কোন একটি গভীর চিন্তায় তন্ময় হইয়া গেলে, বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ থাকে না। এরূপ চিন্তানিমগ্ন ব্যক্তির নিকট বাহ্যজগতের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই যুবকেরও তাহাই হইয়াছে। একমাত্র নিগূঢ় চিন্তার ঐন্দ্রজালিক কৌশলে বা মায়ায় ইহাঁর নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও কিয়ৎক্ষণের জন্য লোপ পাইয়াছে। এরূপ নীরব নিশীথে এ যুবার এরূপ নির্জ্জনস্থলে একাকী বসিয়া থাকিবার কারণ কি ?

এ যুবা কে?—তাহা জানিতে পারিলে, এরূপ প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন কি ছিল? পরে দেখা যাইবে, এ লোকটি কে। এখন একবার অজয়ের তট ছাড়িয়া অন্যদিকে যাওয়া যাউক্। পাঠক! থামুন্ থামুন; ঐ শুনুন, যুবক যেন কি বলিতেছেন না? বলিতেছেন,—

"এ নয়নে কেন তা'রে করিনু দর্শন?
দেখিলাম যদি, কেন না পারি ভুলিতে?
যদিই ভুলিতে পারি, তা' হ'লে তখন
কিরূপে বা পারিব এ জীবন ধরিতে?
সমস্ত ভুলিতে পারি আঁখি পালটিতে,
তা'রে কি ভুলিতে পারি এ প্রাণ থাকিতে?

"অজয়ের জল যদি নিমেষের তরে
না পারে ভুলিতে সেই ভাগীরথী-জল;
মানব হইয়া আমি, বল ত কি ক'রে,
ভুলিবারে পারি সেই রূপ নিরমল?
ভুলিব আপন প্রাণ; প্রাণের প্রাণেরে
ভুলিতে নারিব কিন্তু, ক্ষণেকের তরে।"

যুবা এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরব হইল। আবার যেন কতকটা উন্মত্তের ন্যায় হইয়া বলিতে লাগিলেন;—

"এত যে করিনু যোগ, শ্মশানে বসিয়া,
এত যে সহিনু কষ্ট জাগিয়া যামিনী,
পরলোকে ফল তা'র? বল কি করিয়া
এরূপ কল্পিত বাণী স্বপ্নপ্রসবিনী?
ইহলোকে খাটি', পা'ব পরলোকে ফল?
মূর্খের মুখেই সাজে এ কথা কেবল।

"শ্মশানে বসিয়া যোগ, জাগিয়া যামিনী;
ইহলোকে ফল তা'র ফলিল আমার।

তা' না হ'লে কোথা হ'তে স্থির সৌদামিনী
আসিয়া খুলিল মোর আনন্দ-দুয়ার ?
ইহলোকে কর কাজ, ইহলোকে ফল
নিশ্চয় পাইবে, যদি থাকে পুণ্যবল।

"আমার পুণ্যের বল না থাকিত যদি,
তা' হ'লে কি স্বপনের অগোচর মণি
অজয়নদের তীরে মম সুখনদী
বহাইতে আসিত রে ? কখন ভাবিনি।
শ্মশানে বসিয়া যোগ, জাগিয়া যামিনী,
সঙ্গিনী পেয়েছি, তাই স্থির সৌদামিনী।
বিবাহ করিব তা'রে জুড়াব জীবন্ ;
ইহলোকে সেই মোর যোগের কারণ।"

যুবা এই বলিয়া আবার নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে সহসা এক ব্যক্তি সেই অশ্বথবৃক্ষের উপর হইতে আস্তে আস্তে কএক পদ নীচে নামিয়া, বৃক্ষমূলোপবিষ্ট যুবার পশ্চাদ্দিকে লাফাইয়া পড়িল।

সেই ব্যক্তি হঠাৎ লাফাইয়া পড়িবামাত্র ধুপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল। বৃক্ষতলোপবিষ্ট অনন্যমনা যুবার চমক হইল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিয়া লজ্জিত ও বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

যে লোকটি লাফাইয়া পড়িয়াছিল, সে তৎক্ষণাৎ কিছু না বলিয়া, সহসা ঐ যুবার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া যুবা যেন কি ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, "এ কি কর ? কাঁদ কেন ? তুমি এই গাছটার উপর কেন বসিয়াছিলে ?"

সে তাঁহার এই সকল কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "প্রভু ! আপনার কি এ রকম কাজ করাটা ভাল হ'য়েছে ? আমার ধর্ম্ম মেয়েকে ফিরে দাও। আপুনি গুরু, আমি শিষ্য, আর বেশি বল্‌ব কি ?"

পাঠক মহাশয়! এক্ষণে আপনি এই দুইটি লোককে চিনিতে পারিলেন কি? বলুন দেখি, ইহারা কে?—যে পা জড়াইয়া ধরিয়াছে, সে বীরচাঁদ আর যাঁহার পা জড়াইয়া ধরা হইয়াছে, তিনি ভৈরবানন্দ কাপালিক। ঠিক হইয়াছে।

ভৈরবানন্দ প্রথমতঃ বীরচাঁদের এইরূপ ভাব দেখিয়া দুঃখিত হইলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ কে যেন তাঁহার চিত্তকে অন্য দিকে ফিরাইয়া দিল। তিনি মনের কথা চাপা দিয়া অন্য কথা কহিতে লাগিলেন। বলিলেন, "বীরচাঁদ! আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না। কে তোমার ধর্ম্মমেয়ে, আমি তাহাকে চিনি না। তুমি কি পাগল হইয়াছ?"

বীর।—"এখনও হইনি, আপুনি তাকে না ফিরিয়ে দিলে, তার জন্যে ভেবে ভেবে আমাকে পাগল হ'তে হ'বে। আপনার পায়ে পড়ি, আর আমায় দুঃখু দিও না। তাকে ফিরে দাও—ফিরে দাও

ভৈ।—"আমি তাকে চিনি না, সে আমার কাছে নাই।

বীর।—"এই যে আপুনি তার কথা বল্‌ছিলে। সে আপনকার কাছেই আছে।"

ভৈ।—"আমি অন্য কথা কহিতেছিলাম, তুই কি শুন্‌তে কি শুনেছিস্।"

এইবার বীরচাঁদ ভৈরবানন্দের পা ছাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে, না; আমি ঠিক্ শুনেছি, আরও বলি শুনুন্,—কেনা আর নিধে আমার শত্রু হ'য়ে আপনকার হাতে সেই মেয়েটিকে দিয়েছে। সেই শালাদের ফিকির শুনে আপুনি মিছিমিছি আমাকে মাহেশ্বরীপুর পাঠিয়েছিলে। ঠাকুর! আপনকার মনে কেন এমন পাপকর্ম্মের ইচ্ছে হ'ল? সে শালারা যেমন কর্ম্ম করেছিল, তার তেম্নি প্রতিফলও পেয়েছে। আমি এই ছোরাতে তাদের খুন করেছি।"

এই কথা শুনিয়া ভৈরবানন্দের মনে এককালে অনন্ত চিন্তার তরঙ্গ উঠিল। তিনি একবার যেন দশ দিক বিভীষিকাময় দেখিলেন। মনে মনে নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন, কিন্তু প্রাণপণে চাপিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া দেখিলেন। কিন্তু আর কৌশল করিয়া উত্তর দিবার পন্থা পাইলেন না। সুতরাং তাঁহাকে বলিতে হইল, "বীরচাঁদ! আমি তোমার গুরু, তুমি আমার শিষ্য ত?"

বীর।—"আজ্ঞে।"

ভৈ।—"আমি যদি সেই যুবতীকে বিবাহ করি,তাতে তোমার বাধা কি?"

বীর।—"সে মেয়েটি এখন আমাকেই এই কাজের মূল ভেবে অবিশ্বেসী জেনেছে। আপুনি ফিকির ক'রে আমাকে ফাঁকি দিয়ে এই অন্যায় কাজ করেছ। তার বাপ মার বা অন্য কোন আপনার নোকের মত না নিয়েই বা আপুনি তাকে বে ক'ত্তে চান কেমন ক'রে? আবার তার বে হ'য়েছে কি না, তাই বা জান্‌লে কি ক'রে? আমি এখন আপনকার মৎলবকে ভাল বল্‌তে পারি না। আপুনি এখন তাকে আমার হাতে ফিরে দেও। আমি বিনিদোষে তার কাছে অবিশ্বেসী হয়েছি, এই আমার বড় দুঃখু—বড় নজ্জা। আমি তাকে তার বাপ্ মার কাছে রেখে আসি, তার পর আপনকার যা ইচ্ছে হয় ক'র।"

ভৈরবানন্দ এই সকল কথার উত্তর না দিয়া, অন্য কথা পাড়িলেন। বলিলেন, "বীরচাঁদ! তুমি এই গাছের উপর কেন বসিয়াছিলে? তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তর দিলে না কেন?"

বীর।—"আমি কেনা আর নিধেকে খুন ক'রে, নদীতে গা হাত পা ধুতে এসেছিলুম। রক্ত কালি ধোবার পর ডাঙায় উঠে এসে এই গাছতলায় গা মুচ্ছিলুম। এমন সময় ঐ দিক্ থেকে এই দিক্‌পিনে কে আস্‌ছিল। আমি নোকটা কে, জান্‌বার তরে এই গাছটার উপর উঠে পড়্‌লুম্। শেষে দেখ্‌লুম, আপুনিই এখানে এসে বস্‌লে। আমিও আপনকার এখানে আস্‌বার কারণ জান্‌বার তরে উপরে চুপ্ ক'রে ব'সে রইলুম।"

ভৈরবানন্দ, এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত ও লজ্জিত হইয়া মনে মনে বলিলেন, "আমি এখানে আসিয়া ভাল করি নাই। বীরচাঁদ ইহারই মধ্যে জান্‌তে পারিয়া গোলযোগ ঘটাইয়া দিল। তা কি করিব, যখন যাহা ঘটিবে, তাহার অন্যথা করে, এমন কে আছে?"

বীরচাঁদ ভৈরবানন্দকে নীরব থাকিতে দেখিয়া আবার বলিল, "প্রভু! আর আমায় কষ্ট দিও না। আমার ধর্ম্মমেয়েকে ফিরে দাও। তাকে কোথা রেখেছ?"

ভৈ।—"তোমাকে আমার একটি কথা রাখিতে হইবে।"

বীর।—"কি কথা ?"

ভৈ।—"আমি সেই যুবতীর প্রতি কোনরূপ অত্যাচার বা স্বেচ্ছায় অবৈধাচার করিব না। আমি তার সম্মতি লইয়া তাহাকে বিবাহ করিব। সুতরাং কোন চিন্তা নাই, তুমি আর দুঃখ করিও না।"

বীর।—"আপনকার বিবাহ করা ত বিধি নয়; কারণ, আপুনি সন্ন্যেসী যোগী।"

ভৈ।—"এখন আমার মনের ভাবান্তর ঘটিয়াছে। আর এক কথা, বিবাহ করিলে কি যোগসাধন হয় না ?"

বীর।—"আপুনি যে মতের মতে চল্‌ছেন, সে মতে বে করা ত উচিত নয়। এতে যে আপনকার যোগ টোগ সব নষ্ট হ'য়ে যা'বে।"

ভৈ।—"যায় যাক্, কিন্তু, বীরচাঁদ! তুমি আর তাহাকে চাহিও না। যদি গুরুকে শিষ্যের সন্তুষ্ট করা কর্ত্তব্য আর অসন্তুষ্ট করা অকর্ত্তব্য ব'লে স্বীকার কর, তবে আমার কথা লঙ্ঘন করিও না। আমি তাকে যে স্থানে রাখিয়াছি, সে স্থানের নাম তোমার জানিবার প্রয়োজন নাই।"

এই কথা শুনিয়া বীরচাঁদ মনে মনে কত কি চিন্তা করিতে লাগিল। ভৈরবানন্দ এই অন্যায় কার্য্য করিলেও তিনি তাহার গুরু, সুতরাং সে যে কি করিবে, তাহাব কূলকিনারা খুঁজিয়া পাইল না। ভৈরবানন্দ কেনা বা নিধে হইলে এতক্ষণ কোন্ কালে তাহাদেব পথের পথিক হইতেন। কেবল এক গুরু বলিয়াই এখনও বীরচাঁদের হস্তে নিস্তার পাইতেছেন, কিন্তু পরে যে কি হইবে, তাহা ভবিষ্যতই জানে।

বীরচাঁদ অনেকক্ষণ ভাবিয়া বুঝিল যে, তাহার আশা নিষ্ফল হইল। তখন সে বলিল, "ঠাকুর মশাই! তুমি নিতান্তই সে মেয়েটিকে ফিরে দিলে না—কোথায় তাকে রেখেছ, তাও বল্‌লে না—এই বিশ্বেসী বীরচাঁদকে তার কাছে যার পর নাই অবিশ্বেসী ক'রে দাঁড়' করা'লে। আমি এখন্ বিশেষরূপে বুঝ্‌লুম্ যে, মানুষ চেনা মানুষের কাজ নয়। তা হ'লে আজ আর আমাকে এমন বিপদে পড়্‌তে হ'ত না। এখন্ আর কি কর্‌ব বল ? আমি আপনকার চরণে বিদেয় নিয়ে চিরকালের জন্যে চ'ল্লেম। আর আমি এখানে থাক্‌ব না। আমার মন বড় খারাপ হ'য়েছে। এখানে থাক্‌লে,

কি জানি কি হ'তে কি হ'বে। আপুনি গুরু ব'লে আপনকাকে আর কিছুই বল্‌তে পারিনি। তা যা হৌক্, সেই মেয়েটির বাপ মার অনুসন্ধান নে, তাদের কাছে পাঠিয়ে দিও। তারা যদি মত দেয় তবে বে ক'র, আর এক নিমিষের তরেও যেন তার উপর অত্যাচার ক'র না। আমি এখন্ চল্‌লুম্—কিন্তু কোথা যে চল্‌লুম—তা বল্‌তে পারি নে। আপনকার কাছে আজ আমার এই শেষ বিদেয়।"

এই বলিয়া বীরচাঁদ দুঃখিতচিত্তে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিল। তখন ভৈরবানন্দ বলিলেন, "বীরচাঁদ! তুমি যেও না—আমার কথা শুন।"

বীর।—"আজ্ঞে, আর না—আর না। আমি আর থাক্‌ব না। কিন্তু যাবার সময় আর একটা কথা বলি, "আপুনি জোরে সেই মেয়েটির উপর কোন মন্দ ব্যভার ক'ল্লে, আপনকার অন্যায় কাজ করা হ'বে। তখন আর গুরু শিষ্যে সম্বন্ধ থাক্‌বে না। আপুনি তার উপর কোন অত্যাচার ক'ল্লে আমি অব্বিশ্যি জান্‌তে পারব। আপুনি চাদ্দিক ভেবে চিন্তে কাজ কর্‌বে। আমি চল্লুম।" এই বলিয়া অবিলম্বে তথা হইতে চলিয়া গেল।

ভৈরবানন্দ আবার তাহাকে ..কিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। তখন তিনিও কি ভাবিতে ভাবিতে মঠে প্রস্থান করিলেন।

চতুঃপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

কৌশল।

দস্যুবীর বীরচাঁদ ভৈরবানন্দকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পর এক দিন অতীত হইয়া গেল। কেনা ও নিধেকে বীরচাঁদ যে খুন করিয়াছে, এ কথা ভৈরবানন্দ কাপালিক কাহাকেও বলিলেন না বটে, কিন্তু দস্যুগণ আভাসে তাহা বুঝিয়া লইয়াছিল। তন্মধ্যে নিধিরাম ও কেনারামের কএক জন আত্মীয়, বীরচাঁদকে হত্যা করিবার জন্য সচেষ্ট রহিল, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা যে কত দূর কার্য্যকারী হইবে, তাহা নিতান্ত সন্দেহস্থল হইয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে অন্বেষণ করিয়া পাইলে ত? তাহাতে আবার সে, যে সে নয়—বীরচাঁদ।

হত্যাকাণ্ডের রাত্রিতে বীরচাঁদের সঙ্গে ভৈরবানন্দের যে রূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তিনি তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। এই কএক দিন ধরিয়া কেবল আপনা আপনিই সেই বিষয়ের প্রশ্নোত্তর করিতে লাগিলেন। এক্ষণে তাঁহার আর সেরূপ যোগসাধনের নিয়ম রক্ষিত হয় না। মনের মধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং তিনি যেন সর্ব্বদা কিসের জন্য প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। আবার কখন কখন কি ভাবিয়া ভাবিয়া দুঃখিত, ভীত ও চঞ্চল হইয়া পড়েন। অপরে যাহাতে তাঁহার এই ভাব বুঝিতে না পারে, তিনি সে বিষয়ে বিশেষরূপে সতর্ক থাকিতে লাগিলেন। এক সময়ে তিনি যেন কি একটি কার্য্য করিতে অগ্রসর হন, আবার পরক্ষণেই কাহাকে মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইয়া পশ্চাৎপদ হইয়া পড়েন। বোধ হয়, বীরচাঁদ যেন তাঁহার মনোনয়নে সশস্ত্র দেখা দিয়া যায়।

গত কল্য ভৈরবানন্দ দুই তিন বার সুড়ঙ্গস্থিতা হিরণ্ময়ীর নিকট যাইয়া, তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াছিলেন—খাওয়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—নির্ভয় দিয়াছিলেন—আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু হিরণ্ময়ী তাঁহাকে দেখিয়া আরও ভীত, চঞ্চল ও দুঃখিত হইয়াছিলেন। আহা, হিরণ্ময়ী যেন কারাগারে বদ্ধ হইয়া ভয়ানক যমদূতের হস্তে পতিত হইয়াছেন।

অদ্য প্রাতঃকালে ভৈরবানন্দ পুনর্ব্বার হিরণ্ময়ীর নিকট গমন করিলেন। হিরণ্ময়ী তাঁহাকে দেখিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় ভয়ে জড় সড় হইলেন।

ভৈরবানন্দ কিয়ৎক্ষণ তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখিয়া কেন এত ভীত হও? আমি তোমার উপকার ব্যতীত অপকার করিতে আসি না। তুমি আহার না করিয়া ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যাইতেছ। এরূপ করিয়া আর কয় দিন বাঁচিবে?"

হিরণ্ময়ী নতমুখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "এখন মরিলেই বাঁচি। আপনি আমাকে কালী দেবীর নিকট বলিদান করুন্। ইহাতে আপনার পুণ্য সঞ্চয় হইবে, কালী দেবীর তৃপ্তি লাভ হইবে আর আমারও সমস্ত জ্বালা

যন্ত্রণা ঘুচিয়া যাইবে।" এই বলিয়া তিনি অধোমুখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ভৈরবানন্দ তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "বাঁচিয়া থাকিলে কি তোমার জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইবে না?"

হিরণ।—"না।"

ভৈ।—"কেন?"

হিরণ।—"তা আর আপনাকে কি বলিব?"

ভৈ।—"আমি কি শত্রু?"

হিরণ।—"মিত্র হইলে, আমাকে এতক্ষণ কোন্ কালে এই কারাগৃহ হইতে নিষ্কৃতি দান করিয়া ছাড়িয়া দিতেন।"

ভৈরবানন্দ এ কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। কিয়ৎকাল নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর মনে মনে বলিলেন, "ইহাকে এখন্ আহার করাইতে না পারিলে জীবিত রাখা নিতান্ত দুর্ঘট। এ যে কথা বলিল, "আমি সেই কথাকে ভিত্তিমূল করিয়া ইহাকে আহার করাইব।" এই ভাবিয়া হিরণ্ময়ীকে বলিলেন, "আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না ত কি এই অন্ধকার গৃহে চিরকাল আবদ্ধ করিয়া রাখিব? তুমি যদি আমার কথা রাখিয়া, আহার কর, তবে শীঘ্রই তোমাকে ছাড়িয়া দিব।"

হিরণ।—"আহার না করিলে কি ছাড়িয়া দিতে নাই?"

ভৈ।—"আমার পক্ষে তাহা দিতে নাই। তুমি এখন্ অতিথি, সুতবাং কালীদেবীর প্রসাদ ভোজন না করিলে ছাড়িয়া দিতে পারি না।"

হিরণ।—"আমার ক্ষুধা নাই।"

ভৈ।—"এ কথায় কে বিশ্বাস করে? আজ বলিয়া নয়, কালও তুমি আহার কর নাই; ইহাতেও কি তোমার ক্ষুধার উদ্রেক হইল না? এও কি বিশ্বাসযোগ্য কথা?"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "আচ্ছা, আমি আপানার কথা অবহেলা করিব না, যা পারি খাইব, কিন্তু আপনি শপথ করিয়া বলুন, আমাকে ছাড়িয়া দিবেন।"

ভৈরবানন্দ মনে মনে ভাবিলেন, "এখন্ ত শপথ করিয়া ইহাকে আহার করাই, তাহার পর ছাড়িয়া দেওয়া আর না দেওয়া, আমার ইচ্ছা। এক

জন বিনা আহারে মারা যাইবে, এমন শপথ করিতে দোষ কি ?" এই ভাবিয়া বলিলেন, "আমি তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি আহার করিলে ছাড়িয়া দিব।"

সরলা হিরণ্ময়ী এ কথায় বিশ্বাস করিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, আমি ইহার পর আহার করিব।"

ভৈরবানন্দ সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "তবে এখন্ কিছু খাও।"

হিরণ্ময়ী অধোমুখে থাকিয়া বলিলেন, "আমি কোন পুরুষের নিকট কিছু খাই না।"

ভৈ।—"তবে আমি এখন আসি, তুমি একাকিনী বসিয়া খাও। আমি ও বেলা আসিয়া এই সকল দ্রব্য যেন এইরূপেই পড়িয়া থাকিতে না দেখি।"

এই বলিয়া তিনি হিরণ্ময়ীর দিকে তাকাইতে তাকাইতে সুড়ঙ্গের বাহিরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এ দিকে দুর্ভাগ্যবতী সরলা হিরণ্ময়ী মুক্তিলাভের আশায় কালীদেবীর কএক প্রকার প্রসাদের কিছু কিছু খাইলেন। আহারের পর দেখিলেন, প্রদীপের ঘৃত ফুরাইয়া আসিয়াছে। অমনি তৎক্ষণাৎ উহাতে কতকটা ঘৃত ঢালিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাবনার ভিতর বেশীর ভাগ এই কথা ছিল, "হে মা কালি! আমাকে মুক্তি দান কর মা!' প্রথম দর্শনে হিরণ্ময়ীর চক্ষে এই কালীমূর্ত্তি রাক্ষসী বলিয়া বোধ হইয়াছিল, পরে তিনি চিনিতে পারিয়া ইহাঁরই শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

পাঠক মহাশয়! যদি এই কালিকাদেবী, সম্মুখে রোরুদ্যমানা নিপীড়িতা হিরণ্ময়ীর মঙ্গল সংসাধন না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইনি কালী নামে রাক্ষসী। কিন্তু যদি হিরণ্ময়ীর মুক্তি লাভ ঘটাইতে পারেন, তাহা হইলে ইনি যথার্থই দয়াময়ী কালী। তখন আমরাও হিরণ্ময়ীর সহিত ইহাঁর পূজা করিব।

পঞ্চপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রুরে।

ভৈরবানন্দ হিরণ্ময়ীর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া, তাড়াতাড়ি করিয়া স্নানাদি করিলেন। তার পর শ্মশানে যোগসাধন করিতে গেলেন। এখন্ ইহাঁর যোগসাধন মাথা আর মুণ্ড। প্রতি অক্ষিনিমেষপাতেই কেবল সেই চিন্তা—সেই হিরণ্ময়ীর চিন্তা। হিরণ্ময়ীই এক্ষণে ইহাঁর যোগসাধনের এক মাত্র মূল—একমাত্র সম্বল। কোথায় ইনি পূর্ব্বে মনস্থ করিয়াছিলেন যে, কোন একটি সুন্দরী ও সর্ব্বসুলক্ষণা যুবতী পাইলে, তাহাকে সম্মুখে বসাইয়া ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে লক্ষ জপ করিবেন, তা না হইয়া একে আর হইয়া পড়িল! বরঞ্চ ইনি হিরণ্ময়ীকে দেখিবার পূর্ব্বে ইন্দ্রিয় বশ করিয়া যোগাদি করিতেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া অবধি ইহাঁর মস্তক ঘুরিয়া গিয়াছে। এত দিন ধরিয়া যত যোগকষ্ট সহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গেল। শিবোক্ত তন্ত্র শাস্ত্র ইহাঁর নিকট অপমানিত হইল। পবিত্র পথের পথিক হইয়া, এবং দুর্জ্জেয় ইন্দ্রিয় জয় করিয়া যোগ-সাধন করা যার তার কর্ম্ম নয়—কখনই নয়। তা হইলে, বন ত বন—গিরি ত গিরি—শত সহস্র লোকনিবাস বৃহৎ বৃহৎ নগর পর্য্যন্তও যোগীর সংখ্যায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। তাই বলিতেছিলাম যে, ভৈরবানন্দ কাপালিকের ন্যায় যোগীর পক্ষে প্রকৃতরূপে যোগপথাবলম্বী হওয়া অত্যন্ত দুর্ঘট। যাউক, এখন্ আর এ সকল কথা পড়িয়া কোন ফল নাই।

ভৈরবানন্দ শ্মশানস্থিত যোগপীঠে উপবেশন করিয়া নিমীলিত-নেত্রে হিরণ্ময়ীর সেই অপূর্ব্ব অলৌকিক অচিন্তনীয় মুখসৌন্দর্য্য ভাবিতে লাগিলেন। "ওঁ নমঃ—ওঁ নমঃ" মন্ত্র পাঠ করিয়া কালিকাদেবীর পূজা করিলেন বটে, কিন্তু সে পূজায় গলদ্ পড়িয়া গেল।

অনন্তর যোগ পূজাদি সমাপন করিয়া মঠে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে কুড়ি পঁচিশ জন দস্যু তাঁহার নিকট আসিয়া প্রণাম করিল।

তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তির নাম চন্দুরে। সেও আজ কাল এক প্রকার দস্যুসর্দ্দার হইয়াছে।

উহারা সকলে নিকটে উপস্থিত হইলে, ভৈরবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোরা কি অভিপ্রায়ে এখন্ এখানে আসিয়াছিস্ ?"

চন্দুরে পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া মনের কথা নিবেদন করিল, "ঠাকুর মশাই! আজ দিন ভাল, যদি আপুনি আজ্ঞা কর, তবে একবার দলবল নে রাত্রিরে শুভ যাত্রাবাটা করি।"

ভৈ।—"কোন্ দিকে যাবি ?"

চ।—"পূর্ব্ব দিকপিনে।"

ভৈ।—"ভাগীরথীর ওপারে না এপারে ?"

চ।—"ওপারে।"

ভৈ।—"কোন্ স্থানে ?"

চ।—"গোবিন্দিপুরে।"

ভৈ।—"সেখানে কি কোন জমীদারের বাটীতে ?"

চ।—"আজ্ঞে।"

ভৈ।—"আশীর্ব্বাদ করিতেছি, নির্ব্বিঘ্নে কৃতকার্য্য হইয়া আয়।"

অনন্তর চন্দুরে স্বীয় দলবল লইয়া সেই মুহূর্ত্তেই গোবিন্দপুর যাত্রা করিল। দিনের বেলা প্রস্থান করিল বলিয়া সকলে তখন ছদ্মবেশে অস্ত্রাদি গোপন পূর্ব্বক তথা হইতে চলিয়া গেল।

পাঠক মহাশয়কে চন্দুরে দস্যুর বিষয় কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। বীরচাঁদ যখন ভৈরবানন্দকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিল, তখন এই চন্দুরেও তাহার সহিত ছিল। চন্দুরে বীরচাঁদের খুব অনুগত ও বিশ্বস্ত বন্ধু। বীরচাঁদ অন্যান্য দস্যুর অপেক্ষা ইহাকে ভালবাসিত ও বিশ্বাস করিত। বীরচাঁদ ইহাকে অনেক বার বিষম সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। চন্দুরেও তাহাকে দুই তিন বার বিপদ হইতে বাঁচাইয়াছিল। এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে আন্তরিক সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। আপাততঃ চন্দুরের কোথাও ডাকাইতি করিতে যাইবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এক্ষণে সে সহসা সেই কার্য্য করিতে প্রস্থান করিল। উদ্দেশ্য—ডাকাইতিকে ডাকাইতি আর সেই সঙ্গে

সঙ্গে বীরচাঁদের অনুসন্ধান। কিন্তু তাহার সঙ্গী দস্যুগণ কেবল প্রথমটিই বুঝিয়া লইল।

চন্দুরের বয়ঃক্রম চব্বিশ পঁচিশ বৎসর হইবে, হটাৎ দেখিলে বোধ হয়, যেন তেত্রিশ চৌত্রিশ বৎসরের। দেহবর্ণ খুব কাল নয়। চক্ষু দুইটি কোটরগত, ভ্রূযুগলে অল্প অল্প লোম, নাসিকা খর্ব্ব, কপাল চাপা, গাল পুরু, কান ছোট, অধর অপেক্ষা ওষ্ঠ মোটা, দাঁতে মিশি মাজন, ঘাড় বেঁটে সুতরাং মোটা, হাতের আঙুলগুলি ছোট ছোট, বাহু যুগল ও বক্ষঃস্থল ঢৌলসই। তাহার গাত্রের কএক স্থানে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন আছে। তাহার হাঁটুর একস্থানে এক সময়ে দূর হইতে শর নিক্ষিপ্ত হইয়া বিঁধিয়া গিয়াছিল বলিয়া, আজিও সে কতক কতক খোঁড়াইয়া যাতায়াত করে। এইত গেল রূপবর্ণন। সুতরাং এক্ষণে গুণ বর্ণন চাই ;—চন্দুরে বড় নিষ্ঠুর। সে ভৈরবানন্দ ও বীরচাঁদ ব্যতীত অপর কাহারই খাতির রাখে না। সকলের উপরেই চটা। সকলকেই একটুতে গালাগালি দেয়—তর্জ্জন গর্জ্জন করে। সুতরাং সকলে তাহাকে ভয় করিয়া চলে; কেহ তাহাকে কোন কিছু বলে না, কিন্তু মনে মনে তাহার এক গুণ গালাগালির প্রতিশোধ দশগুণ গালাগালিতে করিয়া লয়। সহচর দস্যুদের অপেক্ষা চন্দুরে অপরের সহিত কথোপকথনের সময় অধিক পরিমাণে অশ্লীল কথা উচ্চারণ করে। কেবল গুরুঠাকুরের নিকট প্রাণপণে সতর্ক হইয়া কথা কয়। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি বীরচাঁদের হৃদয় উদার, মন সরল হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু চন্দুরের হৃদয় ও মন একেবারেই উদারতা ও সরলতা জানে না। কেবল সে ভৈরবানন্দ ও বীরচাঁদের নিকট সময় বিশেষে কপটতা করিয়া ঐ দুইটি বৃত্তিকে দেখাইবার চেষ্টা করে--চন্দুরে নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর।

এ দিকে দেখিতে দেখিতে বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। ভৈরবানন্দ আজ এতক্ষণ ধরিয়া শ্মশানেই বসিয়া ছিলেন। এক্ষণে তিনি গাত্রোত্থান করিয়া, মঠে যাওয়ার পরিবর্ত্তে বরাবর হিরণ্ময়ীর নিকট প্রস্থান করিলেন।

ষট পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

সেই মূর্ত্তি।

সুড়ঙ্গের মধ্যে দুঃখিনী হিরণ্ময়ী চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছেন। তাঁহার সেই চিত্রাঙ্কিতবৎ বিষাদময়ী মূর্ত্তি দেখিলে তাঁহাকে গাঢ়তর চিন্তাময়ী বলিয়া কে না বিশ্বাস করিবে? তিনি এক এক বার আপন অবস্থার আদ্যোপান্ত ভাবিতেছেন আর মুহুর্মুহু অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। কখন কখন বক্ষে ও ললাটে করাঘাত করিয়া কালিকা দেবীর দিকে চাহিতেছেন। তাঁহার মর্ম্মবেদনার সীমা নাই।

এই রূপে কিয়ৎক্ষণ গত হইলে পর, তাঁহার মুখ হইতে এই অন্তর্ভেদি বাক্যগুলি শুনা গেল;—"হায়! আমি কি হতভাগিনী—কি মহাপাপিনী! আমি পিতা মাতার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া, যে কাজ করিয়াছি, তাহার পরিণাম যে এইরূপ হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আমি তাঁহাদিগকে না বলিয়া আসিয়া কখনই ভাল করি নাই। এক্ষণে তাঁহারা আমার জন্য, না জানি, কতই কাঁদিতেছেন—দুঃখ করিতেছেন। বিধাতা ইহা দেখিতে পারিবেন কেন? তাই এক্ষণে আমার এই দশা ঘটিয়াছে। পাপ করিয়াছি, তাই ভুগিতেছি। কিন্তু এখনও আমার এই ভোগের শেষ হয় নাই। না জানি, আরও কি হইবে!" শেষ কথাটি বলিয়াই হিরণ্ময়ী শিহরিয়া উঠিলেন। আরও বিমর্ষ হইয়া অধোমুখে কাঁদিতে লাগিলেন।

কাঁদিতে কাঁদিতে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইয়া গেল। হিরণ্ময়ী আবার গভীর দুঃখের সহিত বলিলেন, "মা কালি! এই হতভাগিনীকে আর কেন বাঁচাইয়া রাখিয়াছ?" তোমার কণ্ঠে নরমুণ্ডগুলি ঝুলিতেছে, তন্মধ্যে আমার মুণ্ডকেও ঝুলাইয়া লও। আমি আর সহিতে পারি না। মা গো! যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না! আমাকে মরিবার উপায় বলিয়া দাও। তুমি দয়াময়ী; তোমার কাছে থেকেও কি আমার এই দারুণ যন্ত্রণার অবসান হইবে না?—মা! তোমার হাতের কৃপাণ স্থানান্তরিত হইয়াছে, তা নহিলে এতক্ষণ

তোমার সম্মুখে এই দেহ নিহত হইয়া পড়িয়া থাকিত।" এই বলিয়া হিরণ্ময়ী আবার অশ্রু মোচন করিয়া হতাশ চিত্তে কি ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সহসা ভোজন পাত্রের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। অমনি তাঁহার মনেও ভাবান্তর ঘটিল। তখন তিনি যেন আপনা আপনি আশ্বস্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, আমি কথা রক্ষা করিয়া দেবীর প্রসাদ খাইযাছি, এইবার এই সুড়ঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি পাইব। এইবার সেই লোকটি আসিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিবে। সে কে? আমি একবার আমাদের বাড়ীতে এই-রূপ মানুষ দেখিয়া ছিলাম। বাবাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিযাছিলেন "কাপালিক।" একেও সেইরূপ দেখিতেছি। সে এই কালীদেবীর পূজা করে। যাই হউক, এইবার আমাকে সে ছাড়িয়া দিবে।" এই বলিযা কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। আবার বলিলেন, "আচ্ছা, এ ব্যক্তি যদি এরূপ একজন ধার্ম্মিক, তবে আমাকে তেমন করিযা কেন এখানে ধরিয়া আনিল? ইহার মনের ভাব কি?" এই বলিযা আবার হিরণ্ময়ী অস্থির হইয়া উঠিলেন। "হে মা কালি, আমায় রক্ষা কর মা!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে সহসা তাঁহার কর্ণকুহরে দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দ প্রবেশ করিল। অমনি তিনি ভয়ে চুপ করিযা অশ্রু মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরেই দেখিলেন,—সেই মূর্ত্তি।

ভৈরবানন্দকে দেখিবা মাত্রই হিরণ্ময়ীর বদনমণ্ডল আনত হইল—দৃষ্টি ভূতলাকৃষ্ট হইল—হৃৎপিণ্ডের রক্তস্রোত প্রখর হইল।

ভৈরবানন্দ তাহাকে তদবস্থ দেখিযা কিযৎকাল নিস্তব্ধ ভাবে রহিলেন। অনন্তর কি ভাবিয়া, বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখিয়া এরূপ হও কেন?"

হিরণ্ময়ী এ কথার উত্তর না দিয়া, বলিলেন, "আমি আপনার আদেশে আহার করিয়াছি। এইবার আমাকে ছাড়িয়া দিন। আপনার কথা এবং আমার আশা পূর্ণ হউক। আমাকে সুড়ঙ্গের বাহিরে রাখিয়া আসুন্। কালীদেবী আপনার মঙ্গল করিবেন।"

ভৈরবানন্দ হিরণ্ময়ীর এই কথা শুনিয়া প্রথমত কোন উত্তর করিলেন না, কেবল কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া শেষে বলিলেন, "হ্যা দেখ, তুমি

যা বলিতেছ, সে কথা ঠিক্—আহার করিলে তোমাকে ছাড়িয়া দিব, এ কথা আমি বলিয়াছিলাম বটে। ফলে তাহা ঘটিবেও বটে, কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে কিছু বিলম্ব ঘটিয়া পড়িল।"

এ কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ীর চিত্ত চমকাইয়া উঠিল। তিনি কিয়ৎকাল কি ভাবিয়া, অবনতমুখে বলিলেন, "কি দৈব দুর্ব্বিপাক ঘটিল?"

ভৈ।—"আমি তোমাকে কেমন করিয়া একাকিনী ছাড়িবা দি? আবার দিলেই বা তুমি কোথা যাইবে? আমার নিতান্ত ইচ্ছা এই যে, যে লোকটি তোমাকে ধর্ম্ম-কন্যা বলিয়া তাহার গৃহে আনিয়া রাখিয়াছিল, তাহাকেই দিয়া তোমাকে তোমার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিব। কিন্তু সে এখন এখানে নাই। একমাস পরে আবার আসিবে। তখন এখান হইতে তোমার যাওয়াই কর্ত্তব্য।"

ভৈরবানন্দের এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ীর মনোমধ্যে যে কি রূপ এক অভিনব চিন্তা সমুদিত হইল, তাহা অপরে ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিবে না। তিনি পূর্ব্বে ভৈরবানন্দকে স্বীয় পিত্রালয়ের পরিচয় ঠিক করিয়া বলেন নাই। কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন, "ভৈরবানন্দ হয়ত তাহার কথিত স্থানেই তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবেন। তা' দিন, তাহাতে লাভ বই ক্ষতি নাই—পরিত্রাণ ঘটিবে, কিন্তু একমাস কাল বিলম্ব।" শেষের কএকটি কথা স্মরণ করিয়া আবার তাঁহার হৃদয় শতধা আন্দোলিত হইয়া উঠিল। তিনি কোনরূপ উত্তর করিতে পারিলেন না।

হিরণ্ময়ীকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া ভৈরবানন্দ বলিলেন, "কেমন, আমি যা বলিলাম, তাহা ভাল নয়?"

হি।—"আমি পথ চিনি। নিজেই যাইতে পারিব।"

ভৈরবানন্দ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তুমি পাগল।"

হি।—"আপনি যে শপথ করিয়াছিলেন?"

ভৈ।—"তাহার কার্য্যও ত করিব। ভয় কি? তুমি এখন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাক, আমি একবার মঠে যাই,—আবার আসিব।"

হিরণ্ময়ী কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু কি যে উত্তর করিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না।

ভৈরবানন্দ পূর্ব্ববৎ দ্বাররুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

সপ্তপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ-প্রস্তাব।

ক্রমে ক্রমে পাঁচ দিন গত হইয়া গেল। হিরণ্ময়ী দিনের মধ্যে শতবার দিন গণনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুঃখ, চিন্তা, ভয় ও রোদনের আর সীমা রহিল না।

ভৈরবানন্দ এই কয় দিন প্রত্যহ একবার, দুইবার, তিনবার করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিতেন। সপ্তম কি অষ্টম দিবসের মধ্যাহ্ন সময়ে পূর্ব্বের ন্যায় ভৈরবানন্দ হিরণ্ময়ীর নিকট উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া কতবার সান্ত্বনা করিলেন। হিরণ্ময়ীও তাঁহাকে দেখিলে প্রত্যহ যেরূপ হন, যেরূপ করেন, অদ্যও সেইরূপ হইলেন, সেইরূপ করিতে লাগিলেন।

ভৈরবানন্দ অনেকক্ষণ হিরণ্ময়ীর অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-গর্ব্বিত বদনমণ্ডলের দিকে আশাবিমুগ্ধা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, কি বলিবেন বলিবেন করিয়া থামিয়া গেলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ থামিতে পারিলেন না। বলিয়া ফেলিলেন, "সুন্দরি!—" আবার নীরব হইলেন।

হিরণ্ময়ীও নিরুত্তর।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভৈরবানন্দ আবার বলিলেন, "সুন্দরি! আজ তোমাকে আমার একটি কথা রাখিতে হইবে।"

হিরণ্ময়ীর চিন্তা চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠিল। তিনি উসখুস্ করিতে লাগি-লেন। তথা হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য উৎসুক হইলেন, কিন্তু কোথায় যাইবেন?

ভৈরবানন্দ আবার বলিলেন, "কই, উত্তর দিলে না যে?"

হি।—"কি উত্তর দিব?"

ভৈ।—"আমি যে কথা বলিব, সেই কথার উত্তর।"

হি।—"ভাল কথা হইলে ভাল উত্তর দিব।"

ভৈ।—"ভাল বই তোমার নিকট আমি কখন মন্দকথা জিহ্বাগ্রেও আনি না। যে কথা বলিব, তাহাতে উভয়েরই মঙ্গল হইবে।"

হি।—"কি বলুন্?"

ভৈ।—"আমি তোমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি। তুমি দয়া করিয়া আমার ইচ্ছা পরিপূর্ণ কর।"

হিরণ্ময়ীর কর্ণে এই কথা যেন শত সহস্র বজ্রপাতের ন্যায় প্রবেশ করিল। তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। চতুর্দ্দিকে যেন গাঢ় অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া গেল, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। কিন্তু উপযুক্ত উত্তরই দিবার ইচ্ছা ছিল। হতভাগিনী অনন্যোপায় হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু সম্মুখে ভৈরবানন্দ।

তদ্দর্শনে ভৈরবানন্দ শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "এ কি, তুমি হঠাৎ এমন হইলে কেন? কোথায় যাইবে? আমি কি তোমাকে কোন অপ্রিয় কথা বলিলাম?"

এবার হিরণ্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে আর কিছুই অপ্রিয় নাই।"

ভৈ।—"কেন?"

হি—"আপনি আর আমাকে এরূপ কথা বলিবেন না। বলিলে আমি আত্মঘাতিনী হইব। আপনি কি আমাকে এইজন্য ছাড়িয়া দিতেছেন না? হা, আপনার শপথের পরিণাম কি এই?" এই বলিয়া তিনি অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন।

ভৈরবানন্দ মহাবিপদেই পড়িলেন। তাঁহার নবোদিতা আশা লতা হতাশ পবনে যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু তথাপি তিনি আশা-লতার মূল ছাড়িলেন না। এইবার মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "তাই ত, কি করি? যাই হোক, এখন ইহাকে আর কিছু বলিব না। আর দিন কএক যাউক, ক্রমে ক্রমে সবই হইবে। নারীজাতি অল্পেতেই ভুলিয়া যায়, সুতরাং ইহাকে বুঝাইয়া বলিলে অবশ্য আমি কৃতকার্য্য হইব।" মনে মনে এই

কথা বলিয়া হিরণ্ময়ীকে বলিলেন, "আমি তোমায় পরিহাস করিতেছিলাম; তজ্জন্য তুমি কিছু মনে করিও না। বীরচাঁদ আসিলেই তোমাকে পাঠাইয়া দিব। আমি এখন চলিলাম।" এই বলিয়া তিনি তথা হইতে পূর্ব্ববৎ প্রস্থান করিলেন। কিন্তু হিরণ্ময়ীকে বিবাহ করিবার আশা তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে একবারও বিচ্যুত হইল না। তিনি, "সাধিলেই সিদ্ধি" এই মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে এইরূপে আরও কএক দিন অতিবাহিত হইল।

অষ্টপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

দস্যুহস্তে।

দেখিতে দেখিতে জ্যৈষ্ঠ মাস গত হইয়া এক্ষণে আষাঢ় মাসেরও প্রায় এক পক্ষ অতীত হইতে চলিল। সুতরাং বর্ষা ঋতুর প্রাদুর্ভাবে পৃথিবী এক নূতন শোভায় সুশোভিত হইল। এক্ষণে প্রচণ্ড উত্তাপের পরিবর্ত্তে বৃষ্টিপাতে সমস্ত পদার্থ যেন কতকটা শীতল হইয়াছে। কখন প্রাতে কখন মধ্যাহ্নে, কখন সায়াহ্নে, কখন রাত্রিকালে এবং কখন বা দিবারাত্রি বারি বর্ষণ হইতে লাগিল। 'চিরদিন কাহারই সমান না যায়' এক্ষণে সূর্য্যদেবেরও তাই ঘটিয়াছে। অনন্ত আকাশ-আবরণকারী মেঘ তাঁহার পরম শত্রু হইয়াছে। কাজেই এক্ষণে তিনি পূরা ১২।১৪ ঘণ্টাকাল অপ্রতিহতপ্রভাবে আর একাধিপত্য করিতে পাইতেছেন না। এক্ষণে নগর অপেক্ষা গ্রামের শোভা বড় মনোহর। শরৎকালে যে ক্ষেত্রভূমি শুকশ্যামল আবরণে আবৃত হইবে, এইক্ষণে তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। বৃক্ষ, লতা, তৃণ ও গুল্ম ধৌতধূলি হইয়া যেন অভিনব হরিদ্বর্ণে সুরঞ্জিত হইয়াছে। আম, কাঁঠাল, পিয়ারা, আনারস প্রভৃতি সুস্বাদু ফলগুলি বর্ষা ঋতুর রসভাণ্ডারের সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতেছে। পুষ্করিণী প্রভৃতি বিশুষ্ক জলাশয়গুলি এক্ষণে পূর্ণজল হইয়া মীনবংশের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছে। এক জলাশয়ের জল-স্রোত বহিয়া কলকলনাদে অপর জলাশয়ে গিয়া পড়িতেছে, কখন বা নিম্নভূমি দিয়া

বরাবর কোথায় চলিয়া যাইতেছে। তমাল-ডালে চাতক বলিতেছে, "ফটিক জল।" মেঘ ডাকিতেছে, কাজেই ময়ূর নাচিতেছে। মেঠো পথে যে বাহির হইতেছে, সে ভিজিতেছে। যাহার অর্থ নাই, তাহার জীর্ণ গৃহের চাল ভেদ করিয়া জল পড়িতেছে। আর বর্ষা বর্ণনার প্রয়োজন নাই। পাঠক মহাশয় আর যাহা যাহা জানেন, এই বর্ণনার সঙ্গে মিলাইয়া দিন।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে যে, দ্বিতীয় দস্যু-সর্দ্দার চন্দুরে ভৈরবানন্দের নিকট বিদায় লইয়া দলবল সহ গোবিন্দপুরে ডাকাইতি করিবার জন্য বহির্গত হইয়াছিল। সে এক্ষণে তথায় ডাকাইতি করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে। সে এই সময়ের মধ্যে কয়েক স্থলে তাহার পরম বন্ধু বীরচাঁদের অনুসন্ধান করিয়াছিল, কিন্তু কাজে কিছুই হয় নাই। তথাপি সে আশা ত্যাগ করে নাই। এক্ষণে দুরাত্মা চন্দুরে অপরাপর দস্যুর সহিত ভাগীরথীর বাম (পূর্ব্ব) তটে উপনীত হইল। এক্ষণে রাত্রিকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। গুঁড়ুনি গুঁড়ুনি বৃষ্টি হইতেছে।

এই দুর্যোগ, অদ্য বেলা তৃতীয় প্রহর হইতে এখনও সমান ভাবে রহিয়াছে। এই জন্য সেই সময় হইতে এক খানি নৌকা ভাগীরথীর উক্ত তটে আবদ্ধ আছে। চন্দুরে সহসা স্বদলবল সহ সেই নৌকাখানি আক্রমণ করিল। নৌকায় চারি জন দাঁড়ী মাঝী এবং একজন আরোহী। তাহারা সকলেই নিদ্রিত ছিল। সহসা দস্যুদিগের কোলাহল ও চীৎকার শুনিয়া তাহারা সকলেই জাগ্রত হইল। জাগ্রত হইয়া দেখিল, সম্মুখে কতকগুলা যমদূত।

চন্দুরে এবং তাহার সঙ্গিগণ দাঁড়ীমাঝীদিগকে অত্যন্ত প্রহার করিল। তাহারাও আত্ম রক্ষার জন্য উদ্যত হইল বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। তিন জন জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পলাইয়া গেল, কিন্তু এক জন অত্যন্ত আঘাতিত হইয়া নৌকাগর্ভে পতিত হইল। তাহার বাঁচিবার আশায় সংশয় ঘটিল।

অনন্তর দস্যুগণ আরোহীকে আক্রমণ করিয়া বলিল, "তোর কাছে যা যা আছে, সব আমাদের দে, নৈলে এই ছোরায় তোর টুঁটি কেটে ফেল্‌ব।"

আরোহী তাহাদিগের এই লোমহর্ষণ বাক্য শুনিয়া কএকবার সাহস বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু তাহারা তাহাতে কর্ণপাত

করিল না—আবার ভয় দেখাইতে লাগিল। আরোহী তদ্দর্শনে তাহাদিগকে গালি দিয়া কহিলেন, "দুরাত্মারা আমি নিরস্ত্র, তোরা আমার অগোচরে আমার অস্ত্র অধিকার করিয়াছিস্, নৈলে এতক্ষণ ইহার প্রতিফল দিতাম।"

একএক জন দস্যু, আরোহীর এই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে নিহত করিবার জন্য উদ্যত হইল, কিন্তু দস্যুসর্দ্দার চন্দুরে তৎক্ষণাৎ নিষেধ করিয়া কহিল, "না রে না, একে এখন মেরে ফেলিস্ নি। এ ত আমাদেরি হাতের ভেতর। একে ক'সে বেধে ফেল্। আস্চে কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যের রেতে কালীর কাছে এক বলি দেব। সে দিন নরবলি দিলে আমাদের খুব পুণ্যি হ'বে। একে এখন বেঁধে নিয়ে যাই চল্।"

চন্দুরের এই কথায় সকলে স্বীকৃত হইল। সকলে আরোহী যুবাকে বন্ধন করিয়া লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। তাঁহার সঙ্গে যা কিছু অর্থাদি ছিল, তৎসমস্তই দস্যুদের হস্তগত হইল। কেবল শূন্য নৌকা খানা পড়িয়া রহিল। দস্যুগণ অনেকবার এই যুবার নাম ধাম জানিবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু সে বিষয়ে কোন উত্তর পাইল না। যুবা পূর্ব্বের ন্যায় দস্যুগণকে অনেক ভর্ৎসনা ও সাহসোক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কিছু লাভ হইল না, বরং দস্যুদের আক্রোশ এবং ক্রোধ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পাঠক মহাশয় কি এই যুবাকে জানেন? ইহাঁর নাম ধীরেন্দ্রনাথ।

অনন্তর যথা সময়ে দস্যুগণ তাহাদিগের গুরু ভৈরবানন্দের নিকট উপনীত হইল। তাহাদিগের সঙ্গে নানাবিধ লুণ্ঠিত দ্রব্য ও ধীরেন্দ্রনাথ।

ভৈরবানন্দ ধীরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া, চন্দুরেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ লোকটা কে?"

চন্দুরে ধীরেন্দ্রনাথ-ঘটিত সমুদয় ব্যাপার বলিল। তাহার উপর আরও একটা গুরুতর মিথ্যাকথা যোগ করিয়া বলিল, "ঠাকুর! এই ছোড়া আপনকাকেও অনেক গাল মন্দ দিয়েচে।"

তাহার এই কথা শুনিয়া ধীরেন্দ্র ক্রোধে ও ঘৃণায় অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "দস্যু! তুই মিথ্যাবাদী।" বাস্তবিক ধীরেন্দ্রনাথ ভৈরবানন্দকে জানেন না, সুতরাং কোন কটুকাটব্যও প্রয়োগ করেন নাই। চন্দুরে

তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়াতে ভৈরবানন্দকে এই কথা গড়িয়া শুনাইল। কেন না, এরূপ করিলে, তাহার উদ্দেশ্য সফল হইতে আর কোন বাধা থাকিবে না। ফলে তাহাই হইল। ভৈরবানন্দ চন্দুরের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিলেন এবং ধৃত যুবকের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। চন্দুরে সুযোগ বুঝিয়া কালীদেবীর নিকট যুবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নরবলির কথা তুলিল। ভৈরবানন্দ তাহাতে সম্মত হইলেন। অনন্তর তিনি আদেশ করিলেন, "এই পাপাত্মা যুবাকে লইয়া গিয়া কালী বাড়ীর বন্দী প্রকোষ্ঠে বন্দী অবস্থায় রাখিয়া দাও। সে প্রকোষ্ঠের এই তালা চাবি লও।" চন্দুরের হস্তে তালা চাবি দেওয়া হইল। চন্দুর এবং অন্যান্য দস্যুগণ কৃতকার্য্য হইল বলিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল।

অনন্তর হতভাগ্য ধীরেন্দ্রনাথ কালী-মন্দিরের বন্দী প্রকোষ্ঠে অবরুদ্ধ হইলেন। তাঁহার চিন্তা দুঃখ প্রভৃতির আর সীমা রহিল না। বিশেষতঃ তিনি হিরণ্ময়ীর কোন সন্ধান করিতে পারিলেন না বলিয়া আর পর নাই অবসন্ন হইলেন। পাঠক মহাশয়, এক্ষণে আপনার উপরই বন্দী ধীরেন্দ্রনাথের দুরবস্থা বিষয়ের ভার দিলাম।

ধীরেন্দ্রনাথ কালীবাটীতে বন্দী দশায় আপনার দুর্ভাগ্য ভাবিতে ভাবিতে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার সেই কাল নিশা তাঁহার স্মৃতিপথে পুনঃপুনঃ সমুদিত হইয়া, তাহাকে অতিশয় হতাশ করিতে লাগিল। এক এক দিন করিয়া এক পক্ষ অতীত হইয়া গেল।

ঊনষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

পাপকার্য্যের পরিণাম।

বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বোধ হয়, সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরেই বৃষ্টি হইবে। এমন সময়ে একটি লোক বগুড়া গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই লোকটি বিদেশীয়, সুতরাং বগুড়া গ্রামের কাহার সহিত ইহার আলাপ পরিচয় ছিল না।

এই আগন্তুক ব্যক্তি বহড়া গ্রামের একটি স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা, এই গাঁয়ে মঙ্গলা নামে একটি মেয়ে লোক কোন খানে থাকে?"

তাহার কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি বলিল, "মুঙ্গলী বুড়ী?"

আগন্তুক বলিল, "হাঁ, সে বুড়ী বটে।"

স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল, "সে এখন এখানে নেই। এখানকার ভিটে ছেড়ে, কাজলাবেড়ে ব'লে একটা গাঁ আছে, সেইখানে ঘর ক'রেচে! তা'র সঙ্গে তা'র দু'টো ব্যাটাও সেই গাঁয়ে আছে।"

আগন্তুক বলিল, "কেন সে এ গাঁ ছেড়ে গেল?"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "সে তা'র ব্যাটাদের সঙ্গে যড় ক'রে তিনটি লোককে এক দিন রাত্তিরে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে ছিল। শেষে গোলমাল হওয়াতে এখান থেকে পালিয়ে যায়।"

আগন্তুক।—"তোমরা জেনে শুনে তাকে ছেড়ে দিলে কেন?"

স্ত্রীলোক।—"ঠিক সাবুদ পাওয়া যায় নি। কিন্তু গাঁয়ের জমীদার আর পেরজারা তাদের তিন জনের বিপক্ষী হওয়াতে, তারা এখানে তিষ্টুতে পা'রে না—পালিয়ে গেল।"

আগন্তুক কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, "কাজলাবেড়ে এখান-থেকে কতদূর?"

স্ত্রীলোক।—"এখান থেকে দশ কোশ দখিনে।" এই বলিয়া আবার বলিল, "হ্যাঁ গা, তুমি তার খোঁজ ক'চ্চ কেন?"

আগন্তুক এ কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "তা'র ব্যাটাদের নাম কি?"

স্ত্রীলোক।—"ভোলা আর ল'খে।"

আগন্তুক আর কোন কথা না বলিয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল। তখন জিজ্ঞাসিতা গ্রামবাসিনী স্ত্রীলোকটি কি ভাবিতে ভাবিতে তথা হইতে আপনার গৃহের দিকে চলিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। রাত্রির প্রথম প্রহর উপনীত হইল।

বহড়া গ্রামে যে অপরিচিত ব্যক্তিকে অপরাহ্ন সময়ে দেখা গিয়াছিল,

সে এখন কাজলাবেড়ে গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বরাবর চলিয়া আসাতে তাহাকে কতকটা পরিশ্রান্ত বোধ হইল, সে প্রথমতঃ গ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া, বহির্ভাগে একটি বৃহৎ অশ্বথ-মূলে বিশ্রাম করিতে লাগিল। আমরা তখন বৃষ্টি হইবার যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, আগন্তুকের সৌভাগ্য-বশতঃ তাহা হয় নাই। বরং এক্ষণে আকাশ মেঘমুক্ত হইয়া, দশমীর চন্দ্রকে কোলে করিয়া, অন্ধকারকে দূর করিয়া দিয়াছে। শীতল সমীরণ মৃদু মন্দ বহিতেছে, সুতরাং আগন্তুক ব্যক্তি অচিরেই গতক্লম হইয়া সুস্থ হইল। কিন্তু এখনও মঙ্গলার কোন অনুসন্ধান না পাইয়া মনে মনে অসুস্থ রহিল। সহসা গ্রামের ভিতর গিয়া তাহার অনুসন্ধান করা, তাহার পক্ষে ভাল বিবেচনা হইল না।

আগন্তুক ব্যক্তি অনেকক্ষণ সেই অশ্বথবৃক্ষতলে উপবিষ্ট রহিল, তথাপি সেখানে কোন লোককে দেখিতে পাইল না। ক্রমে রাত্রি সার্দ্ধেক প্রহর অতীত হইয়া গেল।

এমন সময়ে অনেক দূরে দুই জন লোক দেখা গেল। তাহারা উক্ত গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া মাঠের দিকে চলিয়া যাইতেছিল। আগন্তুক ব্যক্তি তাহাদিগকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অশ্বথবৃক্ষের কাণ্ডপার্শ্বে লুক্কায়িত ভাবে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। পাছে সেই দুই জন লোক তাহাকে দেখিতে পায়, এই জন্যই সে এরূপ ভাবে আত্মগোপন করিল। অনন্তর তাহারা আরও কিয়দ্দূর গমন করিলে, আগন্তুক লোকটি, তাহারা যে দিকে যাইতেছিল, সেই দিকে চলিল। কিন্তু তাহার মনে কিসের সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে, সে গতিচাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া আর একদিকে বেগে চলিতে লাগিল। অনন্তর সে, সেই দুই জন লোকের গতিপথের বিপরীত দিকে আসিয়া সম্মুখে আসিয়া পড়িল। তাহারা দেখিল, এই লোকটা গমন-কারী নহে, কিন্তু আগমনকারী।

উভয়ে কিঞ্চিদ্দূর হইতে উহাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "কে তুই?—কোথা যাচ্চিস্?—দাঁড়া।"

আগন্তুক লোকটি যেন তটস্থ হইয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, "অ্যাঁ—অ্যাঁ—কি কি—কেন!"

সেই দুই জন ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "তোর কাছে কি আছে—দে; নৈলে এখনি মেরে ফেল্‌ব।" এই বলিয়া উভয়ে লাঠি বাগাইয়া ধরিল।

আগন্তুক ব্যক্তি কোন কথা না বলিয়া কৌশল সহকারে উহাদের এক জনের বক্ষঃস্থলে দারুণ পদাঘাত করিল। সে তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া ভূবক্ষে পড়িয়া গেল। উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহার মুখ হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল।

অনন্তর আগন্তুক স্বীয় মুষ্টিধৃত স্থূলযষ্টির বজ্রসম আঘাতে দ্বিতীয় ব্যক্তির ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ করিয়া দিল। সে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ সাংঘাতিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পঞ্চত্ব লাভ করিল। কিন্তু যে ব্যক্তি অগ্রে আগন্তুকের নিদারুণ পদপ্রহারে ভগ্নবক্ষ হইয়া ভূতলে পড়িয়া গিয়াছিল, সে এখনও জীবিত।

আগন্তুক ক্রোধবাক্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বল্, তোরা কারা? নৈলে এখনি একেবারে নিকেস্ করব।"

তখন সেই লোকটা গোঁগাইতে গোঁগাইতে বলিল, "কেন?"

আগন্তুক।—"বল্‌বি নি শালা? তবে এই দ্যাখ্।" এই বলিয়া সে তাহার বক্ষঃস্থলে চাপিয়া বসিল।

তখন সে মৃত্যুযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অতি কষ্টে বলিল, "আমার নাম ল'খে; আর এ আমার দাদা—নাম ভোলা। প্রাণ গেল—ছেড়ে দাও—ঘাট হ'য়েচে—এমন কর্ম্ম আর ক'র্‌ব না। যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল হ'য়েচে। উঃ—উঃ—গেলুম—গেলুম!

আগন্তুক তাহাদের নাম শুনিয়া বলিল, "শালারা! এতক্ষণে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল। অনেক দিন ধ'রে তোদের সেই মা শালীর খোঁজ ক'চ্চি। কিন্তু তোদের জানতুম না। তো শালাদের আর তোদের মা শালীর যেমন কর্ম্ম ত'ার তেম্নি ফল দিচ্চি। বল্, তোর মা বেটী কোথা আছে।"

আগন্তুকের এই কথা শুনিয়া ল'খে অবাক্ হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "তাই ত, এ লোকটা কে? এ আবার আমাদের মাকেও জানে। এ কি হ'ল।" অনন্তর সে আগন্তুককে বলিল, "আমাদের মা নেই—ম'রে গেচে।"

আগন্তুক।—"মরে নি, এই বার মর্‌বে। হ্যাঁ রে শালা! মুঙ্গলী শালী তোদের কে?"

এই কথা শুনিয়া ল'খের আপাদমস্তক একবার কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সে কিছু বলিল না।

আগন্তুক ব্যক্তি তাহাকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া আবার বলিল, "কই, কিছু বল্‌লি নি যে? যদি বাঁচবের ইচ্ছে থাকে, তবে এখনি বল্। নৈলে, বুকে ত চেপে বসেইচি, আবার গলা টিপে মেরে ফেলব।" এই বলিয়া বক্ষ স্থলে দুই তিন বার সবলে চাপ দিল।

পাপাত্মা ল'খের পক্ষে আগন্তুক যেন বিশ্বস্তর মূর্ত্তি ধরিয়াছে,বোধ হইল। সে যন্ত্রণায় এরূপ কাতর ও হতচেতন হইল যে, আর কোন উত্তর দিবার অবসর পাইল না। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু আসিয়া তাহার পাপময় জীবনের শেষ গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া দিল। আগন্তুক দেখিল, দস্যু আর বাঁচিয়া নাই, তাহার চাপে রুদ্ধনিশ্বাস হইয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

অনন্তর আগন্তুক, ভোলা ও ল'খের মৃত দেহ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া, নিঃসন্দেহে তথা হইতে প্রস্থান করিল। সে যে কোথায় গেল, তাহা বলিতে পারি না।

কাজলাবেড়ের প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছিল।

ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

আবার হত্যা।

এক্ষণে রাত্রি তৃতীয় প্রহর। চন্দ্র বিশাল আকাশের পূর্ব্ব দিক অতিক্রম করিয়া পশ্চিম দিকে উপনীত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি স্তরে স্তরে গা ঢালিয়া দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। প্রকৃতিমূর্ত্তি গম্ভীর।

যে আগন্তুক লোকটি ভোলা ও ল'খের জীবন সংহার করিয়াছিল, এক্ষণে তাহাকে আবার কাজলাবেড়ের পশ্চিম সীমায় দেখা গেল। সে সেই স্থানের

একটা পুষ্করিণীর অবতরণ-সোপানে বসিয়া অঞ্জলিযোগে জল পান করিতেছে।

এমন সময়ে হঠাৎ দুই জন লোক পুষ্করিণীর পর পারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আগন্তুক জল পান করিতে করিতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইল। বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, সেই দুই জনের মধ্যে এক জন স্ত্রীলোক অপর জন বালক। দূর হইতে তাহার চক্ষে অস্পষ্টভাবে বোধ হইল, যেন স্ত্রীলোকটি বালকটিকে কি বলিতে বলিতে, পুষ্করিণীর ঘাটের দিকে আসিতেছে।

আগন্তুক লোকটি আর স্থির থাকিতে পারিল না। ঈদৃশ গভীর নিশীতে এরূপ নির্জ্জনস্থলে মনুষ্য সমাগম তাহার পক্ষে কেমন কেমন লাগিল। সে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সন্নিকটস্থ একটি বকুল বৃক্ষে আরোহণ করিল। বৃক্ষটা শাখা প্রশাখায় অত্যন্ত নিবিড়।

কিয়ৎকাল পরে সেই বৃদ্ধা ও বালকটি পুষ্করিণীর ঘাটে আসিয়া উপনীত হইল। বালকটি তৃষ্ণার্ত্ত ছিল বলিয়া জল পান করিল। বৃদ্ধা ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। যে আগন্তুক ব্যক্তি ঘাটস্থিত বকুল বৃক্ষে আরোহণ করিয়া গোপনে বসিয়া আছে, বৃদ্ধা বা বালক পূর্ব্বে বা এক্ষণে তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

বালক জল পান করিয়া উপরে উঠিলে, বৃদ্ধা বলিল, "দেখ, বাছা! ভগবানের ইচ্ছেয় আজ তুমি এই রেতের বেলায় কোন বিপদে পড়নি, কিন্তু এখনো বিপদের অনেক সম্ভাবনা আছে। এই গাঁ আর এই গাঁয়ের আশপাশের জায়গা বড় ভাল নয়। এখানে ডাকাৎ, চোর, লেঠেল, খুনে এই রকম লোক অনেক আছে। তুমি বিদেশী,কাজেই আমার মনে বড় ভয় হচ্চে। এখন এক কাজ কর,—তোমার কাছে যা যা আছে, সে সব আমার কাছে রেখে দাও। আমার সঙ্গে শীগ্গির শীগ্গির এই বেলা আমার বাড়ী চল। তার পর কাল দিনের বেলায় তোমার যেখানে ইচ্ছে,সেখানে যেও। এমন রে'তেও কি পথ চলতে আছে? তাতে আবার তুমি ছেলে মানুষ —একলা।"

বালক বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়া বলিল, "ভাগ্যে, বাছা। তোমার দেখা পেয়েছিলুম, নৈলে আমার আজ যে, কি হ'তে কি হ'ত, তা পরমেশ্বরই জানেন।"

বৃদ্ধা বলিল, "আর কোন ভয় নেই। আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ তোমার বাড়ীতে আছ, মনে কর।"

অনন্তর বালক নিঃসন্দেহে বৃদ্ধার হস্তে কএকটি মুদ্রা এবং একটি অঙ্গুরী দিল। বৃদ্ধা সেইগুলি আপনার অঞ্চলে বাঁধিয়া, তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিতে লাগিল। যাইবার সময় বৃদ্ধা বালকটিকে আর একবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা জেতে চাঁড়াল না বলেছিলে ?"

বালকটি বলিল, "হ্যাঁ।"

বৃদ্ধা।—"তুমি এমন দামি আঙুটী পেলে কোথায় ?"

বালক।—"আমাকে একজন এ আংটিটি দিয়েচে।"

বকুল বৃক্ষারূঢ় আগন্তুক ব্যক্তি এতক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া নীরবে বৃদ্ধা ও বালকের কথোপকথন শুনিতেছিল। সে এইবার মনে মনে ভাবিল, "এ বুড়ী কে ? আমি যার খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছিলুম, এই কি সেই ? এই কি সেই লোখে ভোলার পাপিনী মা ? এই কি সেই বারুণী ? আমি দেখ্‌চি, আজ এর হাতে এই বিদেশী চাঁড়াল ছেলেটির শেষ দিন উপস্থিত। আর আমার চুপ্ ক'রে থাকা হ'ল না। বিশেষরূপ তদন্ত ক'রে দেখি।" এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হইতে ভূতলে লম্ফ প্রদান করিয়া একেবারে বৃদ্ধার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।

বৃদ্ধা সহসা একজন পুরুষকে বৃক্ষ হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া, তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া, ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল। কি বলিবে বলিবে করিয়াও বলিতে পারিল না—জিহ্বা জড়বৎ হইয়া গেল। সে তখন অন্য উপায় না দেখিয়া পলাইবার পন্থা দেখিতে লাগিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না।

ইত্যবসরে চণ্ডাল বালক, সেই ব্যক্তিকে দস্যু জ্ঞান করিয়া প্রাণভয়ে পশ্চাদ্দিক দিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া গেল। কিয়দ্দূর গিয়া বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে অন্তর্হিত হইল, আর তাহাকে দেখা গেল না। আগন্তুক ব্যক্তি সে বিষয়ে

মনোনিবেশ করিল না। সে কেবল বৃদ্ধার গতিপথ অবরোধ করিয়া, কটিদেশ হইতে একখানি তীক্ষধার ছোরা বাহির করিয়া তাহাকে সগর্ব্বে ভয় দেখাইয়া বলিল, "খবদ্দার, যদি চেঁচাবি, তা হ'লে এখনি এই ছোরাতে তোর গলা কেটে ফেল্‌ব।"

বৃদ্ধা প্রাণভয়ে আরও আড়ষ্ট হইয়া একদৃষ্টে আগন্তুকের দিকে চাহিয়া রহিল; চক্ষে পলক নাই। বোধ হইল, বৃদ্ধা যেন দাঁড়াইয়া মরিয়াছে।

আগন্তুক আর কালবিলম্ব না করিয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বল্ তোর নাম কি? নৈলে যমের সঙ্গে এখনি তোর দেখা সাক্ষেৎ হ'বে।"

বৃদ্ধা যে কি বলিবে, ভাবিয়া আকুল হইল।

আগন্তুক তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া, একবার হাস্য করিল, কিন্তু অব্যাহতি দিল না। আবার সেই কথা জিজ্ঞাসা করিল।

বৃদ্ধা অনন্যোপায় হইয়া বলিল, "আমার নাম মঙ্গলা। আচ্ছা, বাবা! কেন তুমি আমার নাম জিজ্ঞেস ক'চ্চ?"

আগন্তুক।—"তুই অনেক বিদেশী অসহায় মানুষকে ধনে-প্রাণে নষ্ট করেচিস্, আজ তোকে তার পিরতিফল দেব, তাই তোর নাম—"

"না, বাবা! আমি গরিব দুঃখী লোক। আমি উপকার ভিন্ন কখন কারো অপকার করিনি।" বৃদ্ধা আগন্তুকের কথায় বাধা দিয়া এই কথা বলিল। তাহার এই কথগুলির প্রত্যেক অক্ষরে ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ পাইল।

আগন্তুক সক্রোধে বলিল, "পাপিনি! আমি তোর কোন কথাই শুন্‌তে চাইনি। আচ্ছা, বল দেখি, লোখে আর ভোলা তোর কে?"

বৃদ্ধা কি ভাবিয়া নিরুত্তর।

আগন্তুক।—"আজ তাদের যে গতি, তোরও সেই গতি। রাক্ষুসি। তুই আমার ধর্ম্মমেয়েকে বিষ খাইয়েছিলি। ভগবান্ তাকে প্রাণে বাঁচিয়েচে, কিন্তু তোকে বাঁচাবে না। আজ আমার হাতে তোর মরণ। তুই নিশ্চয় জানিস্, বীরচাঁদের ধর্ম্মমেয়ের যে প্রাণবধ বা অন্য কোন অপকার করবার চেষ্টা বা ইচ্ছা করে, ভগবান্ তার পরমাই লেখেনি।"

বৃদ্ধা অধিকতর আতঙ্কে অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিল, "কে তোমার ধর্ম্মমেয়ে?"

আগন্তুক।—"যার হীরের বালা আর মুক্তোর মালা তোর কাছে আছে।" বীরচাঁদ এ কথা হিরণ্ময়ীর মুখে একবার শুনিয়াছিল।

এইবার বৃদ্ধার হিরণ্ময়ী ঘটিত সমস্ত ব্যাপার স্মরণ হইল। কিন্তু সে ভাঁড়াইয়া বলিল, "সে কি, বাবা! এ কি কথা! আমার বংশে কেউ এমন কর্ম্ম করে না।"

আগন্তুক।—"করে না? তবে তোর ব্যাটা ছুটো আমাকে মাঠে পেয়ে খুন ক'ত্তে এসেছিল কেন? তুইও আবার এখনি একটি বিদেশী ছেলেকে খুন্ করবার যোগাড় কচ্ছিলি। আজ তোকে আমি খুন কর্‌ব। তোকে খুন ক'ল্লে আর কোন লোক অকালে মরবে না। অথচ আমার মহাপুণ্যি হ'বে।" সে এই কথা বলিয়াই বৃদ্ধার আর কোন উত্তরের অপেক্ষা করিল না। বাম হস্তে তাহার পক্ব কেশগুলা আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণহস্তধৃত তীক্ষ্ণ ছোরার আঘাতে কণ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল। বৃদ্ধা ভূতলে পড়িয়া গেল—যন্ত্রণায় ছট ফট্ করিতে লাগিল—বৃদ্ধবয়োজনিত নিস্তেজ এবং স্বল্প-পরিমাণ শোণিত ছিট্‌কাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে হিরণ্ময়ীর বিষ-দাত্রী মহাপাপিনী পাষাণ-হৃদয়া মঙ্গলা পাপজীবন পরিত্যাগ করিল।

অনন্তর হত্যাকারী আগন্তুক বৃদ্ধার চিরসঙ্গী কাপড়ের পুঁটলিটি এবং চণ্ডাল বালকের নিকট হইতে প্রাপ্ত কএকটি মুদ্রা ও অঙ্গুরীয়কটি তাহার বস্ত্রাঞ্চল হইতে খুলিয়া লইয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে কোথায় চলিয়া গেল।

পাঠক মহাশয়! এই আগন্তুক যে আমাদের সেই সম্মানযোগ্য বীরচাঁদ, তাহা ইহার নিজের কথনে ব্যক্ত হইয়াছে, সুতরাং আর দ্বিরুক্তি করিব না।

একষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

ভৈরবানন্দের নূতন শিষ্য।

দেখিতে দেখিতে আষাঢ় মাস, এক বৎসরের জন্য ইহলোক ত্যাগ করিল। এক্ষণে "ধারায় শ্রাবণ"। প্রায় অহোরাত্রই অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। নদ,

নদী, খাল, বিল, পুষ্করিণী সমস্তই নূতন জলে বর্দ্ধিত হইযাছে। অজয় নদের বালুকাময় পুলিন এবং চর আর দেখা যায় না—উহা বর্ষার জলে কিছু দিনের জন্য ডুবিয়া গিযাছে। এক্ষণে অজয় নূতন বর্ণে, নূতন ভাবে, নূতন তেজে এবং নূতন উৎসাহে, প্রবল বেগে ছুটিতেছে। অজযে ঢাল নামিযাছে, সুতরাং উহার অপরিমিত জলরাশি পর্ব্বতধৌত গৈরিক বর্ণে সুরঞ্জিত হইয়াছে। গ্রাম্য পথগুলিতে (যে গুলি কাঁচা রাস্তা) নন্দোৎসবের দধিকাদার ধুম লাগিয়া গিযাছে। পথিকগণের আছাড় খাইবার, ভূত সাজিবার, শুভ্রবস্ত্র অশুভ্র করিবার, অর্দ্ধদণ্ডের পথ পাঁচদণ্ডে যাইবার, দেবতা, ভাগ্য এবং পথের অধিকারীকে সুমিষ্ট কথা শুনাইবার এমন সুবিধা আর হইবে না।

পাঠক মহাশয়। কেতকী (কেয়াফুল) ফুটিযাছে, বোকা ভ্রমর মধুলোভে বৃষ্টিজলে ভিজিযা ভিজিযা, মধুর বদলে কেয়াফুলের গুঁড়া মাখিযাছে—ভূত সাজিযাছে—রাগের নেশায় সে। হইযা কাজেও ভোঁ ভোঁ করিতেছে।

ভৈরবানন্দ অজযতটস্থ যে শ্মশানে বসিযা যোগ সাধন করিতেন, এক্ষণে সে শ্মশান স্রোতে ভাসিযা গিযাছে। অজয়জলের প্রবল বেগে উহার আর সে অবস্থা নাই। শ্মশানকেও আবার শ্মশানগত হইতে হইল!—কালের কাণ্ড কি অদ্ভুত।

এক্ষণে অজয়তটের আরও উপরে একটি নূতন শ্মশান দেখা দিযাছে। এই শ্মশানের ঐশ্বর্য্য এখনো বৃদ্ধি হয নাই। বোধ হয, দশটি কি বারটি মাত্র চিতা ইহার অধিকারভুক্ত হইযাছে। বর্ষার জলে তাহারও আবার কতক কতক ভাসিযা গিয়া অজয়জলে পড়িতেছে। এই স্থলে অজয নদকে দেখিলে উন্মত্ত-ভৈরবকে মনে পড়ে।

আজ-কাল ভৈরবানন্দ কাপালিক এই নূতন শ্মশানে যোগপীঠ স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু বৃষ্টি বাদলের দুর্য্যোগে তিনি প্রতিদিন আর সেখানে যাইতে পারেন না। কাজে কাজে মঠে বসিয়া পূজাদি সমাপন করিয়া থাকেন।

পাঠক মহাশযকে এখানে বলিয়া রাখি, ভৈরবানন্দ প্রত্যহ দুই তিন বার করিয়া হিরণ্মযীর নিকট গতায়াত করিযা থাকেন, কিন্তু আজিও

কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। হিরণ্ময়ী বিবাহ করিবেন না বলিয়া ইহাঁকে সর্ব্বদাই প্রত্যাখ্যান করেন, মরিতে উদ্যত হয়েন, সুতরাং ইহাঁর আশা এক্ষণে দুরাশায় পরিণত হইয়াছে। তবুও ইনি সেই নিষ্ফল আশার মূলে লোভ বারি সেচন করিতে নিরস্ত হইতেছেন না। এক একবার হতাশ হইতেছেন, আবার ভরসায় বুক বাধিতেছেন। শেষে ফল যে, কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা ঈশ্বরই জানেন।

যাই হৌক, আমরা ভৈরবানন্দকে এক বিষয়ে বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মভীরু বলিয়া ধন্যবাদ করিতে কুণ্ঠিত নহি। আজিও তিনি হিরণ্ময়ীর প্রতি কোনরূপ পশ্বাচার প্রদর্শন করেন নাই, এই জন্য তিনি আমাদের শত শত ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু তাঁহাকে সুডঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি দিলে কোটি কোটি ধন্যবাদ লাভ করিতে পারিতেন। তবে কথা এই, সকলে সকলের মনের মত কার্য্য করিতে পারে না। দেখাই যা'ক, পরে কি হইতে কি হয়।

হিরণ্ময়ীর শোক, দুঃখ, কষ্ট, দুশ্চিন্তা এবং ভৈরবানন্দের আশা, দুরাশা, মনোভঙ্গ, চিন্তা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহ চলিয়া গেল।

অষ্টম দিবসের প্রাতঃকালে ভৈরবানন্দ একাকী মঠে বসিয়া পূজার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় একটি বালক তাঁহার নিকট আসিয়া প্রণাম করিল। ভৈরবানন্দ উহাকে পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই, এই নূতন দেখিলেন। দেখিয়া তিনি উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? তোমার নাম কি? তোমরা কি লোক?"

বালক ক্রমে ক্রমে এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিল;—"আমি চাকুলে থেকে আস্‌চি—আমার নাম মাখন—আমরা নমশূদ্দুর।"

ভৈরবানন্দ উত্তর পাইয়া বলিলেন, "তোমরা চণ্ডাল?"

বালক।—"আজ্ঞে।"

ভৈ।—"তুমি কোথা যাইবে?"

বা।—"আজ্ঞে, আপনকারি ছিরিচরণ দর্শন ক'ত্তে এসেচি। আর কোথা যা'ব?"

ভৈরবানন্দ একটু হাসিলেন।

বালক আবার বলিল, "আপনকার চরণে আমার একটি নিবেদন আছে।"

ভৈ।—"কি?—বল।"

বা।—"আপুনি আমাকে দয়া ক'রে আপনকার শিষ্যি কর। আপুনি অনেক তন্তর মন্তর জান। আমি আপনকার কাছে ভূতের মন্তর, সাপের মন্তর আর অস্থি অস্থি মন্তর শিখ্‌তে ইচ্ছে করি।"

ভৈ।—"কেন?"

বা।—"আমাদের সকলের এই রকম মন্তর তন্তর শিখে ব্যবসা করা চলন, তা ত আপুনি জানেন।"

ভৈ।—"অন্যের নিকট শিখ্‌তে ত পার।"

বা।—"আমার মুরুব্বি কেউ নেই, কে শেখাবে? এখন আপনকার আছুয়ে এয়েচি; আপুনিই এই গরিবকে শেখাও। আপুনিই আমার গুরু।"

বালকটির এই কথা শুনিয়া ভৈরবানন্দের মন ফিরিল। তিনি তাহাকে শিষ্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল। বালকেরও কপাল ফিরিল।

কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া ভৈরবানন্দ বলিলেন, "যাও তুমি এখনি অজয়ে স্নান ক'রে পবিত্র হ'য়ে এস।"

বা।—"আজ্ঞে, আমি চান ক'রেই আপনকার কাছে এয়েচি।"

ভৈ।—"তা ভালই হইয়াছে। তবে তুমি ঐখানে দক্ষিণ-মুখ হইয়া উপবেশন কর।"

বালক তৎক্ষণাৎ তাহাই করিল। অনন্তর ভৈরবানন্দ কালিকা দেবীর পূজা করিয়া, শিষ্য করণোপযোগি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক চণ্ডাল বালককে শিষ্য করিয়া লইলেন। মাখন, ভৈরবানন্দের শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট মন্ত্রাদি শিক্ষা করিতে লাগিল। ভৈরবানন্দ তাহার জন্য এক খানি স্বতন্ত্র কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। মাখন চণ্ডাল, সুতরাং তাহা হইতে যে যে কার্য্য হইতে পারে, ভৈরবানন্দ তৎসমস্তের আদেশ, এবং যে যে কার্য্য তৎকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হওয়া অনুচিত, তৎসমস্তের নিষেধ করিলেন।

ক্রমে এক দিন—দুই দিন করিয়া প্রায় শ্রাবণ মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। মাখনের প্রতি ভৈরবানন্দেরও স্নেহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মাখন

স্বীয় প্রতিভাবলে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক মন্ত্র মুখস্থ করিয়া ফেলিল তদ্দর্শনে ভৈরবানন্দ অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

মঙ্গলা পিশাচী যে চণ্ডাল বালককে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে এই মাখন।

দ্বিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

কৌতূহল।

হিরণ্ময়ীর জন্য ভৈরবানন্দের চিত্ত যে, দিন দিন কিরূপ ভাবপরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা পাঠক মহাশয়কে আর কত বলিব? তিনি আপনিই তাহা বুঝিয়া লউন্।

ভৈরবানন্দ মাখনকে শিষ্য করিবার পর, তাহার আচার ব্যবহার দর্শনে, অতিশয় তৃপ্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। মাখনও প্রত্যহ অবহিতচিত্তে সেবা করিয়া গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিল।

এ দিকে, দেখিতে দেখিতে ভাদ্র মাসের শুক্লচতুর্দ্দশী তিথি সমুপস্থিত হইল। এই চতুর্দ্দশীর চন্দ্র—নষ্টচন্দ্র। এ চন্দ্রকে দেখিলে পাপ হয়—কলঙ্ক হয়, কিন্তু এই নষ্ট চন্দ্রের গভীর রাত্রিতে বিনাপরাধে পরের দ্রব্য সামগ্রী নষ্ট বা অপহরণ করিয়া গালাগালি খাইলে সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। চমৎকার বিধান। দস্যুদের পক্ষে এই চতুর্দ্দশী তিথির রাত্রি মহেন্দ্রক্ষণ বলিয়া গণ্য। এই জন্য চন্দুরে প্রভৃতি দস্যুগণ ভৈরবানন্দের নিকট বিদায় লইয়া এক বৎসরের পাপ ক্ষয় করিতে চলিল। অপরের সর্ব্বনাশ আর তাহাদের পাপহ্রাস! এ বিধিব্যবস্থার শ্রীচরণে শত কোটি নমস্কার।

চন্দুরে স্বীয় দলবলে সজ্জিত হইয়া শুভ-যাত্রার সময় ভৈরবানন্দকে বলিল, 'ঠাকুর মশাই! আমরা ভাদ্দর আর আশ্বিন, এই দু' মাস বাইরে বাইরেই থাকৃব। কার্ত্তিক মাসে এসে অমাবস্যের রেতে খুব ঘটা ক'রে কালী মা'র পূজো দেবো। আমি এসে সেই ছোঁড়াটাকে নিজের হাতে মা'র কাছে বলি দেবো। এখন চল্লেম—পেন্নাম।"

ভৈরবানন্দ আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন।

মাখন সে স্থানে দাঁড়াইয়া নীরবে এই সমস্ত কথা শুনিল। শুনিয়া মনে মনে ভাবিল, 'তাই ত, চন্দ্র'র কা'কে কা'দার কাছে বলি দেবে? সে কে? এখন কোথায় বা আছে? কিছুই ত বুঝ্‌তে পাচ্চি নি। নরবলি! নরবলি! কি আশ্চর্য্যি ব্যাপার! আমাকে একবার জানিয়ে দেখ্‌তে হবে। গুরু ঠাকুরকে এ কথা বল্‌ব?—না—বল্‌ব না। নিজেই চেষ্টা ক'রে দেখি।" এই বলিয়া সে কেবল কি ভাবিতে লাগিল।

ভৈরবানন্দ মাখনকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাখন! তুমি কি ভাবিতেছ?"

মাখন তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, 'এরা সব চ'লে গেল, তাই ভাব্‌চি।"

ভৈরবানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "ভয় কি? আমি ত আছি।"

মা।—"আজ্ঞে, ভয় কিছু না।"

ভৈরবানন্দ আর কিছু বলিলেন না।

অনন্তর মাখন তথা হইতে, কি আনিবার নাম করিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

এখন ভৈরবানন্দ একাকী। আকাশে নষ্টচন্দ্রও একাকী। ভৈরবানন্দ চাঁদের দিকে আর চাঁদ ভৈরবানন্দের দিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। কেন ভৈরবানন্দ আজিকার নষ্টচন্দ্র দেখিতেছেন?—বোধ হয়, কলঙ্কের ভয় নাই।

কিয়ৎকাল পরে ভৈরবানন্দ কাপালিক আপনি বলিতে লাগিলেন, "হা! সেই যুবতী কি আমার একমাত্র চিন্তাস্বরূপিণী হইয়া এখানে আসিয়াছে? সে কেন আমার পত্নী হইতে অস্বীকার করিতেছে? আমি যে কিছুতেই তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না। আর আমি এমন করিয়া কষ্ট সহ্য করিতে পারি না। এইবার তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইব; আর এক সপ্তাহকাল তাহার মুখ চাহিয়া থাকিব। তাহাতেও সে স্বীকৃত না হইলে, ছলে বলে কৌশলে তাহাকে বিবাহ করিব। বিবাহ করিতে দোষ কি?" এই বলিয়া তিনি নীরব হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

মাখন তখন কোথায় কি আনিতে গিয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু এখন তাহাকে ভৈরবানন্দের পশ্চাদ্ভাগে দেখা গেল। সে সম্মুখ দিকে

আসিতেছিল, কিন্তু সহসা এই সকল কথা শুনিতে পাইয়া, পশ্চাদ্ভাগে থমকিয়া দাঁড়াইল। একটি একটি করিয়া সমস্ত কথা শুনিল।

পূর্ব্বে ভৈরবানন্দ এরূপ কথা কত বলিয়াছেন, কিন্তু মাখনের কর্ণে তাহা স্থান পায় নাই। আজ দৈব ঘটনায় তাহা হইল।

মাখন কিয়ৎক্ষণ আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টি চাহিয়া কি ভাবিল। আবার পরক্ষণেই গৃহের দেওয়ালে বামহস্ত রাখিয়া, তাহার উপর মস্তক সংন্যস্ত করিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার মনের মধ্যে কি যে হইতে লাগিল, তাহা সে প্রকাশ করিয়া বলিতে জানে না। মাখন নির্ব্বাক্, কিন্তু অত্যন্ত অস্থির। সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া থাকিল।

কিয়ৎকাল পরে মাখনের কর্ণে দ্বার বন্ধ করিবার শব্দ প্রবেশ করিল। সে তৎক্ষণাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া সতর্কভাবে দাঁড়াইল। ক্ষণেক পরে দেখিল, ভৈরবানন্দ একাকী কোথায় যাইতেছেন। মাখন আত্মগোপনের জন্য সরিয়া দাঁড়াইল। অনন্তর ভৈরবানন্দ অনেক দূর চলিয়া গেলে, সে সতর্কিত ভাবে আত্মগুপ্ত হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। যাইবার সময় তাহার মনোরাজ্যে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইল। সে কখন ভাবিতে লাগিল, "গুরুদেব কা'কে বিয়ে করবেন? চন্দ্রকে কা'কে কালীর কাছে বলি দেবে?" আবার পরক্ষণে ভাবিল, "গুরুদেব কোথায় যাচ্চেন? কালী ঠাকুরাণী কোথায়? গুরুদেবের এ কি রকম কাজ?" এই সাত পাঁচ ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে সে দেখিল, ভৈরবানন্দ শ্মশান-ভূমির পার্শ্ব দিয়া একটা বনের ভিতর প্রবেশ করিলেন সেও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। মাখন সেই বনের ভিতর একাকী আরও কএক বার গিয়াছিল, কিন্তু আজিকার যাওয়ায় তাহার অন্তঃকরণে এক অভিনব ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে।

মাখন একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিল, ভৈরবানন্দ একস্থানে দাঁড়াইলেন। অমনি সেও একটা বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া দেখিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে দেখিল, গুরুদেব ভৈরবানন্দ কি করিতে করিতে সহসা অন্তর্হিত হইলেন। তদ্দর্শনে বালক মাখনের আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। সে কিয়ৎক্ষণ তথায় থাকিয়া আস্তে আস্তে সেই দিক অগ্রসর হইল। অন-

ন্তর ঠিক সেই স্থানে গিয়া দেখিল, ভূপৃষ্ঠে একটি চতুরস্র কপাটপট্ট ভিতর হইতে আবদ্ধ। মাখন অবাক্—শঙ্কিত—চিন্তিত—বিস্মিত। তাহার এক-গুণ কৌতূহল শতগুণ হইয়া উথলিয়া উঠিল। সে কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। অনন্তর তথায় আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই কপাটপট্টের অবিদূরে একটি চিহ্ন সংস্থাপন পূর্ব্বক দৌড়িয়া আসিয়া আপনার কুটীরে শয়ন করিল। শুইয়া, চিন্তার সহস্র মূর্ত্তির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু এরূপ ভাবে শুইয়া থাকিল যে, ভৈরবানন্দ আসিয়া তাহার মনোভাব বুঝিতে না পারেন।

ক্রমে ক্রমে পাঁচ ছয় দণ্ড সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। তখন ভৈর-বানন্দ ফিরিয়া আসিলেন। মাখন, আপন কুটীরে শয়নাবস্থায় দেখিল, গুরুদেবের হস্তে কতকগুলা বড় বড় চাবি। সে এই সকল চাবি পূর্ব্বেও গুরুগৃহের একটি নিভৃতস্থানে থাকিতে দেখিয়াছিল। এখন সে বুঝিল, তাহার গুরুঠাকুর এই চাবি গুলাতে সেই কপাটপট্ট-সংবদ্ধ তালাগুলা খুলিয়া মৃত্তিকার নিম্নপ্রদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তথায় সেই কপাট-পট্টের নিম্নে কি আছে, এবং কেনই বা ভৈরবানন্দ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া-ছিলেন, তাহা জানিবার জন্য এক্ষণে মাখনের অত্যন্ত কৌতূহল বৃদ্ধি হইল।

ত্রিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

মাখনের গুরুভক্তি।

ভৈরবানন্দ, মাখনকে নিদ্রিত অনুভব করিয়া আর ডাকিলেন না। আপনার গৃহে শয়ন করিলেন। কিন্তু পাঠক মহাশয়কে বলিয়া রাখা উচিত যে, তিনি প্রত্যহ রাত্রিকালে শয়ন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কি করেন। কারণবারি (সুরা) পান করেন। কালীর নামে উৎসর্গ করিয়া সুরাপান করা কাপালিকদিগের ধর্ম্মাঙ্গবিশেষ। এক্ষণে তিনি আশ মিটাইয়া এই ধর্ম্মাঙ্গ প্রতিপালন করিয়া শয়ন করিলেন। ক্রমে ক্রমে কারণবারি তাঁহার জাগরণ-শক্তি হ্রাস করিয়া দিল। তিনি গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

তিনি নিদ্রিত হইবার পর, আরও চারি পাঁচ দণ্ড পরিমিত সময় অতিবাহিত হইয়া গেল।

কারণবারির আয়োজন করিবার ভার মাখনের উপর অর্পিত হইয়াছিল। সেই প্রত্যহ উহা প্রস্তুত করিয়া রাখিত।

ঠিক এক সময়ে দুই জন লোক দুই অবস্থায় সময়ক্ষেপ করিতে লাগিল। ভৈরবানন্দ গভীর নিদ্রায় অভিভূত এবং মাখন অনন্ত চিন্তায় জাগরিত। এইরূপে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল।

মাখন খুব প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া, তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয়ের সহিত ভৈরবানন্দ গাত্রোত্থান করিলেন। প্রত্যহ তিনি যাহা যাহা করিয়া থাকেন, এক্ষণে একে একে তৎসমস্তই সম্পাদন করিলেন।

দিবা অবসান হইয়া আসিল। সূর্য্য অস্তাচলে আরোহণ করিয়া গা ঢাকা দিলেন। সন্ধ্যার সময় প্রকৃতির অবস্থা-পরিবর্ত্তন-সম্বন্ধিনী যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহাই ঘটিল। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়া রজনীর প্রথম প্রহর উপনীত হইল।

এমন সময় ভৈরবানন্দ মাখনকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি এইখানে থাকিয়া মুখস্থ মন্ত্রগুলির আবৃত্তি করিতে থাক। কোথাও যাইও না। আমি কিয়ৎকাল পরে আসিয়া, আবার তোমাকে নূতন মন্ত্র শিখাইব।"

মাখন স্বীকৃত হইল। ভৈরবানন্দ চাবি লইয়া পূর্ব্ববৎ কালীবাড়ী চলিয়া গেলেন।

মাখন চুপ করিয়া কিয়ৎক্ষণ বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল। কিন্তু বেশীক্ষণ আর বসিয়া থাকিল না। তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিয়া কোথায় চলিয়া গেল। আবার কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল। যাইবার সময় সে রিক্তহস্ত ছিল, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় তাহার হস্তে কি একপ্রকার দ্রব্য দেখা গেল। সে তাড়াতাড়ি করিয়া সেই দ্রব্য, একখানি শিলাপট্টে অর্দ্ধপেষণ করিয়া রস বাহির করিয়া লইল। সেই রস ভৈরবানন্দের নৈশ-পানীয় সুরাতে মিশাইয়া রাখিল। এই কার্য্য এইরূপভাবে সম্পাদন করিল যে, গুরুদেব আসিয়া তাহার কিছুই বুঝিতে না পারেন। ফলে তাহাই হইয়াছিল।

কতক্ষণ পরে ভৈরবানন্দ ফিরিয়া আসিলেন। মাখন তাঁহার পা ধুইবার জল আনিয়া দিল। ভৈরবানন্দ পদ ধৌত করিয়া আপনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। মাখনকে তাহার গৃহে শয়ন করিতে বলিলেন। মাখন শয়ন করিল, কিন্তু ঘুমাইল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভৈরবানন্দ কালীদেবীর নামে সুরা উৎসর্গ করিয়া পান করিলেন। পানব্যাপার সমাপ্ত হইলে পর, আপনার শয্যায় শয়ন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে অলক্ষ্যে নিদ্রা আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। সেই দ্রব্যরসমিশ্রিত সুরার কিরূপ ভয়ঙ্করী চৈতন্যবিলোপিনী শক্তি, তাহা ভৈরবানন্দে প্রকাশ পাইল। ভৈরবানন্দের নাসারন্ধ্রে নিশ্বাস সঞ্চার না থাকিলে, অদ্য তাহাকে মৃত বলিয়া ভ্রম হইত। তিনি যেরূপ ভাবে শয়ন করিয়াছিলেন সেইরূপ ভাবেই রহিলেন। একবারও পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলেন না।

মাখন, অনেক ক্ষণের পর গাত্রোত্থান করিয়া, আস্তে আস্তে ভৈরবানন্দের গৃহে প্রবেশ করিল। ভৈরবানন্দ গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন কি না, তাহা জানিবার জন্য সে কএক প্রকার কৌশল প্রকাশ করিল। অবশেষে দেখিল, তাহার কৌশল ও চেষ্টা সফল হইয়াছে। সে তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া, গুপ্ত স্থান হইতে চাবিগুলা লইয়া আপনার কুটিরে প্রবেশ করিল। আবার তথা হইতে একটি প্রদীপ, কিঞ্চিৎ অগ্নি, এবং কএকটা গন্ধক-কাষ্টিকা (দিয়াসালাই) লইয়া বরাবর সুড়ঙ্গের দ্বারে উপস্থিত হইল। কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না। অত রাত্রে দেখিবেই বা কে?

মাখন তথায় উপস্থিত হইয়া, চাবি দিয়া তালাগুলা খুলিয়া ফেলিল, কিন্তু ভিতরে গিয়া কপাটপট্ট পুনরায় রুদ্ধ করিল না। দিয়াসালাই জ্বালিয়া দীপ জ্বালিল। অন্ধকারময় সুড়ঙ্গগর্ভ আলোকিত হইল।

তখন সে ধীরে ধীরে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া, সমভূমিতে অবতীর্ণ হইল। সেখানে গিয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। তাহার চক্ষে সেই স্থান যেন একটি মধ্যম গোছের বাড়ী বলিয়া বোধ হইল। সে আস্তে আস্তে কিয়দ্দূর গিয়া মনুষ্যকণ্ঠের স্বর শুনিতে পাইল। সে স্বর কাতরোক্তি মিশ্রিত।

যে দিক হইতে সেই কণ্ঠশব্দ আসিতেছিল, মাথন সেই দিকে গমন করিয়া দেখিল, একটি অন্ধকার গৃহের মধ্যে কে বলিতেছে, "হা হিরণ্ময়ি! তুমি কেন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে আসিলে? কেন আমাকে সেরূপ পত্র লিখিয়াছিলে? আমি এত দিন তোমার অনুসন্ধান করিয়াও কৃতকার্য্য হইলাম না, এই আমার অত্যন্ত দুঃখ! তুমি জীবিত আছ কি না, তাহাও জানিতে পারিলাম না, ইহাও আমার দুঃখের উপর দুঃখ রহিয়া গেল! আমি আগামী কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যায় কালীর নিকট দস্যুহস্তে বিনষ্ট হইব, কিন্তু তুমি কোথায় রহিলে, তাহার অনুসন্ধান না পাইয়া মরিতে হইল, ইহা অপেক্ষা আমার আর কি এমন ভীষণ মনঃকষ্ট হইতে পারে? আমার আর পরিত্রাণের উপায় নাই। আমা হইতে তোমার অণুমাত্র উপকার হইল না, বরং গৃহ ও স্বজনত্যাগী হইয়া, না জানি, কোন্ অচিন্তনীয় সঙ্কটে পড়িয়া কত কষ্টই পাইতেছ! হা হতভাগ্য ধীরেন্দ্র! কেবল নিজে যাবজ্জীবন যন্ত্রণাভোগ করিতে এবং অপরকে বিপদ-গ্রস্ত করাইতে তোর উৎপত্তি হইয়াছে।" গৃহ নিস্তব্ধ হইল। গৃহদ্বার বহির্দ্দিকে তালাবদ্ধ।

মাথন বহির্ভাগে থাকিয়া সমস্তই শ্রবণ করিল। তখন তাহার মনে যে, কত কি উচ্ছলিত হইতে লাগিল, তাহা আমরা বর্ণন করিতে জানি না। সে একবার মাত্র মনে মনে বলিল, "এই লোকটিকেই চন্দুরে কালীর কাছে বলি দেবে! ওঃ, কি ভয়ানক ব্যাপার! আচ্ছা দেখি, আমি আজ কি ক'ত্তে পারি।" এই বলিয়া সে তথা হইতে বরাবর আরও ভিতর দিকে চলিয়া গেল।

হতভাগিনী হিরণ্ময়ী যে গৃহে অবরুদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, মাথন একেবারে সেইস্থানে উপস্থিত হইল।

চতুঃষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

মুক্তি।

মাখন দেখিল, হিরণ্ময়ীর গৃহদ্বার বহির্দ্দিকে তালাবদ্ধ রহিয়াছে। সে তখন বহির্ভাগ হইতে কপাটছিদ্র দিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, যেন একটি বিদ্যুন্মূর্ত্তি মেঘগর্ভে মিশাইয়া স্থিরভাবে রহিয়াছে। মাখনের অন্তঃকরণ দুঃখ ও বিস্ময়ে যুগপৎ অভিভূত হইল। তাহার মনে অত্যন্ত চিন্তার স্রোত অনন্ত বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে তখন মনে মনে কত কি ভাবিতে লাগিল, তাহার সীমা পরিসীমা নাই।

বালক মাখন কিয়ৎক্ষণ স্থিরদৃষ্টে, গৃহকদ্ধা সেই স্থির-সৌদামিনীর দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। এক্ষণে একখানি চিত্রপটের সহিত মাখনের তুলনা করা যাইতে পারে।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইলে পর, মাখনের কর্ণে প্রবেশ করিল, "হা হতভাগিনি হিরণ্ময়ি! তুই কি কুক্ষণেই গৃহত্যাগ করিয়াছিলি! মরিতে আসিলি, কিন্তু মরিতে পারিলি না। হা, ধীরেন্দ্রনাথ। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হইল না। পরেও আর হইবে না। এই কারাগার আর এই কারাস্বামী কাপালিকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে ত, তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না। দুরাচার আমাকে যে অবস্থায় রাখিয়াছে, তাহা স্মরণ-পথে সমুদিত হইলেই, আমার মরিবার বাসনা জাগিয়া উঠে, কিন্তু আমি মরিবার কোন উপায় দেখিতে পাই না। কারাগৃহে অবরুদ্ধ আছি; আমার নিকট মরিবার কিছুই নাই। হায়, আমার এ কি হইল! হা বিধাতা! তুমি কি আমার দিকে আর মুখ তুলিয়া চাহিবে না। এ হত-ভাগিনী কি এইরূপই অসহ্য যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইবে!" গৃহ নিস্তব্ধ হইল।

মাখন অবাক্। মনে মনে বিদ্যুদ্বেগে একবার ভাবিল, "কি আশ্চর্য্য ঘটনা! সেই যুবার জন্য এই যুবতী বিলাপ ক'চ্চে, আবার এর জন্য সে শোক ক'চ্চে; অথচ দু'জনে এক জায়গায় থেকেও, কেউ কারো

খবর পাচ্চে না। আর না, আমি সমস্তই বুঝেচি। এই দুজনকে আজ একত্তর করব। আর বিলম্ব করব না।"

মাখন আর কোন কথা না কহিয়া করস্থ চাবিগুচ্ছ হইতে একটা চাবি বাহির করিয়া হিরণ্ময়ীর দ্বার খুলিয়া ফেলিল। হিরণ্ময়ী, কাপালিক আসিয়াছে অনুমান করিয়া, একপার্শ্বে নীরবে দণ্ডায়মান হইলেন। মাখন ভিতরে প্রবেশ করিল।

হিরণ্ময়ী যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহার বিপরীত হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে একটি কিশোর বয়স্ক বালক। তিনি তাহাকে দেখিয়া কি যে বলিবেন, তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না।

মাখন বলিল, "হ্যাঁ গা, তুমি ধীরেন্দ্রনাথ ব'লে কাঁদ্‌ছিলে, ধীরেন্দ্রনাথ তোমার কে?"

হিরণ্ময়ী নিরুত্তর; কেবল মনে মনে বলিলেন, "এ যুবা কে? কি করিয়া এখানে আসিল? একে ত আমি একদিনও এখানে আসিতে দেখি নাই। এ আবার আমার মুখে ধীরেন্দ্রনাথের নাম শুনিয়াছে; তাই ত—কি করি? এ কি কাপালিকের চর?" এই ভাবিয়া তাঁহার ভয় হইল—মুখ শুকাইয়া গেল।

মাখন তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া, আশ্বাস প্রদান করিল। বলিল, "তোমার কোন ভয় নেই। তুমি উত্তর দিচ্চ না কেন?"

হিরণ্ময়ী এবার অস্ফুটবাক্যে বলিলেন, "তুমি কে?"

"আমি চণ্ডাল বালক।"

"এখানে কেন আসিয়াছ?"

"ভৈরবানন্দ কাপালিক এখানে এসে কি করে, তাই জান্‌তে।"

"সেই কাপালিকের নাম ভৈরবানন্দ?"

"তা কি তুমি এত দিন জান না?"

"এই কারাগারে একাকিনী আছি, কি করিয়া জানিব? সে আমাকে তাহার নাম বলে নাই। তবে সে যে কাপালিক, তা আমি তাহার আচার ব্যবহার, রীতি নীতি দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি।"

"তোমার নাম হিরণ্ময়ী?"

এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী আবার নিরুত্তর হইলেন।

মাখন বলিল, "তুমি নাই বল, কিন্তু আমি তোমারি মুখে শুনেচি। আরও বলি, তুমি যে ধীরেন্দ্রনাথের নাম ক'ল্লে, এই কতক্ষণ তাঁর মুখেও শুনে এলেম।"

এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী অত্যন্ত বিস্মিত এবং কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। চিন্তা যে পলকে কতরূপ রূপ ধরিতে পারে, এক্ষণে তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। সকলের সীমা আছে, কেবল শূন্যতার আর হিরণ্ময়ীর চিন্তার সীমা নাই।

মাখন বলিল, "উত্তর দিচ্ছ না কেন?"

"আমি কি উত্তর দিব, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। তোমার কথা শুনিয়া আমার আত্মবিভ্রম ঘটিয়াছে। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কি কোন মায়াবী?"

মাখন একবার হাসিল।

হিরণ্ময়ী লজ্জিত হইয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মাখন দেখিল, সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে, সুতরাং আর বেশী বিলম্ব করা উচিত নয়। কি জানি, ভৈরবানন্দ জাগিয়া উঠিলে, এখনি কি এক ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়া পড়িবে। এই জন্য সে আর বিলম্ব না করিয়া বলিল, "আমি তোমার নিকট কালী দেবীর শপথ ক'রে বল্‌চি, আমি তোমার শত্রু নই। ভৈরবানন্দ আমার গুরু, আমি তাঁ'র শিষ্য, কিন্তু আজ সে সম্বন্ধ ত্যাগ কল্লুম। তিনি যে এমন কুচরিত্রের লোক, তা আমি জান্তুম না। সে যে তোমাকেই বিয়ে করবার কথা আপনা আপনি যখন তখন ব'লে থা'কে আর এখানে তোমায় জ্বালাতন ক'ত্তে আসে, তা আমি এখন বুঝ্‌তে পাল্লুম; আরও বুঝ্‌তে পাল্লুম, সে তোমাকে এই অন্ধকার ঘরে আটক ক'রে রেখে —ওঃ কি ভয়ানক ব্যাপার!—সে কথা এখন থাক্। তুমি এখন এক কাজ কর, আমার সঙ্গে বরাবর চ'লে এস।"

হিরণ্ময়ী দ্বিরুক্তি করিলেন না। মাখন আলোক হস্তে অগ্রে অগ্রে চলিল, হিরণ্ময়ী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিন্তু তিনি এখনো সন্দেহ ও চিন্তায় জড়ীভূতা।

মাখন ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষের দ্বারদেশে আসিয়া, চাবি খুঁজিয়া লইয়া দ্বার খুলিল। হিরণ্ময়ী বহির্ভাগে রহিলেন। মাখন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ধীরেন্দ্রনাথ তাহাকে দেখিয়া প্রথমতঃ কোন দস্যু বলিয়া অনুমান করিলেন, কিন্তু শেষে বিশেষ করিয়া দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, "কই একে ত আমি সে দিন, সেই দস্যুদের মধ্যে দেখি নাই। এ যে একটি কিশোর বয়স্ক বালক। তাই ত, এ বালকটি কে? কেন আমার নিকট আসিল?" তিনি এইরূপ নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বালককে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না।

মাখন ধীরেন্দ্রনাথের কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়া বলিল, "আপনি শীঘ্র আমার সঙ্গে চ'লে আসুন।"

ধী।—"কোথায়?"

মা।—"সুড়ঙ্গের বাহিরে।"

ধী।—"কেন?"

মা।—"মুক্তিলাভের আশা নাই?"

ধী।—"আছে।"

মা।—"তবে আর বিলম্ব কেন?"

ধী।—"তুমি কে?"

মা।—"আমি চণ্ডাল বালক।"

ধী।—"আমার প্রতি তোমার এরূপ অপূর্ব্ব দয়ার উদ্রেক হইল কেন?"

মা।—"এর পর বল্‌ব। এখন বিলম্বে কাজের ক্ষতি হ'বে।"

ধীরেন্দ্রনাথ মাখনের এই সকল কথা শুনিয়া হর্ষে, বিস্ময়ে, চিন্তায় একেবারে উদ্বেলিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু আর কাল-বিলম্ব না করিয়া মাখনের সহিত যাইতে প্রস্তুত হইলেন। মাখন কৌশলে ধীরেন্দ্রনাথের হস্তপদের শৃঙ্খল মোচন করিয়া দিল। অনন্তর ধীরেন্দ্রনাথ মাখনের সহিত গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে আসিবামাত্রই তাঁহার দৃষ্টিপথে হিরণ্ময়ীর মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইল। তিনি তদ্দর্শনে একবার "আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?—বালক! তুমি কি ভোজবিদ্যা জান?" এই বলিয়া, আবার কি বলিতে উদ্যত হইলেন,

কিন্তু সেই সময়ে শীর্ণশরীরা চিন্তাকুলা হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের চরণমূলে পতিত হইয়া কেবল বলিলেন, "ধীরেন্! তুমিও এই অন্ধকার সুড়ঙ্গে বন্দী।" আর তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না—কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। নয়নযুগল হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রুবিন্দু ঝরিতে লাগিল।

ধীরেন্দ্রনাথ অবাক্। কিয়ৎকাল কাষ্ঠ-পুত্তলবৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অতীত ও বর্ত্তমান ঘটনা সমূহ তাঁহার স্মৃতিচক্ষে প্রতিফলিত হইয়া, তাঁহাকে যেন কি করিয়া ফেলিল। তিনি অনন্ত চিন্তায় অভিভূত হইয়া ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলেন। তাঁহার তৃষিত ও বিস্মিত নয়নযুগল হিরণ্ময়ীর দিকে স্থির হইয়া আছে, কিন্তু তাহা হইতে আপনা আপনি দরদরিত ধারে অশ্রু বহিয়া যাইতেছে।

পাঠক মহাশয়। এই অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব ঘটনা যে, কেমন করিয়া বর্ণন করিব এবং ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীর এই চারি চক্ষুর পুনঃসম্মিলনও যে, কেমন করিয়া আপনাকে বুঝাইয়া দিব, তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। আপনি আমাদের হইয়া কতক কতক নিজে ভাবিয়া লউন।

মাখন, ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীর এই অপূর্ব্ব মিলনে অত্যন্ত বিস্মিত এবং আপনাকে জীবনের একটি অতি প্রধান কার্য্যসাধক বলিয়া অতিশয় পুলকিত হইল। কিয়ৎকাল সেও নীরব হইয়া এই যুগল মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। আবার তৎক্ষণাৎ তাহার চৈতন্য হইল। কে যেন তাহাকে বলিল, "এখন এমন করিয়া দেখিবার বা থাকিবার সময় নয়। শীঘ্র তিন জনে এখান হইতে পলায়ন কর, নৈলে শত্রুহস্তে নিশ্চয় মরিতে হইবে।" এ কথা অন্য কেহ বলে নাই—মাখনের কর্ত্তব্যসাধক মন বলিল। তখন মাখন আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বলিল, "ওগো, তোমরা আর বিলম্ব ক'র না। কাপালিক ঘুমুচ্চে, জাগলেই বিভ্রাট ঘট্‌বে। সে আমাদের তিন জনকেই বিনাশ করবে।"

হিরণ্ময়ীকে ধীরেন্দ্রনাথের এবং ধীরেন্দ্রনাথকে হিরণ্ময়ীর বলিবার অনেক কথা রহিয়া গেল। তাঁহারা এখন বলিবার সময় পাইলেন না। কাজেই অগ্রে ত প্রাণ রক্ষা করা চাই।

ধীরেন্দ্রনাথ মাখনকে বলিলেন, "তোমার নাম কি?"

মা।—"মাখন।"

ধী।—"মাখন! তুমি আমাদের যে উপকার করিলে, তাহা এ জীবনে এক নিমেষের জন্যও ভুলিব না। আমরা তোমাকে ইষ্টদেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিলাম। তুমি আমাদের নিকট পূজনীয় দেবতা। তুমি আমাদের জীবনদাতা—মুক্তিদাতা—পরিত্রাতা। আমরা তোমাকে হৃদয়ের ভক্তির সহিত পূজা করিতেছি এবং চিরকাল করিব।"

মাখন বলিল, "আমি আমার কর্তব্য কাজ করলুম, তার জন্য আপনারা কেন আমাকে অমন কথা ব'লে লজ্জিত ক'চ্চেন? এখন চলুন—শীগ্‌গির চলুন।"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কাপালিক যদি দেখিতে পায়?"

মাখন হাসিয়া বলিল, "এখনও তার দেখ্‌তে পাওয়ার অনেক বিলম্ব আছে। আমি তাকে মদের সঙ্গে ধুতরোর অনেকটা রস খাইয়ে অচেতন ক'রে রেখে এসেচি।"

ধীরেন্দ্রনাথ এবং হিরণ্ময়ী এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত এবং আনন্দিত হইলেন। উভয়ে মাখনের অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অবিলম্বে তাঁহারা মাখনের সহিত সুড়ঙ্গ হইতে বহির্গত হইয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। সারারাত্রি অবিশ্রান্ত পথ চলিলেন; কিন্তু কোথায় যে গেলেন, তাহা বলিতে পারি না। মাখন যাইবার সময় সুড়ঙ্গের ভিতর হইতে ইচ্ছানুসারে কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা লইয়া আপনার নিকট রাখিয়াছিল এবং সুড়ঙ্গের কপাটপট্টে পূর্ব্ববৎ তালা লাগাইয়া নিজের হস্তে চাবি লইয়াছিল।

পাঠক মহাশয়! আসুন, আমরাও পরম হিতৈষী বালক মাখনকে মুক্ত কণ্ঠে শত সহস্র বার প্রশংসা করি। ঈশ্বর যেন সকলকেই মাখনের মত করিয়া সৃষ্টি করেন, এই আমাদের প্রার্থনা। মাখন! তুমি ধন্য! বিধাতা তোমাকে চিরজীবী করিয়া এইরূপে জগতের হিতসাধন করুন্। তোমার মঙ্গল হউক।

পঞ্চষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

অচিন্ত্য ঘটনা—অদ্ভুত ঘটনা।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে বোধ হয় যে, জগদীশপ্রসাদ হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধানে অকৃতকার্য্য হইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং হরিহর দেওয়ান মহাশয়ের পরামর্শানুসারে কাশীবাসের আশা কিছু কালের জন্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াছিলেন। যদি আপনার সে বিষয় স্মরণ না থাকে, তবে এই পুস্তকের চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ আর একবার অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠ করুন।

জগদীশপ্রসাদ কিছু দিন বাটীতে থাকিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার অন্তঃকরণে আবার হিরণ্ময়ী, কিরণময়ী এবং ধীরেন্দ্রনাথের অনুসন্ধানের ইচ্ছা জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই জন্য তিনি কতকগুলি অধীনস্থ লোক লইয়া তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিতে মধুপুর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অনেক দিন এখানে সেখানে করিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তার বলিতে গেলে পাঠক মহাশয়ের হয় ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিবে। সুতরাং সে বিষয়ে নিরস্ত হইলাম।

জগদীশপ্রসাদ এক এক স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া ক্রমেই হতাশ হইতে লাগিলেন। একে ধনবান্ ব্যক্তির শরীর, তাহাতে আবার গুরুতর পরিশ্রম এবং মনোভঙ্গ, সুতরাং তাঁহার শরীর অনেকটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। যথা সময়ে স্নানাহার না হওয়াতে এবং নানাস্থানের নানারূপ অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর দোষে তাঁহার উদরাময় পীড়া হইল। এই জন্য তিনি আবার বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য মনস্থ করিলেন। কিন্তু যে স্থানে তাঁহার এই পীড়া সমুপস্থিত হইল, সে স্থান মধুপুর হইতে অনেক দূর, সুতরাং শীঘ্র পঁহুছিবার সম্ভাবনা অল্প। এই কারণে তিনি প্রথমতঃ কোন একটি সুদক্ষ চিকিৎসকের বাটীতে থাকিয়া, তৎকর্ত্তৃক কতকটা আরোগ্য লাভ করিয়া, তাহার পর মধুপুরে যাওয়াই বিচার-সঙ্গত জ্ঞান করিলেন। তাঁহার সঙ্গিরাও সেইরূপ পরামর্শ দিল।

তিনি অনুসন্ধান করিয়া একজন ভাল চিকিৎসকের ঠিকানা জানিয়া লইলেন। সেই চিকিৎসকের নাম শূলপাণি কণ্ঠাভরণ,—জাতিতে বৈদ্য। ভ্রমরপুর নামক গ্রামে শূলপাণি বাস করিতেন। জগদীশপ্রসাদ তাঁহারই বাটীতে গমন করিলেন। এক্ষণে তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং পীড়ার প্রাবল্যও বেশী।

শূলপাণি একজন শাস্ত্রবিৎ, সুবিজ্ঞ চিকিৎসক, ভদ্র এবং সদালাপী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যৎকালে জগদীশপ্রসাদ তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হন, তৎকালে তিনি গ্রামান্তরে রোগী দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার ফিরিয়া আসিতে তিন চারি দিন বিলম্ব ঘটিয়াছিল; সুতরাং জগদীশপ্রসাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। কিন্তু তাঁহার উপযুক্ত ছাত্রেরা জগদীশপ্রসাদকে বিশেষ যত্নসহকারে বহির্বাটীতে আবাসস্থান দিয়া, উত্তমরূপে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। তিন দিবস উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং সুপথ্য ব্যবহার করিতে করিতেই জগদীশপ্রসাদের পীড়ার অনেক উপশম হইল। তিনি তদ্দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, কণ্ঠাভরণের ছাত্রদিগকে প্রচুর অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন।

চতুর্থ দিবসে শূলপাণি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জগদীশপ্রসাদের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইল। শূলপাণি জগদীশপ্রসাদের নাম শুনিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। এক একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইয়া গেল।

অনন্তর শূলপাণি বলিলেন, "মহাশয়! আপনার নিবাস কি মধুপুরে?"

জগ।—"আজ্ঞে। আপনি কি করিয়া জানিলেন?"

শূ।—"বলিতেছি। আচ্ছা, আপনার পত্নীর নাম কি জাহ্নবী?"

জ।—"আজ্ঞে।" এই কথা বলিয়া তিনি বিমর্ষচিত্তে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার চক্ষুযুগল ছল ছল করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিল।

তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া শূলপাণি বলিলেন, "মহাশয়! আপনি এমন হইলেন কেন?"

জগদীশ অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিলেন, "কবিরাজ মহাশয়! সে কথা আর আপনাকে কি বলির

শূ।—"তাঁহার কি কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে?"

এইবার জগদীশের নয়নযুগল আর অশ্রু আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারিল না। জগদীশ গভীর শোকব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "এই হতভাগ্য জগদীশ তাঁহাকে চিরকালের জন্য কালসমুদ্রের অতলগর্ভে হারাইয়াছে!"

শূ।—"তাহার কি পীড়া হইয়াছিল?"

জ।—"হৃদ্‌রোগ।"

শূ।—"কি কারণে?"

জ।—"কন্যা-শোকে।"

শূ।—"তখন আপনি কোথায় ছিলেন?"

জ।"বিদেশে।"

এইবার শূলপাণি অন্য কথা না বলিয়া বলিলেন, "ঠিক্ হইয়াছে।"

শূলপাণির এই কথা শুনিয়া জগদীশপ্রসাদ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার সঙ্গিরাও তাহাই হইল। সকলেই নানাচিন্তায় আকুল।

জগদীশ তথ্য জানিবার জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্যসহকারে তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "কবিরাজ মহাশয়! আপনি এমন কথা কেন বলিলেন?"

শূ।—"উভয়ের কথা এক হইয়াছে"

জগদীশ অধিকতর বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "উভয়ের কথা! আবার কে?"

শূ।—"আপনার সহধর্ম্মিণী।"

এই কথা শুনিবামাত্র জগদীশপ্রসাদের চিন্তাসমুদ্র মহাসমুদ্র হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকাল যেন কি হইয়া গেলেন। সেরূপ অবস্থা সচরাচর কাহারও ঘটে না। পরক্ষণেই তিনি বলিলেন, "কণ্ঠাভরণ মহাশয়! আমি আপনার কথার মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিলাম না। আপনার একরূপ কথা আমার পক্ষে নিতান্ত অসদৃশ অথচ অতিমাত্র বিস্ময়ের কারণ হইয়া দাড়াইল। আমার পত্নী মৃত অথচ আপনি বলিতেছেন, তিনিও বলিয়াছেন।"

শূল।—"মৃতা হইলে বলিতাম না। তিনি জীবিতা।"

এই কথা শুনিয়া সকলে ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। বিস্ময় অনন্তমূর্ত্তি ধারণ করিল।

পরক্ষণে জগদীশ বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য!—সে কি!—এ যে স্বপ্নাপেক্ষাও অলৌকিক!"

শূ।—"আমি যাহা বলিতেছি, তাহার অনুমাত্রও অলীক নহে। আপনার পত্নী আমার গৃহে অবস্থান করিতেছেন। আমি তাঁহাকে কনিষ্ঠা ভাগিনীর ন্যায় স্নেহ ও যত্নসহকারে রাখিয়াছি।"

জগদীশপ্রসাদের বিস্ময়বিমিশ্রিত আনন্দ অপার হইয়া দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন, "আপনি বলেন কি!"

শূ।—"এ কথা কি কেহই আপনাকে বলে নাই?" এই বলিয়া তিনি আবার বলিলেন, "তা বলিবেই বা কি করিয়া? আমার পত্নী ব্যতীত আর কেহ জানে না বটে। আমি ত আজিও কাহারও নিকট বলি নাই।"

জগদীশপ্রসাদ অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কণ্ঠাভরণ মহাশয়! আপনি সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত বলিয়া আমার ঔৎসুক্য নিবারণ করুন।"

তখন শূলপাণি কণ্ঠাভরণ ক্রমে ক্রমে অথচ সংক্ষেপে বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি একদিন ভাগীরথী নদী দিয়া নৌকারোহণে, টেঙরাকাঁটা হইতে বাটী আসিতেছিলাম। সে দিন অত্যন্ত বৃষ্টি হইতেছিল; কিন্তু ঝড় হয় নাই। সুতরাং নৌকা চলিবার কোন ব্যাঘাতও ঘটে নাই। দাঁড়ী মাঝী ব্যতীত আরোহীর মধ্যে আমি একাকী ছিলাম। তার পর শুনুন,—নৌকা ত আসিতে থাক্। এমন সময়ে একটা শ্মশানের একপার্শ্বে দেখিলাম, একটা খাটের উপর বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া কি যেন নড়িতেছে। আমার নৌকা তীর-সন্নিহিত হইয়া আসিতেছিল বলিয়া, আমি উহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছিলাম। তার পর শুনুন,—আমি নৌকাবাহীদিগকে তৎক্ষণাৎ নৌকাগতি সংরোধ করিয়া, তাহা কি জানিতে বলিলাম। তাহারা ভয়ে যাইতে স্বীকার করিল না। সুতরাং আমিই তীরে অবতীর্ণ হইয়া খাটখানার নিকট উপস্থিত হইলাম। চারি দিকে চাহিয়া দেখিলাম, একটিও জনমানুষ নাই, কেবল সেই খাটখানা পড়িয়া আছে এবং তাহার মধ্যে কি নড়িতেছে। আমরা চিকিৎসক, সুতরাং আমার সে বিষয় জানিবার জন্য ইচ্ছা হইল। আমি তৎক্ষণাৎ আচ্ছা-

দিত বৃষ্টিসিক্ত বস্ত্র তুলিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম, একটি মুমূর্ষু স্ত্রীলোক নড়িতেছে। আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া দাঁড়ীমাঝীদিগকে নিকটে ডাকিলাম। কিন্তু তাহারা তখনো ভয়ে আসিতে চাহিল না। আমি তাহাদিগকে অনেক ভরসা ও আশ্বাস, এমন কি, অর্থ পর্য্যন্ত দিলাম। শেষে তাহারা আসিল। তখন সকলে মিলিয়া আস্তে আস্তে খাটশুদ্ধ সেই স্ত্রীলোকটিকে আমার নৌকায় উঠাইয়া লইলাম। তার পর খাটখানা ফেলিয়া দিয়া, তাহাকে নৌকার ছৎরীর ভিতর, বসনশয্যা পাতিয়া শুয়াইয়া রাখিলাম। আমার নিকট ঔষধ ছিল। আমি তাহার তাৎকালিক অবস্থা পরীক্ষা করিয়া একপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিলাম। আবার কিয়ৎক্ষণ পরে আর একপ্রকার ঔষধ দিলাম। ঈশ্বরেচ্ছায় ক্রমে ক্রমে সেই স্ত্রীলোকটি তখন অনেকটা সুস্থ হইল। নৌকায় আমরা আরও পাঁচ ছয় দিন ছিলাম। আমি বরাবর মনোযোগ পূর্ব্বক তাহার চিকিৎসা করিয়াছিলাম। অনন্তর বাটী আসিয়াও আজি পর্য্যন্ত চিকিৎসার বিরাম হয় নাই। তবে বিশেষ সুবিধা বলিতে হইবে যে, এখন সেই স্ত্রীলোক সম্পূর্ণরূপে সুস্থা, কেবল কতকটা দৌর্ব্বল্য আছে। তাহাও শীঘ্র সারিয়া যাইবে। আমি বাটীতে আসিয়া এক দিন পরিচয় লইয়া জানিলাম, তিনিই আপনার পত্নী। আমার ইচ্ছা ছিল, তাঁহার দৌর্ব্বল্য সারিয়া গেলে, আমি স্বয়ং তাঁহাকে লইয়া আপনার নিকট যাইব, কিন্তু আপনিই যেকালে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, সে কালে আমি যে, কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, তাহা বর্ণনাতীত।"

জগদীশপ্রসাদ নিবিষ্টচিত্তে কণ্ঠাভরণের মুখে এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ যে অচিন্ত্য ঘটনা!—অদ্ভুত ঘটনা।

পাঠক মহাশয়! আপনিও কি বিস্মিত হন নাই? বোধ হয়, হইয়াছেন। যাই হউক, একবার শূলপাণি কণ্ঠাভরণের বহির্বাটীর দিকে দৃষ্টিপাত করুন,—দেখুন,—এখানে বিস্ময় মূর্ত্তিমান কি না।

জগদীশপ্রসাদের সঙ্গে যতগুলি লোক আসিয়াছিল, তন্মধ্যে দুই জনকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, "গুরুদয়াল! চিন্তামণি! তোমরা সে দিন জাহ্নবীদেবীকে ভাগ্যে চিতাদগ্ধ কর নাই, তাই আজ আমি হৃতরত্ন পুনর্ব্বার

পাইলাম। আমি তোমাদিগকে এবং আর যাহারা তোমাদের সঙ্গে ছিল, তাহাদিগকে গৃহে গিয়া আশাতীত সন্তুষ্ট করিব। আচ্ছা, এখন আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, কবিরাজ মহাশয়ের মুখে যাহা শুনিলাম, তাহার পূর্ব্বে কি হইয়াছিল, তাহা তোমরা ব্যতীত আর কেহই জানে না, সুতরাং আনুপূর্ব্বিক বল দেখি।"

তাহারা ভয়ে ও ভাবনায় কথা কহিতে পারিল না।

তদ্দর্শনে জগদীশ বলিলেন, "ভয় কি? তোমরা আমার অহিত কর নাই—বরং যার পর নাই হিতই করিয়াছ।"

তখন গুরুদয়াল বলিতে আরম্ভ করিল;—"কর্ত্রীঠাকুরাণী হৃদ্রোগে এরূপ মূর্চ্ছিত ও অসাড় হইয়াছিলেন যে, আমাদের সকলেরই মনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হইল। আমরা দেওয়ানজী মহাশয়ের পরামর্শানুসারে তাঁহাকে দাহ করিতে শ্মশানে লইয়া গেলাম। যাইতে যাইতে পথে মেঘ উঠিল। যখন আমরা শ্মশানের সন্নিকট হইলাম, তখন মুষলধারে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। কাজেই আমরা খাট সমেত তাঁহাকে শ্মশানের ধারে রাখিয়া কিঞ্চিদ্দূরে একটা পুরাতন বটবৃক্ষের তলে গিয়া আশ্রয় লইলাম। আমরাও সকলে ভিজিয়া গেলাম। যাই হোক, তথাপি বৃষ্টি নিবারণের অপেক্ষায় সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলাম। এইরূপে দুই ঘণ্টাকাল অতীত হইল; তবুও বৃষ্টিপাতের আর বিরাম হইল না। এমন সময়ে আমরা হঠাৎ সেই স্থান হইতে দেখিলাম, খাটের উপর কর্ত্রীঠাকুরাণীর দেহ নড়িতেছে। আমরা তাহা দেখিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলায়ন করিলাম। আমাদের ভয় হইল, তিনি দানা পাইয়াছেন, এখনি আমাদের প্রাণ সংহার করিবেন। প্রাণের ভয়ে এই কার্য্য করিয়াছিলাম। বাড়ী গিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাঁহার দাহ-কার্য্য সমাধা করিয়া আসিলাম। কিন্তু, কে জানিত যে, তিনি জীবিত হইবেন। আজ আপনার নিকট আমাদের বড় ভয়, বিস্ময় ও লজ্জা হইয়াছে।"

জগদীশ বলিলেন, "কোন ভয় নাই। তোমরা আমার আশাতীত উপকার করিয়াছ। তজ্জন্য আমি তোমাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শূলপাণি জগদীশপ্রসাদকে বলিলেন, "দেখুন, মহাশয়! সে দিন সেরূপ মহাবৃষ্টি না হইলে আপনার সহধর্ম্মিণীকে জীবন থাকিতে দগ্ধীভূত হইতে হইত। সেই বৃষ্টিতেই তাঁহার চৈতন্য লাভ হইয়াছিল।"

তখন জগদীশপ্রসাদ অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "কবিরাজ মহাশয়! আপনি যে, আমার কি পর্য্যন্ত উপকার করিয়াছেন, তাহা আমি যাবজ্জীবন অনর্গল বলিয়াও শেষ করিতে পারিব না। আপনি আমার পক্ষে দ্বিতীয় বিধাতা, আর অধিক কি বলিব? আমি সস্ত্রীক আপনার নিকট চিরজীবনের জন্য কৃতজ্ঞ হইয়া রহিলাম।"

অনন্তর শূলপাণি কণ্ঠাভরণ জগদীশপ্রসাদকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যে গৃহে জাহ্নবী দেবী অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহারা উভয়ে সেই গৃহে গমন করিলেন।

তখন জাহ্নবী দেবী শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে কণ্ঠাভরণ মহাশয়কে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার পশ্চাতে দেখিলেন, তাঁহার স্বামী জগদীশপ্রসাদ। তখন তাঁহার আনন্দ স্তরে স্তরে উছলিয়া উঠিল। যাহা হইবার অণুমাত্রও আশা ছিল না, জগদীশপ্রসাদের তাহাই হইল।

অনন্তর পতিপত্নীতে পুনঃপুনঃ সন্দর্শন ও নানাবিধ কথা বার্ত্তা হইল। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে যিনি যত জানেন, পরস্পরে তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন। পাঠক মহাশয়! এ বিষয়ে আর আমরা আপনাকে কত ব্যাখ্যা করিয়া বলিব?

অনন্তর জগদীশপ্রসাদ কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনের অন্যতর নিদর্শন স্বরূপ শূলপাণি কণ্ঠাভরণকে এক লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিবার অঙ্গীকার করিলেন। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, কণ্ঠাভরণ মহাশয় ইহাতে আশাতীত আনন্দিত হইলেন।

এই অচিন্ত্য ও অদ্ভুত ঘটনার পর আরও এক সপ্তাহ কাল জগদীশপ্রসাদ উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করিয়া, পরে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া স্বীয় পত্নী ও অধীনস্থ লোকদিগের সহিত মধুপুরে যাইবার জন্য প্রস্থান করিলেন। মধুপুরে যাইবার কারণ এই যে, তিনি তথায় জাহ্নবী দেবীকে

অগ্রে রাখিয়া আসিয়া, পক্ষে পুনর্ব্বার হিরণ্ময়ী, কিরণময়ী ও ধীরেন্দ্রনাথের অনুসন্ধান করিবেন। তিনি সে অবস্থায় জাহ্নবীকে লইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। বাস্তবিক তাও বটে।

পাঠক মহাশয়কে এখানে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, জগদীশপ্রসাদ জাহ্নবী দেবীকে হিরণ্ময়ী ও কিরণময়ীর অপ্রাপ্তি-সংবাদ বলাতে, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি কন্যা দুইটির পুন প্রাপ্তিজন্য, অন্তরের সহিত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

কাপাসডাঙ্গার সরাই।

জগদীশপ্রসাদ, শূলপাণি কণ্ঠাভরণের বাটী হইতে যাত্রা করিয়া, এক এক দিন এক এক স্থানে বিশ্রাম করত মধুপুরের দিকে যাইতে লাগিলেন। সে বৎসর অত্যন্ত বর্ষা হওয়াতে, তাঁহাকে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হইল। যে সকল মেটে পথ দিয়া অন্য সময়ে গাড়ী যাওয়া আসা করিতে পারে, বর্ষাকালে তাহা পারে না, সুতরাং পাকা রাস্তা দিয়া, তাঁহাকে যাইতে হইল। এই জন্য বিলম্বও হইতে লাগিল।

জগদীশপ্রসাদ প্রাতে এবং অপরাহ্ণে পথ চলিতেন, এবং মধ্যাহ্ন ও রাত্রিকালে বিশ্রাম করিতেন। এরূপ করিয়া না গেলে দুর্ব্বলা জাহ্নবীকে লইয়া তাঁহার পথ চলা অত্যন্ত দুর্ঘট হইয়া উঠে। ইহাও তাঁহার বিলম্বের অন্যতর কারণ হইয়া উঠিল।

বেলা সার্দ্ধেক প্রহর হইয়াছে, এমন সময়ে তাঁহারা সকলে কাপাসডাঙ্গার সরাইয়ে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কএকখানি দোকান আছে। যাত্রিরা সুবিধামত সেই সকল দোকানে পাকসাকাদি করিয়া আহার করিয়া থাকে। কেহ কেহ রাত্রিযাপনও করে। জগদীশপ্রসাদ তন্মধ্য হইতে একখানি দোকান

নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন। দোকানদার এক জন পাচক ব্রাহ্মণ এবং এক জন দাসী যোগাড় করিয়া দিল। অনন্তর সকলের স্নানাহার চুকিয়া গেল।

আহারান্তে জগদীশপ্রসাদ শয়ান্ হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এক জন ভৃত্য তাঁহার গা হাত পা টিপিয়া দিতে লাগিল। এমন সময়ে পাচক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, কিঞ্চিদ্দূরস্থিত একখানা খেজুর চাটাইয়ের উপর উপবেশন করিয়া তাঁহাকে বলিল, "মহাশয়! আপনার নিকট আমার একটি নিবেদন আছে।"

জ।—"কি বল।"

পা।—"আমি শুনিলাম, আপনি এক জন বিশেষ ঐশ্বর্য্যশালী জমীদার এবং অনেকের প্রতিপালক। আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটি কার্য্যে নিযুক্ত করিলে আমি যার পর নাই উপকৃত হইব। আমি এক্ষণে আপনাকে আমার প্রতিপালক বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহ। আমি জমীদারী সেরেস্তার কার্য্য কর্ম্ম জানি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোথাও ঘটিয়া উঠে নাই। কি করি, উদরচিন্তায় বাধ্য হইয়া আমাকে এই উঞ্ছবৃত্তি করিতে হইতেছে।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আরও অনেক দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল।

জগদীশের দয়া হইল। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আমি তোমাকে তোমার উপযুক্ত একটি কার্য্য দিব। তুমি আমার সঙ্গে চল।"

পাচক ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, জগদীশের অনেক প্রশংসা করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে জগদীশ একটু নিদ্রিত হইলেন। তিনি প্রত্যহই আহারান্তে এইরূপে নিদ্রা যান।

তখন পাচক ব্রাহ্মণ আপনার আহারের যোগাড় করিতে গেল। তাহার বাসা সরাই হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে। সে যাইবার সময় জানিয়া গেল যে, অদ্য জগদীশপ্রসাদ এই সরাইয়েই থাকিবেন। এক্ষণে বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর।

এমন সময়ে এক জন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "হরিহর দেওয়ানজী মশায় আমাদের দোকানের পাঁচ খানা দোকানের পরের দোকানে এসেছেন; আমি এই কতক্ষণ তাঁকে দেখে আস্‌চি। তাঁ'র সঙ্গে ভবানীসহায়, মাণিক

চাঁদ, চরণ আর দুজন অচেনা লোক এসেছে।" সে আহ্লাদে এই সংবাদ এত উচ্চৈঃস্বরে বলিল যে, তাহাতে জগদীশপ্রসাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি তাহার মুখে পুনর্ব্বার সেই কথাগুলি শুনিলেন এবং তৎক্ষণাৎ হরিহরকে, তাঁহার নিকট আনিবার জন্য তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। হরিহর দেওয়ান এখনও তথায় তাঁহার প্রভুর উপস্থিতির বিষয় জানিতে পারেন নাই।

ভৃত্য গিয়া হরিহরকে কর্ত্তা মহাশয়ের সংবাদ দিল। হরিহর তৎক্ষণাৎ জগদীশের নিকট আসিলেন—প্রণাম করিলেন—কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসিলেন। পরক্ষণেই হরিহর দৃষ্টি পরিবর্ত্তন করিয়াই অবাক্। কেন?—পার্শ্বের কুঠরীতে জাহ্নবীদেবী নিদ্রিতা। তাঁহার মনে 'হাঁ—না' এইরূপ কতরূপ চিন্তা বিদ্যুদ্বেগে সংস্পৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি জাহ্নবীদেবীর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জগদীশকে বলিলেন, "মহাশয়!—" আর কিছু না বলিয়া পূর্ব্ববৎ চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষুর্যুগল বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া রহিল।

জগদীশ, হরিহরের চক্ষুর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াই, তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "কি দেখিতেছ, হরিহর! মরা মানুষ বাঁচিয়াছে। দেখ দেখি, উনি জাহ্নবী কি না।"

হরিহর বিস্ময়ে, লজ্জায় এবং ভয়ে কেমন এক প্রকার হইয়া গেলেন। অধোমুখে কি ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার কৌতূহল, সীমা ছাড়াইয়া প্রবল বেগে উচ্ছ্বলিত হইয়া পড়িল।

তখন জগদীশ, হরিহরকে এক এক করিয়া জাহ্নবী-সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা বলিলেন। হরিহর অবাক্!

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কাটিয়া গেল।

অনন্তর জাহ্নবী গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, স্বামীর নিকট হরিহর বসিয়া আছেন। তিনি হরিহরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিহর! তুমি কেমন আছ?"

হরিহর লজ্জায় উত্তর দিতে পারিলেন না। অধোমুখে বসিয়া রহিলেন।

জাহ্নবী তদ্দর্শনে বলিলেন, "যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে, তজ্জন্য তুমি দোষী নও। তবে কেন তুমি অত ভীত এবং লজ্জিত হইতেছ?"

হরিহর কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "মা! ওর নাম কি, আমায় ক্ষমা করুন।"

জগদীশ হাসিতে লাগিলেন। অনন্তর হরিহরকে বলিলেন, "হরিহর ঐ সব কথা এখন থাক্। তুমি কি জন্য এখানে আসিয়াছ?"

এই কথা শুনিয়া হরিহরের যেন চমক হইল। তিনি বলিলেন, "মহাশয়! আপনার নিকট, ওর নাম কি, আমি যেমন আশাতীত আনন্দ লাভ করিলাম, সেইরূপ আপনিও, ওর নাম কি, আমার নিকট একটি সুসংবাদ শুনিয়া পুলকিত হইবেন।"

জগদীশের কৌতূহল বৃদ্ধি হইল। তিনি আগ্রহের সহিত বলিলেন, কি সংবাদ?"

হরিহর বলিলেন, "ধীরেন্দ্রনাথ এবং আপনার কনিষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা এক্ষণে, ওর নাম কি, নীলকণ্ঠপুরে আছেন। ধীরেন্দ্রনাথ দুইজন লোক মারফৎ আপনার নামে এক পত্র পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু আপনি না থাকাতে, আমিই আপনার আদেশ মতে, ওর নাম কি, সেই পত্র খুলিয়া পাঠ করি। সে পত্র এখনও আমার সঙ্গে আছে,—এই দেখুন।" এই বলিয়া জগদীশের হস্তে পত্র প্রদান করিলেন।

জগদীশপ্রসাদ এবং জাহ্নবীদেবী পত্রখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

এমন সময়ে হরিহর দেওয়ান আবার বলিলেন, "মহাশয়! আমি চারিজন লোক এবং, ওর নাম কি, সেই দুই জন পত্রবাহককে লইয়া নীলকণ্ঠপুর যাইতেছি। শুভসংবাদ পাইয়া, ওর নাম কি, কি করিয়া বিলম্ব করিতে পারি?"

জগদীশপ্রসাদ এবং জাহ্নবী দেবীর হর্ষের সীমা পরিসীমা রহিল না। জগদীশপ্রসাদ আনন্দমিশ্রিত স্বরে বলিলেন, "এবার আমি সুনিশ্চয় মহেন্দ্র-ক্ষণে পা বাড়াইয়াছিলাম। বিধাতা এইবার আমার প্রতি সদয় হইয়াছেন। তবুও এখনো আর একটী দুঃখ রহিয়া গেল। যাই হউক, সে বিষয়েও সেই দয়াময় ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম।"

অনন্তর সকলে আর তথায় কালবিলম্ব না করিয়া, 'জয় দুর্গা' বলিয়া নীলকণ্ঠপুর যাত্রা করিলেন। সেই পাচক ব্রাহ্মণকে, জগদীশপ্রসাদ সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার অপেক্ষা করিলেন না। ব্রাহ্মণের দুর্ভাগ্য, নহিলে সে

এমন সময় অনুপস্থিত থাকিবে কেন? তা যাই হৌক, তিনি দোকানদারকে বলিয়া গেলেন, আমি এখন নীলকণ্ঠপুর চলিলাম। তথা হইতে প্রত্যাগমনের সময় সেই ব্রাহ্মণকে লইয়া যাইব। তুমি এ কথা তাহাকে বলিও।”

দোকানদার সম্মত হইল এবং তাঁহার নিকট হইতে আপনার পাওনা গণ্ডা চুকাইয়া লইল।

সপ্তষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

শূন্য সুড়ঙ্গ।

পাঠক মহাশয়কে ভৈরবানন্দ কাপালিকের কথা অনেকক্ষণ হইতে বলিতে অবকাশ পাই নাই। এইবার পাইয়াছি;—স্থির হইয়া শুনুন।—

ভৈরবানন্দ প্রত্যহ প্রায় সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে গাত্রোত্থান করিয়া থাকেন, ইহা একবার আপনাকে বলা হইয়াছে। কিন্তু হিরণ্ময়ী ও ধীরেন্দ্রনাথকে লইয়া মাখনের পলায়ন করিবার দিবস, প্রায় বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, তাঁহার শরীর যেন তখনও ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে—আবার শয়ন করিবার ইচ্ছা হইতেছে—মস্তক ঘুরিতেছে—চক্ষুর্যুগল চাপিয়া যাইতেছে। তিনি নিজের অবস্থা এরূপ হইবার কারণ বুঝিতে না পারিয়া, ভাবিলেন, “এ আমার কি হইল? এ কি পীড়া?” কিন্তু কি করেন, আস্তে আস্তে দাঁড়াইলেন। পা টলিতে লাগিল। ভৈরবানন্দের মূর্ত্তি আজ নূতনতর।

তিনি গাত্রোত্থান করিয়া মাখনকে একবার ধীরোচ্চস্বরে ডাকিলেন, কিন্তু সাড়া পাইলেন না—আবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, তবুও উত্তর আসিল না। কাজেই কিঞ্চিৎ বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন।

অনন্তর আস্তে আস্তে গৃহের বাহিরে আসিলেন। একবার পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেলেন। ক্রোধ ও বিরক্তি বৃদ্ধি হইল। বাহিরে আসিয়া, মাখনের কুটীরে গেলেন। দেখিলেন, কুটীর শূন্য পড়িয়া আছে। বিরক্ত

হইয়া বলিলেন, "দেখ দেখি, ছোঁড়া গেল কোথা। এত বেলা হইল, তবু আমাকে জাগায় নাই ; আবার নিজেও ঘরে নাই। আসুক্, আজ তাকে বিশেষরূপে শাসন করিব। কেন সে এমন অন্যায় কার্য্য করিল ?"

অনন্তর তিনি ধীরে ধীরে গমন করিয়া, অজয় নদের জলে অনেকক্ষণ ধরিয়া অবগাহন করিলেন। এরূপ করাতে তাঁহার শরীর অনেক সুস্থ বোধ হইল। আবার তিনি মঠে ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন, তখনও মাখন অনুপস্থিত বলা বাহুল্য যে, তিনি মাখনের উপর উত্তরোত্তর ক্রুদ্ধ হইতে লাগিলেন।

এটি সেটি করিতে করিতে, চাবি রক্ষার স্থানে হটাৎ তাঁহার চক্ষু পড়িল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন। অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "এ কি, চাবি কি হইল ? মাখন বুঝি চাবি লইয়া সুড়ঙ্গ গিয়াছে ? তাই সে এখানে এখনও আসিতেছে না ? কেন সে চাবি লইল ? তার মনস্থ কি ? তাহাকে ত আমি চাবির কথা এক দিও বলি নাই। আর ত কেহই আমার চাবির সন্ধান জানে না। সেইই সর্ব্বদা এখানে থাকে, সুতরাং আমার অলক্ষ্যে কখন ইহার সন্ধান জানিতে পারিয়াছে, বোধ হয়। যাই হউক, দেখিতে হইল।" এই বলিয়া তিনি বিশেষরূপে আপনার গৃহ এবং মাখনের কুটীর অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু চাবি মিলিল না।

তখন তিনি ক্রোধে অগ্নিবৎ হইয়া উঠিলেন। আর সেখানে কালবিলম্ব না করিয়া, বরাবর সুড়ঙ্গের দিকে চলিলেন। আজ তাঁহার পূজার সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। আর পূজা !

অনন্তর তিনি গন্তব্য স্থানে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সুড়ঙ্গের কপাটপট্ট বহির্দ্দিকে তালাবদ্ধ। তদ্দর্শনে তিনি অস্থির হইলেন। ভাবিলেন, এ কি ! সুড়ঙ্গ-কপাট ত বাহিরেই বদ্ধ রহিয়াছে।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই তালাগুলা টানিয়া দেখিতে লাগিলেন। একটিও খুলিল না। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া সেগুলি ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু একটিও ভাঙ্গিতে পারিলেন না। তিনি তালা ভাঙ্গিবার সুকৌশল জানিতেন না। মহাবিপদ উপস্থিত। কি যে করিবেন, ভাবিয়া অস্থির হইলেন। আবার তাড়াতাড়ি মঠের দিকে ফিরিলেন। ইচ্ছা যদি এইবার

মাখন আসিয়া থাকে, ত চাবির সন্ধান হইতে পারে। তাহা না হইলেও তালা ভাঙ্গিবার অন্য কোনরূপ দ্রব্যও মিলিতে পারে। তিনি অতি দ্রুতপদে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আসিবামাত্রই আবার বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! বীরচাঁদ মঠের বাহিরে একাকী বসিয়া আছে। ভৈরবানন্দ অস্থৈর্য্যনিবন্ধন তাহাকে ভাল করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে অবসর পাইলেন না।

বীরচাঁদ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "আপুনি কেমন আছ?"

ভৈ।—"বীরচাঁদ! তুমি আমার সঙ্গে একবার আইস দেখি।"

বী।—"আজ্ঞে, আজ আপুনি এত ব্যস্ত আর চিন্তিৎ কেন?"

ভৈ।—"আমার সঙ্গে গেলেই, তার কারণ জানিতে পারিবে। তুমি ভাল আছ ত?"

বী।—"আজ্ঞে, কায়িক ভাল বটে, কিন্তু আন্ত্রিক বড় কষ্ট।"

ভৈ।—"কেন, কি হইয়াছে?"

বী—"আপুনি আবার এ কথা ব'ল্লেন।"

এই কথায় ভৈরবানন্দের মনোমধ্যে দারুণ আঘাত লাগিল। তাঁহার স্মৃতিপথে তড়িদ্বেগে সমস্ত ঘটনা একবার প্রতিভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি লজ্জিত হইলেন, কিন্তু এ দিকের বিভ্রাট দেখিয়া তাঁহার লজ্জা অনেক-ক্ষণ থাকিতে পারিল না। তখন তিনি বলিলেন, "বীরচাঁদ! তোমাকে আজ একটি কার্য্য করিতে হইবে।"

বী।—"কি কাজ, বলুন।"

ভৈরবানন্দ কি বলিবেন, একবার ভাবিয়া লইয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে কালীসুড়ঙ্গে যাইতে হইবে।"

এই কথা শুনিয়া বীরচাঁদ মনে ভাবিল, "গুরঠাকুর এইবার বুঝতে পেরেচেন, তাই আমাকে কালীসুড়ঙ্গে যেতে বল্‌চেন। আমার ধর্ম্মমেয়ে কি সেখানে আছে? হ'তেও পারে, কেন না, সে বড় লুকানো জায়গা। কিন্তু, আমি আগে একদিনও এ কথা ভাবিনি। ভাব্বই বা কি ক'রে? কে জানে যে, ঠাকুরবাড়ীর ভিতর আমার গুরুঠাকুর মানুষ লুকিয়ে রাখ্‌বে? ধর্ম্মের ঘর, সেখানে কি এমন অন্যাই কাজ হ'তে পারে? মানুষচুরি যে মহা-

পাপ। যাই হৌক, একবার এনার সঙ্গে যেতে হ'ল।" এই ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, চলুন।"

অনন্তর বীরচাঁদকে লইয়া ভৈরবানন্দ পুনর্ব্বার সুড়ঙ্গের দিকে প্রস্থান করিলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তখনও সুড়ঙ্গ পূর্ব্ববৎ তালাবদ্ধ। তখন তিনি বীরচাঁদকে বলিলেন, "বীরচাঁদ! তোমাকে এই তালাগুলা ভাঙ্গিতে হইবে। আমি পারি নাই।"

পাঠক মহাশয় হয় ত এবার বলিতে পারেন যে, যে ভৈরবানন্দ বীরচাঁদের ভয়ে হিরণ্ময়ীকে এরূপ ধর্ম্মগৃহে গোপনে রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে কি করিয়া তাহাকেই তালা ভাঙ্গিতে বলিলেন? এ কথার উত্তর এই,—এক্ষণে ভৈরবানন্দ হতাশ। তাঁহার মনোভঙ্গ হইয়াছে। এখন তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এইরূপ বলিতেছেন।

বীরচাঁদ গুরুঠাকুরের এই কথা শুনিয়া কহিল, "আপুনি চাবিগুলো কি ক'রেচ?"

ভৈ।—"আমি কিছু করি নাই। কে সেগুলা লইয়া কি করিয়াছে। আমি অনেক অন্বেষণ করিয়া পাইতেছি না। এই জন্য তোমাকে তালা ভাঙ্গিতে বলিতেছি।"

বী।—"এখানে ত আপনকার এমন কোন বিশেষ দরকার নেই, তবে মিছি মিছি কেন তালাগুলো ভাঙ্‌বে? আর দু' এক দিন ভাল ক'রে চাবিগুলোর খোঁজ ক'রে, তার পর ভাঙ্‌লে ভাল হয় না?" বীরচাঁদ নিজের সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য এই কথা বলিল।

ভৈরবানন্দ এ কথার উত্তর না দিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।

বী।—"ঠাকুর! চুপ ক'রে রইলেন যে?"

ভৈরবানন্দ কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া আর কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না। অগত্যা বলিয়া ফেলিলেন, "তালা না ভাঙ্গিলে তোমার ধর্ম্মদুহিতা অনাহারে মারা যাইবে।"

এই কথা শুনিবামাত্র বীরচাঁদ মনে মনে বলিল, "যা ভেবেচি, তাই। ওঃ, কি ভয়ানক ব্যাপার!" প্রকাশ্যে বলিল, "ঠাকুর! আপুনি আমার ধর্ম্মমেয়েকে এখানে রেখেচ? তা আমি জান্তুম

না। আমি মনে করেছিলুম, তাকে তার বাপ মার কাছে পাঠিয়ে দিয়েচ।"

এইবার ভৈরবানন্দ বলিবার পথ পাইলেন,। বলিলেন "তুমি এখানে নাই, তবে কাহার সঙ্গে তাহাকে পাঠাইব?"

বীরচাঁদ আর বিলম্ব করিল না। তৎক্ষণাৎ বলে ও কৌশলে তালাগুলা ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

তখন ভৈরবানন্দ বীরচাঁদকে লইয়া সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, হিরণ্ময়ী নাই—ধীরেন্দ্রনাথও নাই! দুইটি কক্ষ শূন্য পড়িয়া আছে। ধীরেন্দ্রনাথের জন্য ভৈরবানন্দের কিছুই হইল না, কিন্তু হিরণ্ময়ী বড় সাধের ভবিষ্যৎপত্নী। তাঁহারই জন্য তাঁহার মনোবাজ্যে সর্ব্বনাশ ঘটিল। তিনি অত্যন্ত আকুল ও দুঃখিত হইলেন। কিন্তু বীরচাঁদ পাছে তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া মনে মনেও পরিহাস করে, এই জন্য মনোভাব গোপন করিবার অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মন বাগ মানিল না।

অনেকক্ষণ উভয়ে এ গৃহ—সে গৃহ করিয়া অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না।

ভৈরবানন্দ, ধীরেন্দ্রনাথকে বলিদান জন্য যে, বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে কথা বীরচাঁদকে বলিলেন না। সে কথা তাহাকে তাহার বলিবার প্রয়োজনই বা কি?

বীরচাঁদ প্রথমে তাহার ধর্ম্মকন্যার দর্শনলাভের ইচ্ছায় অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছিল। এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে হতাশ হইল। বলা বাহুল্য যে, তাহার দুঃখের উপর আবার দুঃখ। সে একবার কাতরস্বরে বলিল, "কই, প্রভু! আমার ধর্ম্মমেয়ে কই?"

ভৈ।—"তাই ত আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" এই বলিয়া মনে মনে বলিলেন, "আমার এতক্ষণের পর অনুমান হইতেছে যে, বীরচাঁদ মাখনের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া এই কার্য্য করিয়াছে। বীরচাঁদ মাখনকে সরাইয়া দিয়া, দোষ কাটাইবার জন্য এখানে আসিয়াছে। তাই এ জানিয়াও যেন কিছুই জানে না, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছে।"

ভৈরবানন্দ কাপালিকের সন্দেহ ক্রমে ক্রমে গাঢ়তর হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া, বীরচাঁদকে মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহার মনের আগুন মনেই জ্বলিতে লাগিল।

দস্যুবীর বীরচাঁদও সন্দেহাকুল হইল। সে ভাবিল, "গুরুঠাকুর, বোধ হয়, আজ একটি খেলা খেল্‌লেন। আমি আর যাতে এঁর উপর কোন সন্দ ক'র্ত্তে না পারি, ইনি আজ তারই যোগাড়যন্ত্র করেচেন। আমি নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, এরূপ ক'রে ইনি আজ নির্দ্দোষী হ'বার ফিকির করেচেন। তাই ত, আমি যে মহামুস্কিলেই পড়্‌লুম। কিছু বল্‌তেও যে পাচ্চিনে। এ যে দেখ্‌চি আমার পক্ষে শাঁখের করাত্।" ইহার পর সে আরও কত কি ভাবিতে লাগিল।

ক্রমে ভৈরবানন্দ এরূপ অস্থির হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহাকে উন্মত্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তিনি আর মনের আবেগ সংযত করিয়া রাখিতে পারিলেন না। আপনা আপনি তাঁহার নয়নযুগল ছল ছল করিয়া উঠিল। কএক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। তিনি নিরাশ হইয়া স্খলিতপদে একস্থানে বসিয়া পড়িলেন। মুখমণ্ডল বিষাদমণ্ডিত হইল। মধ্যে মধ্যে এক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস যেন বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইতে লাগিল। তিনি অধোমুখে কি ভাবিতে লাগিলেন।

হিরণ্ময়ীর প্রতি ভৈরবানন্দের আন্তরিক ভালবাসা যে অত্যন্ত প্রবল, এই ঘটনায় আজ তাহা বিশদরূপে প্রতীয়মান হইল।

সন্দেহাভিভূত বীরচাঁদ নিকটে ছিল। সে ভৈরবানন্দের এই ভাব পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইল। তাহার অটল সন্দেহ টলিয়া গেল। ভৈরবানন্দের উপর তাহার বিজাতীয় বিদ্বেষ ও ক্রোধ সঞ্চিত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে উহা যেন কোথায় মিলিয়া গেল। সে বলিল, "প্রভু! আপুনি এমন হ'লে কেন?"

ভৈরবানন্দ দুঃখিত চিত্তে বলিলেন, "বীরচাঁদ! আর আমি এখানে থাকিব না। তোমার হস্তে আমি আমার মঠ এবং এই কালীবাড়ীর ভার দিলাম। এই সুড়ঙ্গে অনেক গুপ্ত ধন রহিল। তুমিই এক্ষণে এই সমস্তের অধিকারী। চন্দুরে প্রভৃতিরা ফিরিয়া আসিলে, তাহাদিগকে কিছু কিছু

অর্থ দিও। আমি চিরকালের জন্য চলিলাম।" এই বলিয়া তিনি বীরচাঁদকে অর্থকলসগুলি দেখাইয়া দিলেন।

বীরচাঁদের ভাবান্তর ঘটিল। সে অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্তে বলিল, "প্রভু! আমার এ সকলে কোন প্রয়োজন নাই। আমিও চলিলাম।"

ভৈরবানন্দ বলিলেন, "তবে তুমি আমার সঙ্গে চল। উভয়ে মিলিয়া তোমার ধর্ম্মদুহিতার অনুসন্ধান করিব।"

বীরচাঁদ ভাবিল, "গুরুঠাকুরের সঙ্গে যাওয়া উচিত। যদি আমার ধর্ম্মমেয়েকে পাই, তবে তার বাপ মার কাছে তাকে রেখে আস্‌ব।" সে এই ভাবিয়া গুরুবাক্যে সম্মত হইল। অনন্তর সে গুপ্ত-অর্থ-কলসগুলি আরও গোপনে রাখিয়া, ভৈরবানন্দকে সঙ্গে লইয়া সুড়ঙ্গের বাহিরে আসিল। একরূপ করিয়া সুড়ঙ্গের কপাট বন্ধ করিল।

অনন্তর ভৈরবানন্দ বীরচাঁদকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

সমাপ্তি।

ভৈরবানন্দ কাপালিক এবং তাঁহার অধীনস্থ দস্যুগণের ভয়ে, ধীরেন্দ্রনাথ এবং হিরণ্ময়ী, চণ্ডাল বালক মাখনের সহিত নানা স্থানে গোপনে গোপনে ভ্রমণ করিয়া, এক্ষণে নীলকণ্ঠপুরে আসিয়া একটি দোকানে বাসা লইয়াছেন। প্রথমে কোন দোকানদার তাঁহাদিগকে স্থান দিতে স্বীকৃত হয় নাই। কেবল হিরণ্ময়ীর দোষেই এরূপ হইয়াছিল। তিনি অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে না পারাতেই, কথার নড় চড় দেখিয়া দোকানদারেরা, কাহারা ইহারা, ভাবিয়া ভয় পাইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে ধীরেন্দ্রনাথ ও মাখনের অনেক বলা কওয়াতে একজন দোকানদার সম্মত হইয়াছিল। ধীরেন্দ্রনাথ প্রথমে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কালী-সুড়ঙ্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বরাবর মধুপুরে

যাইবেন ; কিন্তু অবশেষে অনেক বিবেচনার পর, তাহাতে নিরস্ত হইয়াছিলেন। তিনি মনে মনে ঠিক করিয়াছিলেন যে, ভৈরবানন্দ এবং তদীয় অনুচরগণ হয় ত এখন চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সুতরাং অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া পথ চলা ভাল নয়। এ সম্বন্ধে মাখনও তাঁহাকে অনেক পরামর্শ দিয়াছিল। কেন না সে ধীরেন্দ্রনাথের অপেক্ষা ভৈরবানন্দের নির্ঘাত শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ দিকে বাড়ী যাইতে যত বিলম্ব হয়, হিরণ্ময়ীর পক্ষে ততই ভাল। কেন না তিনি এক্ষণে কি করিয়া পিতা মাতাকে মুখ দেখাইবেন—কি করিয়া অগ্রজা ভগিনী কিরণময়ীর সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা কহিবেন, এক্ষণে তাঁহার সেই ভয়—বড় ভয়।

হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথকে এবং ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীকে পুনর্লাভ করিয়া যেন নব জীবন—নব আনন্দ—নব ভাব লাভ করিলেন। উভয়ে উভয়কেই এই কয় দিন ধরিয়া কত দুঃখের কথা—কত দুরবস্থার কথা—কত আশা ভঙ্গের কথা—কত দুর্ঘটনার কথা বলিলেন। আমরা পাঠক মহাশয়কে সে সকল কথা আর কত বলিব? এই উপন্যাসের আদ্যোপান্তই প্রায় তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

মাখন পলাইয়া আসিবার সময় সুড়ঙ্গ হইতে ভৈরবানন্দের গুপ্তকলস হইতে ইচ্ছামত কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া আপনার কাছে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এই কয় দিন সেই আপনি যোগাড় যাগাড় করিয়া বাসাখরচ চালাইতে লাগিল। ধীরেন্দ্রনাথ বা হিরণ্ময়ীর নিকট একটি কপর্দ্দকও নাই। ধীরেন্দ্রনাথের নিকট যাহা ছিল, তাহা চন্দ্রের হস্তে এবং হিরণ্ময়ীর মুক্তামালা এবং হীরার বালা মঙ্গলার হস্তে গিয়া পড়িয়াছে। যাই হৌক, মাখন বড় বুদ্ধিমান্। সে খুব বুদ্ধি খাটাইয়া ভৈরবানন্দকে দুই দিকে ঠকাইয়া ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীকে দুই দিকে বাঁচাইয়াছে। মাখনের জয়জয়কার হউক্। হয় ত পাঠক মহাশয় বলিবেন, ভৈরবানন্দের নিজস্ব স্বর্ণমুদ্রাগুলি লওয়া মাখনের ভাল হয় নাই। আচ্ছা, তাহাই যেন হইল, কিন্তু ভৈরবানন্দ সে স্বর্ণমুদ্রাগুলি কি সদ্বৃত্তি অবলম্বন করিয়া উপার্জ্জন করিয়াছিলেন? আমরা বলি, "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"।—তাতে কোন দোষ নাই। বরং যিনি দোষ ভাবিবেন, তিনিই ঠকিয়া যাইবেন। মানবসমাজে প্রবঞ্চনা ও

পরস্বাপহরণ-বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। পাঠক মহাশয়! আপনি একবার স্থির-চিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আজ কাল এই দুইটি পাপ-বৃত্তির প্রসাদেই প্রায় লোকে গণ্য, মান্য, পূজনীয়, যাবজ্জীবন স্মরণীয়, ঐশ্বর্য্য-শালী, সাধু, ধার্ম্মিক ও সৎকর্ম্মী হইয়া থাকে। হরি হরি! তবে আর পাপী, নারকী, প্রবঞ্চক, তস্কর, দস্যু ও ধর্ম্মশত্রু বলিব কাহাকে? তাই বলিতেছিলাম, "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ," নৈলে এখনি তোমায় পথের ভিখারী করিয়া,আর একজন ইমারৎ প্রস্তুত করিবে—ফল ফুলের বাগান বসাইবে—এক ঘোড়া,দুই ঘোড়া, তিন ঘোড়া বা চারি ঘোড়ার গাড়ী চড়িয়া গায়ে ফুঁ দিয়া হাওয়া খাইয়া বেড়াইবে! আর তুমি "হা পরমেশ্বর! ক্ষুধায় প্রাণ যায়!" বলিয়া ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিবে।

আমাদের বিবেচনায় ঠক্ চিনিয়া চলা সকলেরই কর্ত্তব্য। নিজে যাহাতে না ঠকি, তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টা এবং ঠক্‌কে ঠকাইয়া স্বত্বাপহৃত ব্যক্তির দুঃখ বিনাশের যত্ন করা উচিত। ইহাতে পুণ্য বই পাপ নাই। যাই হৌক্, এখন আর এ কথার বেশী বাড়াবাড়ি করিব না। কেননা, তাহা হইলে হয় ত অনেক পাঠক বিরক্ত হইবেন।

ধীরেন্দ্রনাথ জগদীশপ্রসাদের নিকট পত্রসমেত দুই জন লোক পাঠাইয়া-ছেন। আজ কয় দিন ধরিয়া তাঁহার আগমনপ্রতীক্ষায় নীলকণ্ঠপুরে কাল-ক্ষেপ করিতেছেন।

অদ্য বেলা প্রায় প্রথম প্রহর অতীত হইয়াছে। এমন সময়ে সেই দুই জন পত্রবাহক ধীরেন্দ্রনাথের নিকট আসিয়া প্রণাম করিল। ধীরেন্দ্রনাথ ব্যস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি?"

তন্মধ্য হইতে একজন বলিল, "কর্ত্তা আস্‌চেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র ধীরেন্দ্রনাথ এবং হিরণ্ময়ী যেন জাগরিত হইয়া উঠিলেন। মাখনও যেন 'কি হইবে—কি হইবে' বলিয়া সজাগ হইল।

দেখিতে দেখিতে জগদীশপ্রসাদ, জাহ্নবীদেবী, হরিহর দেওয়ান এবং তাঁহাদের সঙ্গিগণ ধীরেন্দ্রনাথের বাসায় উপনীত হইলেন। ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু দুই চারি পা-র বেশী যাইতে হইল না। তিনি জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবীদেবীকে নিকটে দেখিয়া

প্রণাম করিলেন। তাঁহারাও তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

হিরণ্ময়ী অগ্রেই সংবাদ পাইয়া লজ্জায় ও ভয়ে গৃহের একটি নিভৃতস্থানে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন।

জাহ্নবীদেবী অপর কথা ছাড়িয়া, ধীরেন্দ্রনাথকে ঔৎসুক্য পরিপূরিত চিত্তে কহিলেন, "বাবা! আমার হিরণ্ কই?"

ধীরেন্দ্রনাথ একটি কুঠরীর দিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে উত্তর দিলেন, "মা! আপনার হিরণ্ এই গৃহে। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

তখন জাহ্নবীদেবী স্বামীকে লইয়া ধীরেন্দ্রনাথের প্রদর্শিত গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। ধীরেন্দ্রনাথও সঙ্গে সঙ্গে থাকিলেন।

তাঁহাদিগকে গৃহপ্রবিষ্ট দেখিয়া লুক্কায়িতা হিরণ্ময়ী আরও লুকাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আর স্থান পাইবেন কোথায়?

জাহ্নবীদেবী কোন কথা না কহিয়া, একবারে হিরণ্ময়ীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত ক্রোড় যেন স্বর্গীয় সুধায় সুশীতল হইয়া গেল। তিনি গভীর আনন্দ এবং অপার স্নেহের আবেগে কাঁদিয়া ফেলিলেন। হিরণ্ময়ীও মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

জগদীশপ্রসাদের অন্তঃকরণে পুত্রিকাস্নেহ উচ্ছ্বলিত হইয়া, তাঁহার মুখমণ্ডলে কি এক নূতন ভাব আনিয়া দিল।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইল। এই সময় টুকুর মধ্যে সেই তৃণাচ্ছাদিত গৃহের ভিতর স্বর্গের আনন্দও, বোধ হয়, পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল।

অনন্তর জাহ্নবীদেবী হিরণ্ময়ীকে ক্রোড় হইতে অবতারণ করিয়া, হর্ষভরে বলিলেন, "হ্যাঁ, মা! তোর মনে কি এই ছিল? তুই কেমন ক'রে আমাকে ভুলে চ'লে এলি?"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "হিরণ! তুই কি দুঃখে আমাদের পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলি?"

হিরণ্ময়ী এ সকল প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন? তাঁহার উত্তর দিবার পথ কই? কাজেই অনন্যোপায় হইয়া, ভয়ে ও লজ্জায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। জনক

জননীর পা জড়াইয়া ধরিলেন। চক্ষের জলে তাঁহার বদনমণ্ডল ভাসিয়া গেল। তাঁহার তখনকার সে মুখের ভাব, আমাদের এখনকার লেখনী-মুখে খুলিবে না—খুলিবারও নয়।

মাখন, গৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, স্থিরদৃষ্টে এই সকল ব্যাপার দেখিতে লাগিল। তাহারও হর্ষ ও বিস্ময়ের উৎস উছলিয়া উঠিল। সে সেই হর্ষ ও বিস্ময়ের সহিত একবার নিঃশব্দে হাস্য করিল। এ হাসির অপর নাম কৃতকার্য্যতা।

ধীরেন্দ্রনাথ আজ বড় সুখী। তাঁহার অনেক দিনের পরিশ্রম, যত্ন ও অধ্যবসায় সুফল প্রদান করিল বলিয়া, তিনি আজ বড় সুখী। তাঁহার জীবন,মন প্রাণ, শরীর প্রভৃতি সমুদয় যেন আজ কি এক অভিনব উপাদানে নির্ম্মিত বলিয়া অনুভূত হইল।

হিরণ্ময়ী আজ আনন্দময়ী। তাঁহার আনন্দের প্রবর্ত্তক মাখন—ভোগ-মূল ধীরেন্দ্রনাথ এবং উদ্যাপন জাহ্নবীদেবী ও জগদীশপ্রসাদ। যদিও তিনি লজ্জা ও ভয়ে পিতা মাতার দিকে মুখ তুলিয়া,তাঁহাদের চক্ষে আনন্দ ঢালিয়া দিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তাঁহাদিগকে মনোরাজ্যের রত্নসিংহাসনে বসাইয়া, অলক্ষ্যে রাশি রাশি আনন্দ কুসুম ঢালিয়া পূজা করিতেছেন।

একরূপ সামগ্রী স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকিলে বড় মনোহর দেখায়। এই জন্যই শারদীয় মগ্নোন্মুখ-সূর্য্য-কিরণ-রঞ্জিত-সান্ধ্য নীরদস্তর—পূর্ণচন্দ্র-কৌমুদী-বিধৌত মহাসমুদ্রের হর্ষোল্লসিত তরঙ্গস্তর—শরতের প্রভাত-মারুতান্দোলিত-শুক-শ্যামল-তৃণস্তর—বসন্তের মলয়ানিলহিল্লোলিত বিকসিত-কুসুমস্তর—এবং মেঘ-নির্ম্মুক্ত-গগন-সজ্জিত-তারকাস্তর বড় মনোহর। আবার আজ এই নীলকণ্ঠপুরের বিপণী কুটীর-উদ্ভাসিত আনন্দস্তরও বড় মনোহর।

এই অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঙ্গে, সময় যেন দেখিতে দেখিতে অতি শীঘ্র চলিয়া যাইতে লাগিল। পূর্ব্বে যে জগদীশপ্রসাদ, জাহ্নবীদেবী, ধীরেন্দ্র-নাথ এবং হিরণ্ময়ীর পক্ষে সময়, তাঁহাদের পর্ব্বতপ্রমাণ দুঃখের গুরুভারে আক্রান্ত হইয়া এক পাও চলিতে পারে নাই, আজ সেই-ই সময় আবার তাঁহাদেরই আনন্দ-মারুত-বিদ্যুদ্বেগে যেন এক প্রহরের পথ এক নিমেষে অতিক্রম করিতে লাগিল।

জগদীশপ্রসাদ এবং জাহ্নবীদেবী, ধীরেন্দ্রনাথকে তাঁহাদিগের সমস্ত বিবরণ জানাইতে ইচ্ছা করিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ আপনার সমস্ত ঘটনা বলিলেন, কিন্তু হিরণ্ময়ী তথন লজ্জায় কিছু বলিতে পারিলেন না। সুতরাং ধীরেন্দ্রনাথকে তাঁহার হইয়া বলিতে হইল। হিরণ্ময়ী, ধীরেন্দ্রনাথকে পূর্ব্বে নিজের সমস্ত ঘটনা বলিয়াছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ যখন আপনার ও হিরণ্ময়ীর বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বলিলেন, তথন চণ্ডাল বালক মাখনেরও কথা তৎসঙ্গে বিবৃত হইল। তা' ত হইবারই কথা। মাখন না থাকিলে আজ কি এই নীলকণ্ঠপুরীয় অপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হইত ?

জগদীশপ্রসাদ এবং জাহ্নবীদেবী, ধীরেন্দ্রনাথের প্রমুখাৎ মাখনের অলৌকিকী পরহিতৈষিণার কথা শুনিয়া একেবারে মোহিত হইলেন। তাঁহাদের হর্ষ ও বিস্ময় সীমা ছাড়াইয়া উঠিল। তাঁহারা উভয়ে অন্তরের সহিত মাখনকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। মাখন এক্ষণে তাঁহাদের চক্ষে যেন সাক্ষাৎ পরোপকারের পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তাঁহাদের জিহ্বা অনর্গল তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল, এক নিমেষের জন্যও ক্লান্তি বোধ করিল না। তাঁহারা তাহাকে প্রচুররূপে পুরস্কৃত করিবার অঙ্গীকার করিলেন।

এইরূপে আরও কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল।

এইবার আর একটি নূতন ব্যাপার উপস্থিত। জগদীশপ্রসাদ কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিলেন। ভাবিয়া জাহ্নবীদেবীকে বলিলেন, "হ্যা দেখ, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে, আজ আমরা হিরণ্ময়ী এবং ধীরেন্দ্রনাথকে পাই-লাম। এই সৌভাগ্যের ফল আজিই ভোগ করিতে ইচ্ছা করি।"

জাহ্নবী বলিলেন, "কি ?"

জ।—"আমি এক্ষণে তোমার সহিত একমত হইয়া, ধীরেন্দ্রনাথের হস্তে হিরণ্ময়ীকে অর্পণ করিব। ধীরেন্দ্রনাথ আমাদের জন্য যেরূপ কষ্ট সহ্য করিয়া-ছেন, তাহার পুরস্কার স্বরূপ হিরণ্ময়ীকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করাই সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য। আমি ইঁহাকে ইহা অপেক্ষা আর কি পুরস্কার দিব ? ধীরেন্ সম্পূর্ণরূপেই এই পুরস্কারের উপযুক্ত পাত্র। আরও একটি কথা এই ;— আমি পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, কন্যাকে বয়স্থা করিয়া বিবাহ দিলে, ভবি-

ষ্যতে বড় সুখের বিষয় হইয়া থাকে, কিন্তু এক্ষণে বুঝিলাম, তাহা অন্যত্র হইলেও, আজিও আমাদের দেশে হইবার নয়। সে সময় এখনও আসে নাই। আসিলে কেন আমরা এরূপ দুর্ঘটনায় জড়ীভূত হইয়া আজ কএক মাস ধরিয়া ঈদৃশ বিপদগ্রস্ত হইব? আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, এখনও আমাদের বঙ্গদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকা উচিত। সময় হইলে, আপনিই ইহা পরিবর্ত্তিত হইবে, কিন্তু ইচ্ছা বা বলপূর্ব্বক ইহার পরিবর্ত্তন করিলে, এক্ষণে হিতে বিপরীত হইবে। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই প্রত্যক্ষ ঘটনা। যদি আমি অল্পবয়সে কন্যা বিবাহে সম্মত হইতাম, তাহা হইলে আর এই বিপদ সংঘটিত হইত না।"

জগদীশপ্রসাদের এই কথা শুনিয়া জাহ্নবীদেবী বলিলেন, "আমি ত তোমাকে কতবার এ কথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি বাল্যবিবাহের বিষম শত্রু ছিলে। যাই হৌক, আজ তোমার এই শুভমতি দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তাঁহার মনে আবার কিসের এক ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

জগদীশপ্রসাদ শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আবার কি হইল?"

জাহ্নবী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "না—কিছু না।" এই কথা বলাতে যেন তাঁহার অন্তরে অনেক কথা চাপিয়া গেল।

জগদীশ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। পারিয়া, তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অন্তরালে লইয়া গিয়া অনুচ্চস্বরে সদুঃখে বলিলেন, "আর দুঃখ করিয়া কি করিবে, বল? কিরণময়ীকে আর পাওয়া যাইবে না। তাহার পত্রের মর্ম্ম বুঝিয়া আমি সে বিষয়ে একেবারে হতাশ হইয়াছি। সে হিরণ্ময়ীকে না পাইলে আর ফিরিবে না। এখন সে জীবিত আছে কি না, তাহাই সন্দেহের বিষয়। এখন তাহার আশায় চুপ করিয়া থাকিয়া ভবিষ্যতে সুফলপ্রাপ্তির আশাই বা কই? আবার, এ দিকে আমি ধীরেন্দ্রনাথের বন্ধু প্রিয়মাধবের মুখে হিরণ্ময়ীর পলাইয়া আসিবার কারণ এক প্রকার আভাসে আভাসে শুনিয়াছি। শূলপাণি কণ্ঠাভরণ মহাশয়ের বাটীতে তাহাও ত তোমাকে বলিয়াছি। সুতরাং এখন হিরণ্ময়ীর যাহাতে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, তাহাই করা যুক্তি সঙ্গত। আমি দেখিতেছি, এখনই ধীরেন্দ্র-

নাথের সঙ্গে হিরণ্ময়ীর বিবাহ দেওয়া উচিত। তা নহিলে, জানি না, আবার কি হইতে কি হইবে। আর দেখ, যদ্যপি পরে কিরণময়ীকে কোন সূত্রে পাওয়া যায়, তখন অন্য কোন পাত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিব। তাহাতে কোন দোষ হইবে না। আর আমি হিরণ্ময়ীকে অবিবাহিতা অবস্থায় রাখিতে পারি না। যদি আরও পাঁচ-সাত বৎসর কিরণময়ীকে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তখন হিরণ্ময়ী কত বড় হইবে বল দেখি? সুতরাং তুমি আর দুঃখ করিও না—অন্য কিছু ভাবিও না।"

স্বামীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া জাহ্নবীদেবী কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া অবশেষে ধীরেন্দ্রনাথের সহিত হিরণ্ময়ীর বিবাহপ্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

অনন্তর জগদীশপ্রসাদ আর বিলম্ব না করিয়া ধর্ম্ম সাক্ষী করত ধীরেন্দ্র-নাথের হস্তে আপনার কনিষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ীকে সম্প্রদান করিলেন। দোকান ভরিয়া আনন্দধ্বনি উঠিল।

কিন্তু তাঁহার এবং জাহ্নবীদেবীর পক্ষে হরিষে বিষাদ ঘটিল। তাঁহারা এই আনন্দমিলনেও সম্পূর্ণরূপে সুখী হইতে পারিলেন না। পূর্ব্ব শোক জাগিয়া উঠিল। সেই শোকের সঙ্গে তাঁহারা উভয়ে, "হা কিরণময়ী!—" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ এবং হিরণ্ময়ী এতক্ষণ ধরিয়া বুঝিয়াছিলেন, কিরণময়ী বিবা-হিতা হইয়া গৃহে আছেন, নহিলে আজ কেন তাহাদের বিবাহ হইল? কিন্তু এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহাদের ও অভিনব আনন্দে—বহু দিনের আশা-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি-আনন্দে সহসা বিষাদ ও দুশ্চিন্তা মিশ্রিত হইয়া গেল। ধীরেন্দ্রনাথ কি বলিবেন বলিবেন করিয়া বলিবার সাহস পাইলেন না। হিরণ্ময়ীর সহিত ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। হিরণ্ময়ী আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

আবার জগদীশপ্রসাদ শোকোচ্ছ্বসিত চিত্তে বলিতে লাগিলেন, হ হিরণ্ময়ি! তুই যদি সে দিন এমন করিয়া না আসিতিস্, তাহা হইলে তোর এই হতভাগ্য পিতা মাতাকে আজ 'হা কিরণ!' বলিয়া কাঁদিতে হইত না

ধীরেন্দ্রনাথ দুঃখিতচিত্তে বলিলেন, "মহাশয়! আপনার অগ্রজা কন্য কিরণময়ীর কি হইয়াছে?"

জ।—"সে যে কোথায় গিয়াছে, আজিও তার অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। আজ আসিবে কাল আসিবে করিয়া আশায় পড়িয়াছিলাম, কিন্তু আপাততঃ আগত হরিহর দেওয়ানের মুখে তাহার অদর্শনের কথা শুনিয়া আমার আশা ভরসা সব ঘুচিয়া গেল। ধীরেন্! সেও হিরণ্ময়ীকে অন্বেষণ করিতে গিয়াছে। আমরা তাহার কিছুই জানিতাম না। তাহার একখানি পত্রে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। কিরণময়ী সে পত্রখানি লিখিয়া তাহার শয্যাতলে রাখিয়া, এক দিন রাত্রিকালে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাহার পত্রে লেখা ছিল, হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধান করিতে পারিলে গৃহে আসিবে, নতুবা আর আসিবে না। ধীরেন্! তবে বল দেখি, আর কি তাহাকে পাইব! আমরা হিরণ্ময়ীকে পাইলাম, কিন্তু কিরণ ত পায় নাই। সে এখনও না জানি, কোথায় ভগিনীশোকে আকুল হইয়া বেড়াইতেছে, কি আত্মঘাতিনী হইয়াছে, তাহার ত কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। মানুষের মন সর্ব্বদাই যেন অমঙ্গলের দিকে চলিয়া পড়ে। কিরণময়ী সম্বন্ধে আমাদেরও তাই।" এই বলিয়া তিনি আবার হিরণ্ময়ীকে বলিলেন, "হিরণ! তোর সঙ্গে কি কিরণময়ীর কোন খানে দেখা হইয়াছিল?"

হিরণ্ময়ী শোকাকুলচিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "না, বাবা! আমি বড় দিদিকে এক দিনও দেখি নাই। আমার বড় দিদি কোথা, বাবা? হা বড়দিদি! এই নিষ্ঠুরার জন্য তোমার ভাগ্যে কি ঘটিল?" এই বলিয়া তিনি ভগিনীশোকে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

আনন্দময় গৃহ কিয়ৎক্ষণের জন্য গভীর বিষাদে ডুবিয়া গেল।

এমন সময়ে সহসা তথায় ভৈরবানন্দ কাপালিক এবং বীরচাঁদ আসিয়া উপস্থিত। অনেকে দৈব ঘটনা বিশ্বাস করে না, কিন্তু আমরা করি। তাহা নহিলে এই ঘটনাকে কি ঘটনা বলিব? ভৈরবানন্দ এবং বীরচাঁদ যেমন এখানে উপস্থিত আর অমনি অবাক্। উভয়েরই মনে কি এক ভাবান্তর ঘটিয়া গেল। উভয়েই সবিস্ময়ে হিরণ্ময়ী প্রভৃতির দিকে চাহিয়া রহিল।

হিরণ্ময়ী বীরচাঁদকে দেখিয়া সন্দেহমিশ্রিত ভরসাযুক্ত এবং ভৈরবানন্দকে দেখিয়া ভীত হইলেন। যখন ভৈরবানন্দকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি তাঁহাকে রোষভরে কি

বলিবেন, এমন সময়ে বীরচাঁদ আনন্দভরে হিরণ্ময়ীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মা! তুই কেমন আছিস্? এনারা কে?"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "ইনি আমার পিতা, ইনি আমার মাতা।"

তখন বীরচাঁদ ধীরেন্দ্রনাথের দিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া বলিল, "আর ইনি?"

হিরণ্ময়ী লজ্জায় নিরুত্তর।

তখন জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "ইনি আমার জামাতা।"

এই কথা শুনিয়া বীরচাঁদ অতিশয় আহ্লাদিত হইল। কিন্তু ভৈরবানন্দ যেন বজ্রাহত হইয়া পড়িলেন। তিনি যাহাকে কালীর নিকট বলি দিবেন বলিয়া কারাগৃহে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই যুবা তাঁহার আশা-স্বরূপিণী যুবতীর স্বামী! ভৈরবানন্দের প্রাণ উড়িয়া গেল। শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া গেল। তাঁহার হতাশ চিত্ত চিন্তার অগাধ গর্ভে ডুবিতে ডুবিতে কোথায় চলিল।

এ দিকে জাহ্নবীদেবী, জগদীশপ্রসাদ এবং ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীর মুখে যে বীরচাঁদের কথা শুনিয়াছিলেন, তাহাকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া অতিশয় পুলকিত হইলেন। সকলেই তাহাকে মনের সহিত ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

এমন সময়ে ভৈরবানন্দ মাখনকে দেখিতে পাইলেন এবং সেই যে তাঁহাকে মাদকাভিভূত করিয়া ধীরেন্দ্রনাথ এবং হিরণ্ময়ীকে সুড়ঙ্গ হইতে লইয়া পলাইয়া আসিয়াছে, তাহাতে তাঁহার আর অণুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। কিন্তু তিনি তাহাকে কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাহাকে একাকী পাইলে সর্ব্বনাশ করিতেন। এত লোকের নিকট এখন তাঁহার নীরব হইয়া থাকাই ভাল।

এমন সময়ে সহসা বীরচাঁদ মাখনকে বলিয়া উঠিল, "আমি তোমাকে যেন দেখেছি দেখেছি মনে হচ্চে।"

মা।—"তা হ'বে, কিন্তু আমি তোমাকে কখন দেখিনি।"

বী।—"আচ্ছা, বল দেখি, মঙ্গলা বুড়ী কি তোমাকে কাজলাবেড়ে গাঁয়ে নিয়ে এসেছিল? সেই গাঁয়ের পাশে একটা পুকুরধারে তোমাতে আর তাতে কি সব কথা হ'চ্ছিল?"

মাখন এখন সমস্ত বুঝিতে পারিল। বলিল "তুমি তা কি ক'রে জান্‌লে ?"

বী।—"আমি সেই পুকুরের ঘাটের কাছে একটা বকুলগাছে ব'সে ছিলুম।"

মা।—"তবে তুমি ডাকাত!"

বীরচাঁদ হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেন ?"

মা।—"আমি না পালিয়ে গেলে সে দিন ত তুমি আমায় মেরে ফেল্‌তে।

বী।—"সে দিন আমি না গাছে থেকে লাফিয়ে পড়্‌লে, মঙ্গলা তোমায় বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্‌ত।"

এই কথা শুনিয়া মাখন এবং অন্যান্য সকলে বিস্মিত হইল।

এমন সময়ে বীরচাঁদ নিজের বস্ত্র হইতে কএকটি মুদ্রা ও একটি স্বর্ণ অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া মাখনের হস্তে দিয়া বলিল, "আমি তোমার এবং আমার এই ধর্ম্মমেয়েব শত্রু সেই মঙ্গলা আর তা'র স'খে ভোলা ব'লে ছুটো ব্যাটাকে যমের বাড়ী পাঠিয়েচি।"

এই কথা শুনিবামাত্র হিরণ্ময়ী সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি কি মঙ্গলা পাপিনীকে মেরে ফেলেছ ?"

বী।—"হ্যাঁ মা! তার পাপ কর্ম্মের ফল দিয়েচি। এই নেও তোমার, হীরের বালা আর মুক্তোর মালা।" এই বলিয়া বস্ত্রমধ্য হইতে উক্ত অলঙ্কারদ্বয় বাহির করিয়া হিরণ্ময়ীর হস্তে প্রদান করিল।

তদ্দর্শনে হিরণ্ময়ী অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

ইত্যবসরে আর একটি ঘটনা ঘটিয়া পড়িল। বীরচাঁদ মাখনকে যে অঙ্গুরীটি প্রদান করিল, মাখন উহা পাইবাই অতিশয় চিন্তিত ও অস্থির হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি যেমন সেই অঙ্গুরীটি নিজের বস্ত্র-মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে যাইবে, আর অমনি উহা ভূমিতলে পড়িয়া জগদীশপ্রসাদের সন্নিকটে ঠিকরাইয়া পড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা তুলিয়া মাখনকে যেমন দিতে যাইবেন, আর অমনি, "এ কি!" বলিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার বিস্ময়-রঞ্জিত মুখমণ্ডল দেখিয়া মাখন আরও অস্থির হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

এমন সময়ে জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "মাখন! তুমি এ অঙ্গুরী কোথায় পাইলে?"

মাখন নিরুত্তর। কিন্তু বীরচাঁদ বলিল, "মশাই! আমি সেই বাত্রে শুনেচি, কে এই ছোক্‌রাকে এই আঙ্‌টি দিয়েছিল

এই কথা শুনিয়া জগদীশ বলিলেন, "মাখন! সত্য করিয়া বল, তাহার নাম কি?"

তবুও মাখন নিরুত্তর।

জগদীশপ্রসাদ পুনর্ব্বার অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিলেন, "এই অঙ্গুরীতে যাহার নাম অঙ্কিত দেখিতেছি, তাহাকে একবার দেখিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে। কোথায় আছে জান?"

মাখন এই কথা শুনিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, "সে এখন আপনার নিকটেই আছে।" এই কথা বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল এবং জগদীশের পদপ্রান্তে পড়িয়া বলিল, "বাবা! আমাকে ক্ষমা কর। আমিই তোমার—"

"অ্যাঁ তুইই আমার কিরণময়ী।" জগদীশের মুখে এই কথা উচ্চারিত হইবামাত্র গৃহস্থিত সকলে একেবারে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।

ও পাঠকমহাশয়। এ কি হইল! চণ্ডালবালক মাখন কোথায় গেল! তাহার সে পরিচ্ছদ, সে গ্রাম্য কথা এবং সে বদনমণ্ডলমণ্ডিত রক্তচন্দন-প্রলেপ কোথায় গেল! কি আশ্চর্য্য। বালক- বালিকা! মাখন—কিরণময়ী।

কিরণময়ীকে দেখিয়া সকলে বিস্ময় ও আনন্দে মোহিত হইল। কিন্তু ভৈরবানন্দের কৌতূহলের আর ইয়ত্তা রহিল না। তিনি আপনা আপনি একবার বলিয়া উঠিলেন, "আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি।—না বাস্তবিক ঠকিয়াছি।"

জগদীশপ্রসাদ আনন্দিতমনে কিরণময়ীকে বলিলেন, "মা! তুই যে এত বুদ্ধিমতী—তুই যে আমাদের মৃতসঞ্জীবনী লতা, তা আমরা জানিতাম না। তুই না থাকিলে আজিকার এই শুভদিন কখনই সংঘটিত হইত না। তোকে আর কি বলিয়া প্রশংসা করিব? তবে এই বলি যে, জাহ্নবী তোর জননী, হিরণ্ময়ী তোর কনিষ্ঠা ভগিনী, এবং আমি তোর পিতা হ'য়ে আজ সার্থক হইলাম।"

জাহ্নবীদেবী কিরণময়ীকে ক্রোড়ে করিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ কিরণময়ীর নিকট কত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

হিরণ্ময়ী কিরণময়ীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া অনেক দিনের পর ভগিনী ভালবাসার সাধ মিটাইয়া লইলেন।

দুইটি কন্যাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া জগদীশ ও জাহ্নবীদেবী আশাতীত সৌভাগ্যের ফল লাভ করিলেন। এত দিনে জগদীশ্বর ইহাঁদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। দোকান গৃহে কন্যা প্রাপ্তির উৎসবের অসংখ্য তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে, ধীরেন্দ্রনাথ কিরণময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরণময়ি। তুমি তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী এবং আমার জন্য যে, কিরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াছ, তাহা বর্ণনাতীত। আমরা উভয়ে তোমার এই মহোপকারের একাংশ প্রত্যুপকারও করিতে পারিব না। আচ্ছা, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি জন্য চণ্ডালবালকের বেশ ধারণ করিয়াছিলে?"

তখন কিরণময়ী অধোমুখে বলিতে লাগিলেন, "আমি পুরুষ নহি, অথচ আমাকে পুরুষ না সাজিলে সকল স্থলে পর্য্যটন করা হয় না। এই ভাবিয়া আমি অন্য কোন জাতীয় পুরুষ না সাজিয়া, একেবারে চণ্ডাল সাজিয়াছিলাম। কেননা, তাহা হইলে আমাকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য বলিয়া কেহ স্পর্শ করিবে না। সুতরাং আমার ছদ্মবেশ ধারণেরও কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিবে না।"

কিরণময়ীর এই কথা শুনিয়া, সকলে তাঁহাকে বড় বুদ্ধিমতী বলিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল।

ধীরেন্দ্রনাথ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি জন্য ভৈরবানন্দ কাপালিকের নিকট গিয়াছিলে?"

কিরণময়ী বলিলেন, "আমি নানাস্থানে হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধান করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইলাম না, তখন একবার মনে করিলাম, গৃহে ফিরিয়া যাই। কিন্তু আমার মনের সেরূপ ইচ্ছা অধিকক্ষণ থাকিল না। আমি আবার ভাবিলাম, হিরণ্ময়ীকে না পাইলে যাইব না। এই ভাবিয়া আবার অন্য দিকে প্রস্থান করিলাম। তখন আমার নিকট এই কএকটি

এবং অঙ্গুরীটি ছিল। ইহাও আবার কিরূপে হারাইয়াছিলাম, বীরচাঁদের মুখে তাহা ত শুনিলে। অবশেষে আমি নিরুপায় হইয়া, কএক দিন ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম। তাহার পর ঘটনাক্রমে ভৈরবানন্দ কাপালিকের নিকট উপস্থিত হই। আমি জানিতাম, অনেক চণ্ডাল, কাপালিক-দিগের নিকট মন্ত্র এবং ঔষধ শিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই জন্য আমিও এইরূপ করিয়াছিলাম। এইরূপে কিছু সুবিধা করিয়া পুনর্ব্বার অন্যত্র হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধান করিতে যাইতাম।"

ধীরেন্দ্রনাথ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি কেন তোমার সুড়ঙ্গা-বরুদ্ধা কনিষ্ঠা ভগিনীকে উদ্ধার করিতে এত বিলম্ব করিয়াছিলে ?"

কিরণ।—"আমি অগ্রে কিছুই জানিতে পারি নাই।" এই বলিয়া, যেরূপে তিনি হিরণ্ময়ী এবং ধীরেন্দ্রনাথের সন্ধান পাইয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে, তৎসমস্ত বলিলেন।

সে সকল কথা শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইল। ভৈরবানন্দ কাপালিক বহির্ভাগে ছিলেন। তিনি কিরণময়ীর মুখে আত্মচরিত শ্রবণ করিয়া সলজ্জে কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়া গেলেন।

এবার ধীরেন্দ্রনাথ কিরণময়ীকে আবার কি বলিবেন বলিবেন বলিয়া মনে করিতেছেন, এমন সময়ে হিরণ্ময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড় দিদি ! তুমি যখন আমাকে সুড়ঙ্গের ভিতর দেখিয়াছিলে, তখন কেন আত্মপ্রকাশ কর নাই ? বোধ করি, চিনিতে পার নাই—না ?"

কিরণময়ী হাসিয়া উত্তর দিলেন, "হিরণ ! আমি চিনিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু পাছে তুমি আহ্লাদে গোলযোগ করিয়া বিভ্রাট ঘটাও, এই জন্য ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করি নাই।"

হিরণ।—"বড়দিদি ! আমিও তোমাকে চিনিতে পারি নাই।"

কিরণ।—"তুমি ত পারিবেই না। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথও পারেন নাই।"

এই কথা শুনিয়া ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কিরণময়ী যে, চণ্ডালবালকের বেশ ধরিবেন—মুখময় রক্তচন্দন লেপন করিবেন—চণ্ডালের ন্যায় কথা কহিবেন, তাহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর।"

তাঁহার এই কথা শুনিয়া সকলে বলিল, "বাস্তবিক—বাস্তবিক !"

কিয়ৎকাল এইরূপ এবং অন্যান্যরূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল।

এমন সময়ে কাপাসডাঙ্গা হইতে সেই বৃদ্ধ পাচক ব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া উপস্থিত। জগদীশপ্রসাদ তৎসম্বন্ধে তথাকার দোকানদারকে যাহা বলিয়া আসিয়াছিলেন, পাচক ব্রাহ্মণ তাহাতে বুক বাঁধিয়া থাকিতে সাহস পায় নাই। যদি জগদীশপ্রসাদ পুনর্ব্বার কাপাসডাঙ্গায় না যান, তাহা হইলেই ত তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে না। সে এই ভয়ে দোকানদারের নিকট নীল-কণ্ঠপুরে জগদীশপ্রসাদের প্রস্থানসংবাদ পাইয়া বরাবর চলিয়া আসিয়াছে।

জগদীশপ্রসাদ তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ আহ্লাদিত হইয়া নমস্কার করিল। জগদীশপ্রসাদও প্রতিনমস্কার করিলেন।

অনন্তর কাহাকে দেখিয়া পাচক ব্রাহ্মণের মনে যেন কি এক ভাবান্তর ঘটিল। ব্রাহ্মণ কাহাকে যেন কি বলিবে বলিবে করিয়াও বলিতে সাহস পাইল না। মনের মধ্যে নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হইল। কিয়ৎকাল সে চুপ করিয়া থাকিয়া আর থাকিতে পারিল না। জগদীশপ্রসাদকে বলিল, "মহাশয়! আপনি যদি আমার দোষ গ্রহণ না করেন, তবে আমি আপনাকে অন্তরালে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।"

জ।—"দোষ আবার কি?"

এই বলিয়া তিনি উক্ত ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া অন্তরালে গেলেন। তথায় গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিবে—বল।"

ব্রাহ্মণ বলিল, "আপনার সঙ্গে ঐ যে যুবাটি রহিয়াছেন, ওঁকে ত সেদিন দেখি নাই। আর ঐ দুইটি বালিকাকেও দেখিতে পাই নাই। এক্ষণে শুনিলাম, বালিকা দুইটি আপনার কন্যা, কিন্তু যুবাটি কে?"

জগদীশ হাসিয়া বলিলেন, "আমার জামাতা।"

ব্রাহ্মণ।—"ওঁর নাম কি?"

জগ।—"ধীরেন্দ্রনাথ।"

ব্রাহ্মণ।—"পিতার নাম?"

জগ।—"গোলোকনাথ!"

ব্রাহ্মণ।—"কোথায় নিবাস?"

জগ।—"পূর্ব্বে নবদ্বীপে ছিল, এক্ষণে মধুপুরে আমার বাটীতে।"

ব্রাহ্মণ।—"ওঁর-সঙ্গে আপনার দেখা সাক্ষাৎ কিরূপে হয়?"

জগ।—"সে অনেক কথা। তবে সংক্ষেপে বলি, ওঁর পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং উনি নবদ্বীপ হইতে সপ্তগ্রামে যাইতেছিলেন। রাত্রিকালে সহসা ভাগীরথী নদীতে নৌকাডুবি হইয়া যান। তাঁহারা কে কোথায় গিয়াছেন, তাহা জানা যায় নাই। তবে উনি সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পাইয়া আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হ'ন। আমি আজ ক্রমাগত দশ এগার বৎসরকাল ওঁকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি।"

ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া আসিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ অবাক্।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বাবা! আজ আমি তোমায় পুনর্ব্বার পাইলাম। বিধাতা আজ আমাকে স্বপ্নের অগোচর ফলপ্রদান করিলেন।" এই বলিয়া তিনি ধীরেন্দ্রনাথের হস্তে একটি অঙ্গুরী প্রদান করিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ অঙ্গুরীটি লইয়া দেখিলেন, উহাতে লেখা রহিয়াছে "গোলোকনাথ।" দেখিবামাত্রই তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল—মন তড়িদ্বেগে চঞ্চল হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। ভাবিয়া চিনিতে পারিলেন, তাঁহার পিতা গোলোকনাথ। অমনি তিনি অপরিমিত আনন্দভরে কাঁদিয়া ফেলিলেন। ভক্তিভরে তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন।

এই ব্যাপার দর্শন করিয়া গৃহস্থিত সকলে বিস্ময়াভিভূত হইল।

জগদীশপ্রসাদ আহ্লাদিত হইয়া গোলোকনাথকে বলিলেন, "মহাশয়! আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমি না জানিয়া আপনার প্রতি সদ্ব্যবহার করি নাই। এক্ষণে আমি জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি যে, তিনি আমার বৈবাহিক মহাশয়কেও মিলাইয়া দিলেন।

এই ব্যাপার দেখিয়া হরিহর দেওয়ান প্রভৃতি সকলে বিস্ময়ে ও আহ্লাদে বলিতে লাগিল, "অঁ্যা,ইনিই আমাদের প্রভুজামাতা ধীরেন্দ্রনাথের পিতা গোলোকনাথ! ইনি যে নৌকাডুবি হইয়াছিলেন! আজ আবার ইহাঁকে পাওয়া গেল। ধন্য জগদীশ্বর! ধন্য জগদীশ্বর!" এই বলিয়া সকলে আনন্দ-কোলাহল করিতে লাগিল।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ গত হইলে, গোলোকনাথ জগদীশপ্রসাদকে বলিলেন, "মহাশয়! আমি যে, আজ আমার ধীরেন্দ্রনাথকে আপনার জামাতা হইতে দেখিলাম, ইহা অপেক্ষা আমার আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে? আমি সেই নৌকাডুবির পর জায়াপুত্রবিহীন হইয়া উদাসীনের ন্যায় দেশ দেশে কতই ভ্রমণ করিয়াছি, এঁদের কতই অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু কাহারই সাক্ষাৎ না পাইয়া এত দিন জীবন্মৃত হইয়া ছিলাম। আত্মহত্যা মহাপাপ বলিয়া মরি নাই।

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "বিধাতার ইচ্ছা ও কৃপা; তাহা না হইলে আজ পিতাপুত্রে পুনর্ব্বার শুভদর্শন হইত না।"

গোলোকনাথ, এমন সময়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার বিষণ্ণ হইলেন। তদ্দর্শনে জগদীশপ্রসাদ চিন্তিত হইয়া বলিলেন, বৈবাহিক-মহাশয়! আপনি আবার সহসা এমন বিষণ্ণ হইলেন কেন?"

গোলোকনাথ দুঃখিতচিত্তে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি আমার অপেক্ষা সুখী; কেননা আপনার দুইটি কন্যাই লাভ হইল। কিন্তু আমি আমাব কনিষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ—"এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হা বীরেন্দ্রনাথ! হা বাবা! তুমি কোথায় রহিলে!"

"পিতঃ! এই যে আমি!—"এই বলিয়া সহসা কে ঐ ব্যক্তি দৌড়িয়া গিয়া গোলোকনাথের পদমূলে পতিত হইল? দুই চক্ষে অশ্রুরাশি উথলিয়া পড়িল। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল, আর বাক্যনিঃসরণ হইল না। ঐ লোকটি কে?—ওগো পাঠক মহাশয়! বলুন্ না, উনি কে?—চিনিয়াছি, ঐ দেখুন, উনি সেই ভৈরবানন্দ কাপালিক।

মহাহুলস্থূল পড়িয়া গেল। সকলেই অবাক্—সকলেই স্তম্ভিত!

ধীরেন্দ্রনাথ নিশ্চল।

হিরণ্ময়ী বিস্ময়ে ও লজ্জায় অবগুণ্ঠনের পরিসর বাড়াইয়া দিলেন। তাঁহার মনের ভিতর কি যে হইতে লাগিল, পাঠক মহাশয়, তাহা ভাবিয়া লউন।

বীরেন্দ্রনাথ আর ভৈরবানন্দ নহেন। তিনি তাঁহার পিতাকে হস্ত তুলিয়া কি চিহ্ন দেখাইলেন এবং সেই চিহ্ন ধীরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া ভ্রাতৃ-স্নেহে উচ্ছ্বলিত হইয়া বলিলেন, "ভাই ধীরেন্! আমায় ক্ষমা কর!" এই বলিয়া তাঁহাকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথের চরণযুগলে পতিত হইয়া সাশ্রুনয়নে বলি-লেন, "দাদা!—"

বী।—"ভাই!"

ধী।—"আপনি ক্ষমা চাহিয়া আমাকে অপরাধী ও লজ্জিত করিবেন না। আপনি জ্যেষ্ঠ আমি কনিষ্ঠ, দাদা! আমি আপনার নিকট মুক্তকণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি—আমায় ক্ষমা করুন্। আমি আপনাকে চিনিতে না পারিয়া, দস্যুদলপতি কাপালিক জ্ঞানে অনেক কটুকাটব্য বলিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন্।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি নির্দ্দোষীকে ক্ষমা করিতে জানি না। ভাই ধীরেন্! আজ পিতাকে এবং তোমাকে পুনর্ব্বার দর্শন করিয়া আশা-তীত আনন্দ লাভ করিলাম। আমি কেবল তোমাদেরই সুদীর্ঘ বিরহে হতাশ হইয়া কাপালিক হইয়াছিলাম। ভাই! আমি অনেক দিন ধরিয়া ভাগীরথীর দুই কূলে, কত গ্রামে ও কত নগরে, সপ্তগ্রামে এবং অবশেষে নব-দ্বীপে তোমাদের অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু কোথাও আমার আশা পূর্ণ হয় নাই। ভাই ধীরেন্! এই জন্যই আমি অত্যন্ত উদাস হইয়া কাপালিকের শিষ্য হইয়াছিলাম।" এই বলিয়া তিনি আবার হিরণ্ময়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎসে হিরণ্ময়ি! তুমি আমার কনিষ্ঠ সহোদরের পত্নী। আমি দুর্দ্দৈববশতঃ তাহা জানিতে না পারিয়া তোমাকে অত্যন্ত দুঃখিত করিয়াছি—কষ্ট দিয়াছি। বৎসে! তজ্জন্য তুমি আর কিছু মনে করিও না—ক্ষমা কর।" এই বলিয়া বীরেন্দ্রনাথ বিস্তর পরিতাপ এবং আত্মনিন্দা করিতে লাগিলেন।

জগদীশ প্রভৃতি এই ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া উত্তরোত্তর অতিমাত্র বিস্মিত হইতে লাগিলেন।

এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া দস্যুপতি উদারচেতা বীরচাঁদ কি ভাবিতেছিল। সে ভাবিতে ভাবিতে গোলোকনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মশাই! আমি আপনকাকে এইবার চিনেচি। এই হতভাগার নৌকডুবি হ'য়ে আপুনি এই দশ এগার বছর ভাব্যে পুত্তুর হারিয়ে নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে অনেক কষ্ট পেয়েচ। আমিই আপনকার সেই নফর মথুর মাঝী।" এই বলিয়া সে গোলোকনাথ প্রভৃতিকে পুনঃপুনঃ ভূলনাট হইয়া প্রণাম করিতে লাগিল। তাহার হৃদয়ে আনন্দসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

এই ব্যাপার দেখিয়া সকলে অবাক্ হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মথুর! তোমাকে ত আমি এত দিন চিনিতে পারি নাই।"

তখন মথুর বলিল, "মশাই! আমিও আপনকাকে চিন্‌তে পারিনি। ত' পাল্লে আপনকাকে কি আর এত দুঃখু দিতুম। আর আমি পূর্ব্বে আপনকাকে দু' এক দিন দেখেছিলুম ব'লে, এ অবস্থায় চিন্‌তে পারিনি। যাই হৌক্, এখন আপুনি আমাকে ক্ষমা কর।" এই বলিয়া সে বীরেন্দ্রনাথের পদধূলি লইয়া নিজের মস্তকে ধারণ করিল।

অনন্তর সে আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া জগদীশপ্রসাদকে বলিল, "ঠাকুরমশাই! আমি গরিব দুঃখী নোক; মাঝীগিরি কাজ ক'রে দিন নির্ব্বাহ কত্তুম। শেষে দায়ে প'ড়ে ডাকাতী ক'রে আজ পেরায় ৯।১০ বছর কাটিয়েচি, কিন্তু এখন আমি সেই পূর্ব্বের মথুর। কিন্তু আপনকার ছোট মেয়ে চিরদিনের জন্যে আমার ধর্ম্মমেয়ে হ'য়ে রইল। তা এখন আপুনি যাই মনে কর। আমি আপনকার হিরণ্ময়ীকে বড্ড ভালবাসি। এমন, কি ওঁরি জন্যে আমি পাপকাজ ডাকাতী ছেড়ে দিয়েচি।"

জগদীশপ্রসাদ অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত বলিলেন, "মথুর! আমার হিরণের সঙ্গে তোমার এ সম্বন্ধ চিরকালের জন্যই রহিয়া গেল। ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম।"

মথুর আবার তাঁহাকে প্রণাম করিল।

অনন্তর জগদীশপ্রসাদ কিরণময়ীকে বলিলেন, "মা কিরণ! আমার একটি ইচ্ছা হইয়াছে। সে ইচ্ছা এই,—আমি বীরেন্দ্রনাথের হস্তে তোমায় সম্প্রদান করিব।"

এই কথা শুনিয়া কিরণময়ী বলিলেন, "বাবা! আমায় ক্ষমা কর। আমি বিবাহ করিব না।"

এই কথা শুনিয়া জগদীশপ্রসাদ সবিস্ময়ে বলিলেন, "সে কি! অমন কথা কি বলিতে আছে?"

কি।—"বাবা! তুমি নিজে বুঝিয়াই দেখ না কেন, আমার যদি বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে আমি এতক্ষণ কোন্ কালে আত্মপ্রকাশ করিতাম। পাছে আমার কনিষ্ঠা ভগিনী হিরণ্ময়ী আবার হতাশ হয়েন, এই ভয়ে আমি ওঁর বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত ছদ্মবেশে ছিলাম। আরও অনেক দিন থাকিতাম, কিন্তু বীরচাঁদ (মথুর) আমাকে প্রকাশ করাইয়া দিল। তা যাই হোক্, ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে হিরণ্ময়ীর বিবাহ সংঘটনের পূর্ব্বে যে, আমি প্রকাশ হই নাই, ইহাই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য।"

জাহ্নবীদেবী বীরেন্দ্রনাথের সহিত কিরণময়ীর বিবাহের জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিরণময়ী কোনমতেই স্বীকৃত হইলেন না। বরং বলিলেন, "মা! এখন আমার বিবাহ শাস্ত্রমতে অসিদ্ধ। অগ্রে কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ হইলে পবে কি জ্যেষ্ঠার বিবাহ হয়?"

জগ।—"না জানিয়া হইয়াছে, তাহাতে দোষ নাই।"

কি।—"আমায় ক্ষমা কর। আমি বিবাহ করিব না।" এই বলিয়া তিনি মনে মনে বলিলেন, "আমি ধীরেন্দ্রনাথকে মনে মনে বরণ করিয়াছি। ভালবাসা—প্রণয় কি এক জন ব্যতীত দুই জনের উপর হইতে পারে? আমি আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর বিপদে অস্থির হইয়াছিলাম, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় তাহার বিপদ দূর হইয়া গেল। ইহাই আমার যথেষ্ট। এখন আমি কোন্ প্রাণে আবার নিজের বিপদ ডাকিব? ধীরেন্দ্রনাথ ব্যতীত আমার আর অন্য কেহ স্বামী নাই। কিন্তু তা বলিয়া ইহাঁকে আর বিবাহ করিব না। করিলে হিরণ্ময়ীর আবার সপত্নী যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইবে। ধীরেন্দ্রনাথ

আমার মানসস্বামী, আমি যাবজ্জীবন মানসেই ইহাঁকে স্বামিবৎ সেবা করিব। এইরূপ সেবা করিতে করিতেই ইহলোক পরিত্যাগ করিব। পরজন্মে যাহাতে ইহাঁকে বিবাহ করিতে পারি, এক্ষণ হইতে সেইরূপ ব্রত করিব। আমি এক্ষণে উদাসিনী। উদাসিনীর যাহা কার্য্য, তাহাই করিব। গৃহত্যাগ করিয়া, তীর্থে তীর্থে—পর্ব্বতে পর্ব্বতে—বনে বনে—সমুদ্র-তটে, পরজন্মে ধীরেন্দ্রনাথ লাভের জন্য তপস্যা করিব। ধীরেন্দ্রনাথ ব্যতীত আমি কাহারও পত্নী হইব না।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তিমচ্ছটায় কেমন একতর হইয়া উঠিল। চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি এইরূপ মূর্ত্তিতে একবার ধীরেন্দ্রনাথের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

জগদীশ ও জাহ্নবী বুঝিলেন, "কিরণময়ী বালিকা, সুতরাং এখন আমাদের কথা বিশেষরূপে বুঝিতে না পারিয়া এমন হইল। অতএব এক্ষণে ইহাকে আর কিছু বলা ভাল নয়। বাড়ীতে গিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গেই ইহার বিবাহ দিব।"

অনন্তর জগদীশ বলিলেন, "কিরণ! আর মা, তোর দুঃখ করিতে হইবে না। এখন বাড়ী চল্।"

এই বলিয়া তিনি ভৃত্যগণকে পাল্‌কী, ডুলী প্রভৃতি সওয়ারী আনিতে আদেশ দিলেন। তাহারা আনন্দে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

নীলকণ্ঠপুরে বেশী পাল্কী ছিল না, সুতরাং উহার নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রাম হইতে বেহারারা পাল্কী ডুলী লইয়া উপস্থিত হইল।

এমন সময়ে মথুর মাঝী, ঐ সকল আগত বেহারাদের মধ্যে দুই জনকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া, আহ্লাদে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "ওরে হ'রে! ওরে কেঙ্গলা! তোরা এখন্ পাল্কী ব'চ্চিস্? কত দিন থেকে এ কাজ ক'চ্চিস্?"

হ'রে ও কেঙ্গ্‌লা মথুরের এই কথা শুনিয়া ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া চিনিতে পারিল। তখন উভয়ে আহ্লাদে বলিয়া উঠিল, "এ কি আশ্চয্যি! মাঝী যে! আজ কি সৌভাগ্যি!—আজ আমাদের কি সৌভাগ্যি! দাদা! তুমি কেমন আছ? মথুদ্দা! আমরা সেই নৌকডুবীর দিনে এক রকম চেষ্টা টেষ্টা ক'রে পরাণে বেঁচেচি; কিন্তু ভয়ে আর দেশে ফিরে যাইনি। অনেক দিন ধ'রে এ কাজ সে কাজ ক'রে বছর দুই তিন হ'ল, পাল্কী ব'চ্চি।" এই বলিয়া তাহারা গোলোকনাথকে চিনিয়া লইয়া প্রণাম করিল। তিনিও তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনন্তর সকলে নীলকণ্ঠপুর হইতে মধুপুরে যাত্রা করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিল।

এমন সময়ে বীরেন্দ্রনাথ একবার ভাবিলেন, "আমি, পিতা মহাশয় এবং ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মধুপুর যাইব কি না? আমার ত যাইবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু এখন না গেলে আবার ইঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন। এমন কি, আমাকে ছাড়িয়া কখনই যাইবেন না। আমি এখন কি করি? আমি না জানিয়া আমার ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। ইহাতেও আমার গুরুতর পাপ হইয়াছে। আমি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। আজি হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। ওঃ আমি কি ঘোরতর পাপী! যত দিন পর্য্যন্ত না আমার এই পাপদেহ এবং পাপপ্রাণের পতন হইতেছে, তত দিন আমাকে পাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে। এখন পিতা ও ভ্রাতার সঙ্গে গমন করি।" এইরূপ ভাবিয়া তিনি মনে মনে আরও কত কি ভাবিতে লাগিলেন। দৈব বিড়ম্বনায় বীরেন্দ্রনাথ যুগপৎ লজ্জিত ও পরিতপ্ত হইলেন। মুখ তুলিয়া কাহারও সহিত ভাল করিয়া আর কথা কহিতে পারিলেন না।

অনন্তর জগদীশপ্রসাদ মধুপুরে যাইবার জন্য সকলকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। সকলে প্রস্তুত হইল। তখন তিনি "জয় সিদ্ধিদাতা গণেশ! জয় দুর্গা!" বলিয়া সকলকে লইয়া নীলকণ্ঠপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ বাড়ী মধুপুরে প্রস্থান করিলেন।

এক দিন, দুই দিন করিয়া তৃতীয় দিনে সকলে আসিয়া একটি নদীতটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের উপস্থিতির সময়, তথাকার ক্ষেয়া-নৌকার মাঝী নৌকা লইয়া পরপারে ছিল। সুতরাং জগদীশপ্রসাদ প্রভৃতিকে এ পারে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল।

অনন্তর মাঝী পরপার হইতে ক্ষেয়া-নৌকা আনিল। তাহার এই ক্ষেপে পরপার হইতে সর্ব্বশুদ্ধ দশ জন লোক আসিল। তন্মধ্যে ছয় জন পুরুষ এবং চারি জন স্ত্রী। তীরে সকলের অবতীর্ণ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মাঝী পেরুণী পয়সা আদায় করিতে লাগিল। তন্মধ্যে একটি স্ত্রীলোক পয়সা দিতে চাহিল না। মাঝীও পয়সা ছাড়িবার পাত্র নহে। সুতরাং উভয়ে ঝগড়া উপস্থিত হইল।

সেই স্ত্রীলোকটি বলিল, "আজ আমি ভিক্ষে ক'রে কোথাও একটি পয়সা পাই নি—খালি চাট্টি চাল পেয়েচি। কাল তোকে পয়সা দেব।"

মাঝী বলিল, "চালই দিয়ে যা। নৈলে আমি আবার তোকে ওপারে নিয়ে যা'ব।"

বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি কাতরস্বরে বলিল, "তবে আমি আজ কি খা'ব! উপোস থেকে ম'রে যা'ব কি, বাবা!"

মাঝী।—"তা আমি জানিনি।"

এইরূপে উভয়ে কথায় কথায় ক্রমে বিবাদ বাড়িয়া উঠিল।

এমন সময়ে ধীরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি নৌকার নিকট গিয়া বলিলেন, "ওগো বাছা! তুমি এই একটি টাকা আর দুই আনার পয়সা লও।"

বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি ধীরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে উহা লইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিল, "বাবা! তোমার জয় জয়কার হোক। তুমি সুখে থাক—তোমার সোণার দোত কলম হোক।" সে ধীরেন্দ্রনাথকে এইরূপে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া মাঝীকে একটি পয়সা দিল। কাজেই মাঝীর খই-ফোটা মুখ বন্ধ হইয়া গেল।

অনন্তর উক্ত বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি ধীরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি, বাবা?"

ধী।—"ধীরেন্দ্রনাথ।"

বৃদ্ধা।—"তোমার মা বাপ আছেন?"

ধী।—"মাতা নৌকাডুবী হইয়া নিরুদ্দেশ; পিতা আছেন।" এই বলিয়া তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঐ উনি আমার পিতা।"

বৃদ্ধা।—"ওঁর নাম কি?"

ধী।—"গোলোকনাথ।"

বৃদ্ধা।—"তোমাদের বাড়ী কোথায়, বাছা?"

ধী।—"আমাদের বাড়ী পূর্ব্বে নবদ্বীপে ছিল, তার পর এখন মধুপুরে।"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা কি ভাবিতে লাগিল। সে পুনঃপুনঃ ধীরেন্দ্রনাথ এবং গোলোকনাথের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। এইরূপে দেখিতে দেখিতে বীরেন্দ্রনাথের দিকে তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। সে আবার বলিল, "বাবা! ঐ ছেলেটি কে?"

ধী।—"উনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর—নাম বীরেন্দ্রনাথ।"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা আবার কি ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে সহসা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহাকে হঠাৎ রোদন করিতে দেখিয়া ধীরেন্দ্রনাথ চঞ্চল হইলেন। জগদীশপ্রসাদ, গোলোকনাথ প্রভৃতি দূরে ছিলেন, তাঁহারাও দ্রুতপদে নিকটে আসিলেন।

বৃদ্ধা আরও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলে "ব্যাপার কি?—কি হইয়াছে?" বলিয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

বৃদ্ধা অশ্রুপূর্ণ-লোচনে গোলোকনাথের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার চরণমূলে পতিত হইয়া, "এই পোড়াকপালীকে চিনিতে পার কি?" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

গোলোকনাথের পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটিকে চিনিতে পারিলেন। চিনিতে পারিয়াই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "তারা-

সুন্দরি! তোমার এমন অবস্থা হইয়াছে! আজ বিধাতা তোমাকে পুনর্ব্বার আমার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আমার প্রতি অনির্ব্বচনীয় দয়া প্রকাশ করিলেন। আমি তজ্জন্য তাঁহাকে শতশত ধন্যবাদ প্রদান করি।" এই বলিয়া তিনি তারাসুন্দরীকে উত্থিত করিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ ও ধীরেন্দ্রনাথ জননীর পুনর্দর্শন পাইয়া আশাতীত আনন্দলাভ করিলেন। তাঁহারা জননীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন।

জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবীদেবী, বৈবাহিক পত্নীকে পাইয়া অত্যন্ত পুলকিত হইলেন।

কিরণময়ী এবং হিরণ্ময়ী হর্ষিতচিত্তে তারাসুন্দরীকে প্রণাম করিলেন।

এই অচিন্ত্য ঘটনা সংঘটিত হইতে দেখিয়া নদীতটস্থ সকলেই বিস্ময়ে পুলকিত হইল। কিন্তু ক্ষেয়া মাঝীর মনে বিস্ময় ও ভয় যুগপৎ সমুদিত হইল। সে তখন তারাসুন্দরীর নিকট প্রণত হইয়া, "মা! আমাকে মাপ কর" বলিয়া অপরাধ স্বীকার করিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে তারাসুন্দরী পতি, পুত্র এবং পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া অতুল আনন্দসাগরে ভাসমান হইলেন।

অদ্ভুত ঘটনার উপর অদ্ভুত ঘটনার সম্পাত দেখিয়া সকলেরই বিস্ময়, আনন্দ ও কৌতূহল দ্রবীভূত হইতে লাগিল।

অনন্তর জগদীশপ্রসাদের আদেশে ক্ষেয়া-মাঝী, তাহার নৌকায় করিয়া তিন চারি ক্ষেপে সকলকে পার করিল। জগদীশপ্রসাদ তাহাকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিলেন।

মাঝী তাঁহাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিল, এবং মনে মনে বলিল, "হে পরমেশ্বর! এই রকম বড় লোককে যেন রোজ রোজ পার ক'র্ত্তে পারি।"

অনন্তর জগদীশপ্রসাদ, গোলোকনাথ, বীরেন্দ্রনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ, জাহ্নবীদেবী, তারাসুন্দরীদেবী, কিরণময়ী, হিরণ্ময়ী, হরিহর দেওয়ান, মথুর ও অন্যান্য লোকজন তথা হইতে মধুপুরের দিকে প্রস্থান করিল।

পাঠক মহাশয়! তাহার পর যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। এক্ষণে আমি অনবকাশপ্রযুক্ত আপনার কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিলাম না। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক, এই স্থলেই "হিরণ্ময়ী উপন্যাসের" সমাপ্তি ধরিয়া লউন্।

সম্পূর্ণ।